# উত্তরবঙ্গের ইতিহাস

সুকুমার দাস

প্রথম প্রকাশ : ২রা জুন, ১৯৮২

প্রকাশক :

শ্রীমতী বিজলি বেরা

পক্ষে,

কুমার সাহিত্য প্রকাশন

ব্লক-৬, ফ্লাট-৮

১৩১, নেতাজী সুভাষ বোস রোড

কলিকাতা-৪০

গ্রন্থ মুদ্রক :

শ্রীনিশিকান্ত হাটই

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

চিত্র ও প্রচ্ছদ :

রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট্

৭/১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

# উৎসর্গ

যাঁর প্রেরণা আমাকে আকৈশোর

**ভারত ও বঙ্গের সংস্কৃতি** অনুধাবনে আসক্ত রেখেছে

সেই পূজ্যপাদ পিতৃদেব

**শ্রীযুক্ত মহাদেব দাস** মহাশয়ের চরণকমলে

এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত।

**গ্রন্থকার**

# প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থটি উত্তরবঙ্গের উপর রচিত প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, যার আলোচ্য সময়সীমা ১০ হাজার খৃষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১৯৮২ সালের ২রা জুন পর্যন্ত।

এই গ্রন্থ স্থাপিত করেছে যে, প্রায়-মানব ও আদি-মানবদের বিচরণ-ভূমি উত্তরবঙ্গ, চতুর্থ তুষার যুগের পরবর্তী মানব-প্রজাতি-প্রবাহগুলির মিলনভূমি উত্তরবঙ্গ, সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-রাজতন্ত্র-মাধ্যমে সহস্রাব্দ জুড়ে আর্য-সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহতকারী উত্তরবঙ্গ, ঐতিহাসিক কাল-পর্বেও অগ্রসর হয়েছে সুস্পষ্ট ইতিহাসের সরণিতে।

যে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে প্রায় সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগ ধরে বাংলার মূল ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, যে প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে স্থিত রাজধানী থেকে হিমালয় সন্নিহিত উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম আসাম শাসিত হয়ে এসেছে—ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে প্রাক্-বৃটিশ যুগ পর্যন্ত, ভাগ্যের পরিহাসে, সেই উত্তরবঙ্গের একটি ধারাবাহিক ও সামগ্রিক ইতিবৃত্ত আজও রচিত হয়নি এবং ফলতঃ অতি স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ শিক্ষিত ভারতীয়ের কাছে উত্তরবঙ্গ আজও অন্ধকারময় এক অখ্যাত জনপদের মিথ্যা পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

বাংলার সাধারণ ইতিহাস ধারার বাইরে, প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের যে নিজস্ব ইতিহাস স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তা শুধু মানুষের শান্তিপূর্ণ প্রজাতি-মিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক সমাহারের বিশিষ্টতা-চিহ্নিত নয়, এর ঐতিহাসিক পর্বের ঘটনাবলীও সাধারণ বঙ্গীয় ইতিহাসের ঘটনা-ধারার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের, অনেক বেশি তাৎপর্য-পূর্ণ ও অভিনব, অনেক বেশি চমৎকারিত্বে উজ্জ্বল ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পূর্ণ।

এই গ্রন্থ তাই সংক্ষিপ্ত হলেও ধারাবাহিক এবং প্রতিটি যুগ তার মূল ভাবগত সামগ্রিকতায় উপস্থাপিত; এখানে পাঠক পাবেন বিস্মৃত উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে তাঁর পুরাতন ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন এবং স্বতঃই উত্তীর্ণ হবেন সেই নতুন অভিজ্ঞতায়, যেখানে উত্তরবঙ্গের জন-জীবন ও রাজনৈতিক বিবর্তন ভারত-ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি গৌরবময় চমৎকারিত্বে চিহ্নিত। আশা করি, উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের এই পথ-প্রদর্শক প্রথম রচনা ব্যাপক গণ-আদৃতি লাভ করবে।

**প্রকাশক**

# বিষয়-সূচী ও পত্রাঙ্ক

## প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা



## দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাগৈতিহাসিক উত্তরবঙ্গ

( খৃ. পূ. ১০,০০০ বছর থেকে খৃ. পূ. ১৫০০ বছব )



## তৃতীয় অধ্যায় : উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়-শাসন
## পুণ্ড্রবর্ধন রাজতন্ত্রের ইতিহাস

( খৃ. পূ. ১৫০০ সাল থেকে ৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত )

## চতুর্থ অধ্যায় ঃ কামরূপ ও গৌড়ীয় শাসনের ধারা
( খৃ. পূ. ১০,০০০ থেকে খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দ )

### ক. পূর্বীয় উত্তরবঙ্গে কামরূপীয় শাসন



### খ. দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গে গৌড়কেন্দ্রিক শাসনের সূত্রপাত



## পঞ্চম অধ্যায় ঃ গুপ্তযুগের উত্তরবঙ্গ
( ৩২০ খৃষ্টাব্দ—৫৯৫ খৃষ্টাব্দ )

### ক. পুণ্ড্রবর্ধন ( মহাস্থানগড়, কোটিবর্ষ ও গৌড়সহ )



### খ. পূর্বীয় উত্তরবঙ্গে তথা কামরূপে স্বাধীন বর্মণ রাজত্ব

## ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উত্তর-গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ

( আ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আ. ৬৪২ খৃষ্টাব্দ )

### ক. গৌড়ে স্বাধীন রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান



### খ. পুণ্ড্রবর্ধন



### গ. কামরূপ বর্মণরাজবংশের বিলোপ



## সপ্তম অধ্যায় ঃ শশাঙ্কোত্তর শতবর্ষ ও উত্তরবঙ্গ

( আ. ৬৪২ খৃষ্টাব্দ থেকে আ. ৭৫০ খৃষ্টাব্দ )

### ক. গৌড়ভূমি

খ. প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ



অষ্টম অধ্যায় : পালযুগে উত্তরবঙ্গ

( আ. ৭৫০-১১৫০ খৃ. )

ক. গৌড়-বরেন্দ্রে পালশাসন



খ. পালযুগে প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ



নবম অধ্যায় : সেন আমলে উত্তরবঙ্গ

( খৃ. ১১৫০ থেকে ১২০৩ খৃ. )

ক. গৌড়-কেন্দ্রিক শাসন

### খ. উত্তরবঙ্গে কামরূপ-কামতাপুরের শাসন



## দশম অধ্যায় ঃ বঙ্গে মুসলিম অভিযান ( প্রথম পর্ব ঃ ১২০৩-১২২৭ ) ও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে মহারাজ পৃথুর প্রতিরোধ



## একাদশ অধ্যায় ঃ প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ( ১২২৮—১৫১৫ ) স্বাধীন হিন্দুরাজ্য কামতাপুর

### ক. মহারাজ পৃথুর বংশধরদের শাসন



### খ. কামতাপুরে প্রতাপধ্বজ-বংশীয় রাজত্ব



### গ. অরিমত্ত ও তাঁর বংশধরদের শাসন

## ঘ. কামতাপুরে খেনবংশের শাসন



## দ্বাদশ অধ্যায় ঃ গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাস [ ১২০৩ খৃ.—১৫৩৮ খৃ. ]



## ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে কোচরাজতন্ত্র

( প্রথম পর্ব ঃ খৃ ১৫১৫ থেকে খৃ. ১৭৭২ )

চতুর্দশ অধ্যায় : গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাস ( ১৫৩৮-১৭৬৫ )



পঞ্চদশ অধ্যায় : প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে কোচরাজতন্ত্র

[ দ্বিতীয় পর্ব : খৃ. ১৭৭২ থেকে খৃ. ১৯৫০ পর্যন্ত ]



ষোড়শ অধ্যায় : ইংরেজ-শাসনে উত্তরবঙ্গ

[ প্রথম পর্ব : কোম্পানীর যুগ ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ]

সপ্তদশ অধ্যায় : ইংরেজ-শাসনে উত্তরবঙ্গ

[ দ্বিতীয় পর্ব : বৃটিশ-শাসন ( ১৮৫৮-১৯৪৭ ) ]



অষ্টাদশ অধ্যায় : স্বাধীনতা-উত্তর উত্তরবঙ্গ

( ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ থেকে ২রা জুন, ১৯৮২ )

ক. অন্তর্বর্তী-সরকারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের আমল

( ১৯৪৭ খৃ —১৯৫২ খৃ. )

## খ. নির্বাচিত মন্ত্রীসভা ও ডাঃ বিধান রায়ের আমল
( ১৯৫২ খৃ.—১৯৬২ খৃ. )



## গ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের আমল
( ১৯৬২ খৃ.—১৯৬৭ খৃ. )



## ঘ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির আমল [ ১ম পর্ব ]
( ১৯৬৭, জুন—নভেম্বর )



## ঙ. মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমল [ ২য় পর্ব ]
( ২২শে নভেম্বর ১৯৬৭—২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ )



## চ. পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি-শাসন [ ১ম পর্ব ]
( ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ )



## ছ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির আমল [ ২য় পর্ব ]
( ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯—১৬ই মার্চ, ১৯৭০ )

# চিত্র-সূচী



## পরিশিষ্ট

"আমাদের ইতিহাসকে আমরা অপরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীন দৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের চটির মধ্য হইতে বাহির করিয়া ইতিহাসেব উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিব; এখানে তাঁহারা নিজের চেষ্টায় সত্যেব সঙ্গে সঙ্গে যদি ভ্রমও সংগ্রহ করেন সেও আমাদের পক্ষে পর-লিখিত পরীক্ষাপুস্তকের মুখস্থ বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়; কারণ, সেই স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম আর একদিন সেই ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিবে। কিন্তু পরদত্ত চোখের ধুলি চিরদিন বাঁধা রাস্তায় ঘুরিবার মতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘাণিবৃক্ষের তৈল-নিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক, নূতন সত্য-অর্জন ও পুরাতন ভ্রম-বিসর্জনের উদ্দেশ্যে অব্যবহার্য।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# প্রথম অধ্যায়

## উপক্রমণিকা

### ১. উত্তরবঙ্গের স্বতন্ত্র ইতিহাস-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক ইতিহাস-গবেষণা ও শিক্ষা-বিস্তারের দুই দু'টি গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও, এ যুগের সাধারণ বাঙালী তথা ভারতীয়দের কাছে উত্তরবঙ্গ আজও অন্ধকারময় এক জনপদের মিথ্যা পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে রইল। আমাদের দেশের ইতিহাস লেখকদের পক্ষে এটি যথেষ্ট অগৌরবের কথা।

উত্তরবঙ্গের এই সুবিস্তৃত জনপদের যে একটি নিজস্ব ইতিহাস ধূসর অতীত থেকেই আপন মনে বিবর্তিত হয়ে চলেছে—তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না প্রচলিত বঙ্গীয় বা ভারতীয় ইতিহাসে। আবার অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। কোচ-রাজবংশের উপরে গ্রন্থ রয়েছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালের এই রাজবংশের ইতিহাস উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের ভগ্নাংশমাত্র; অপরাপর যুগের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার উপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সত্য, কিন্তু একটিমাত্র গ্রন্থের কোরকে ঐতিহাসিক কালের বিস্তৃত সীমানায় প্রবাহিত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস উপস্থাপনার কোনো প্রয়াস পর্যন্ত এখনো হয়নি। এই বিশাল জনপদের স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঐতিহ্যের ও গৌরবময় ইতিহাসের একটি সামগ্রিক ও যথার্থ ধারণা তুলে ধরতে হলে—উত্তরবঙ্গের স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত রচনা অনিবার্য।

ভারতের যে ইতিহাস চালু আছে, স্বভাবতই তা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের মূল ধারার ইতিহাস; সেখানে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস পাদটীকায় পর্যবসিত এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ইতিহাসের 'মূলস্রোতের' ধারাবাহিক ব্যাখ্যান করতে গেলে, ইতিহাসের তথা-কথিত পার্শ্বস্রোতের অপেক্ষাকৃত মহত্বপূর্ণ ঘটনাও বাদ পড়ে যায়। ইয়োরোপের নগর-রাষ্ট্রভিত্তিক বা এক জাতি-ভিত্তিক ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকেরা তেমন সমস্যায় পড়েন না; কিন্তু একদা-বহু-জাতিক, বিচিত্র জনপদে প্রসারিত, বিশাল ভারতের ইতিহাস-রচনায় ঐতিহাসিকেরা 'অগত্যা' ভারতেতিহাসের মূল-ধারাকেই প্রধান ভূমিকায় আখ্যাত করে যাওয়ার রীতি ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন।

সেই কারণেই ভারতের ইতিহাসে বাংলার তথা অন্যান্য আঞ্চলিক ইতিহাস তার পূর্ণ ভূমিকা-লাভে ব্যর্থ হয়। আঞ্চলিক ইতিহাসের সেইটুকু মাত্র সেখানে গ্রহণ করা হয়, যা হয় ভারতেতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত অথবা সেই ধারার ব্যাখ্যানের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট।

এই একই রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য বাংলার ইতিহাসেও উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের নিজস্ব রূপ ও রস ফুটে ওঠেনি। বাংলার ইতিহাসের মূলধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন মহত্তর তথ্যের পরিত্যাগে এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রয়োগে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ধারাবাহিকতা-ছিন্ন সামগ্রিকতা-ভ্রষ্ট অর্থহীন তথ্যের উৎসারণে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসের সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়নি—প্রায় কখনোই! সমগ্র ভারতে ও নিম্নবঙ্গে যখন আর্য-প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত, উত্তরবঙ্গে তখনো দ্রাবিড় রাজশক্তির পদমূলে আর্যদের উপনিবেশবাদ প্রতিহত রয়েছে সহস্রাব্দ জুড়ে। বাংলায় যখন মুসলিম যুগ উত্তরবঙ্গে তখন স্বাধীন হিন্দু-রাজত্ব। বাংলার ইতিহাসে যা সত্য উত্তর বাংলার ইতিহাসে তা সত্য নয়। সেই অর্থে বাংলার ইতিহাসে উত্তর বাংলার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না। অতএব উত্তর বাংলার প্রয়োজনেই উত্তর বাংলার ইতিহাস আবশ্যক।

অপর দিকে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের প্রয়োজনেও উত্তরবঙ্গের স্বতন্ত্র ইতিহাস চর্চার আবশ্যিকতা রয়েছে। কারণ আঞ্চলিক ইতিহাসের অসম্পূর্ণ ও খর্বিত চিত্রণ প্রদেশের সামগ্রিক ইতিহাসকেই যথার্থ সত্যে ও পূর্ণ ভাবচিত্রে পরিস্ফুট হতে অক্ষম করে তোলে। উত্তরবঙ্গের ইতিহাস যথার্থ মূল্য না পাওয়ায় সারা বাংলার ইতিহাসও যথার্থ তাৎপর্য ও মূল্যে উদ্ঘাটিত হয়নি এখনো; প্রকাশ পায়নি তার পূর্ণাঙ্গ ও সত্যতর স্বরূপ। চুণারগড়ের ক্ষুদ্র জায়গীরদার বক্তিয়ারের স্বল্পসংখ্যক বাহিনীর হঠকারী অভিযানে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের ঘটনাকে বাংলার ইতিহাসে পূর্ণ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত করে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে—তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু সেই বক্তিয়ার যখন বাংলার সুলতান, তখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির স্ফীত বর্ধিত বিশাল সেনাবাহিনীকে যে বঙ্গীয় রাজন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন, তাৎপর্যও মহত্ত্বময় সেই ঘটনা কি একবারও বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরা হবে না? যদি না হয়—তাতে কী বাংলার যথার্থ ইতিহাস পরিস্ফুট হবে?

ভারতের বহুল আলোচিত রাষ্ট্রশক্তিগুলো যখন মুসলিম আক্রমণে একের পর এক লুটিয়ে পড়ছিল—তখন সে আক্রমণ যে পূর্বাপর প্রতিহত হয়েছে উত্তরবঙ্গের মাটিতে, ভারত তথা বাংলার ইতিহাসে যাকে মুসলিম যুগ বলা হয়, উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে যে তা সত্য নয়; ভারতে প্রবল শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্যবাদের যুগেও -নিরন্তর বহিরাক্রমণকে প্রতিহত করে এখানে হিন্দুরাজ-শক্তি আগা-গোড়াই রাজত্ব করে গেছে,—'মূল ধারা'র ইতিহাস রচনার অজুহাতে সে কাহিনী অনুল্লিখিত থেকে গেলে, অথবা যথার্থ মূল্যে উপস্থাপিত না হলে—বাঙালীর কাছেও বাংলার যথার্থ ইতিহাস পরিস্ফুট হবে না।

বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে স্থায়ী রাজতন্ত্র যে উত্তরবঙ্গের মাটিতেই গড়ে উঠেছিল, আর্যদের অপ্রতিরোধ্য ভারত-বিজয় যখন প্রবল শক্তিশালী দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের দ্রাবিড় রাজশক্তিগুলিকেও পরাভূত করেছে, তখন তা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিহত হয়েছে উত্তরবঙ্গের দ্রাবিড় রাজশক্তির দ্বারে, ভারতেতিহাসের সেই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বাংলার ইতিহাসেও যদি পর্যালোচিত না হয়—সেটা দুর্ভাগ্যের। প্রাকবৈদিক যুগেই যে উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল, ইতিহাসের কাল-সীমায় বাংলার প্রায় সকল প্রধান ও মূল রাজনৈতিক শক্তি যে উত্তরবঙ্গের মাটিতেই উদ্গত অথবা সে সকল রাজশক্তির মূলঘাঁটি, তার রাজধানী, উত্তরবঙ্গের সীমানায় স্থিত, এবং সে অর্থে বাংলার ইতিহাস যে মূলতঃ উত্তরবঙ্গেরই ইতিহাস; যদিও বাংলার ঐসব মূল রাজনৈতিক শক্তিগুলির সীমানায় প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের নিজস্ব ইতিহাসও, নিজস্ব রাজনৈতিক অস্তিত্বের ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল; উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ধারাবাহিকতায় বিশ্লেষিত হলে—এই সব সত্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হবে বাঙালী পাঠকের কাছে; এবং সারা বাংলার ইতিহাসের ব্যাপকতর, সত্যতর ও নবতর রূপ—উন্মোচিত হবে সাধারণ পাঠকের কাছে।

## ২. উত্তরবঙ্গের সংজ্ঞা ও সীমানা

উত্তরবঙ্গ একটি স্থায়ী প্রাকৃতিক সীমা-রেখা-চিহ্নিত ভূখণ্ড এবং ইতিহাসের আদিতম যুগ থেকে এই প্রাকৃতিক সীমারেখা তার রাজনৈতিক ভাগ্যকে বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে। প্রাচীনকালে অঙ্গ, বঙ্গ, সমতট, সুহ্ম, রাঢ়, পুণ্ড্র, হরিকেল প্রভৃতি বিভাগে বঙ্গভূমি চিহ্নিত হয়েছিল, কিন্তু সে

জনপদী নাম মাত্র; এবং ঐতিহাসিক কারণে উক্ত জনপদগুলি বৃহত্তর রাজনৈতিক শাসনের ছত্রছায়ায় এসে কালক্রমে আপন জনপদীয় নাম ও পরিচিতির স্বাতন্ত্র্যকে অবলুপ্ত করে ফেলে। জনপদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মুছে গেলেও—মোছেনি প্রাকৃতিক সীমা-রেখা। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি, তার প্রায় মধ্যদেশ থেকে, তিনটি প্রধান জলধারাতে, তিনটি প্রায় সমান ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ভাগীরথী বঙ্গের প্রাকৃতিক এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছে—উক্ত নদীত্রয় বিভাজিত ভূখণ্ডত্রয়-মাধ্যমে। উত্তরে গঙ্গা ও পূর্বে ভাগীরথী দিয়ে চিহ্নিত অঞ্চলকে মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয়ে থাকে; গঙ্গার উত্তরে এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে অবস্থিত বঙ্গভূমিই উত্তরবঙ্গরূপে চিহ্নিত এবং ভাগীরথীর পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের বাম-অববাহিকায় স্থিত সমগ্র নিম্নবঙ্গই পূর্ববঙ্গ নামে চিহ্নিত হয়ে আসছে।

প্রাকৃতিক বিভাজনে, ভৌগোলিক অর্থে যাকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়—তা সব সময় একক শাসন-তন্ত্রে শাসিত হয়নি এবং বর্তমানেও হয় না। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য বা শাসকীয় সীমানায় একত্রিত না হলেও—উত্তরবঙ্গ একটি ভৌগোলিক একক। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কোশী নদী, দক্ষিণ সীমানায় গঙ্গা এবং পূর্বসীমায় ব্রহ্মপুত্র নিয়ে গঠিত এই ভূখণ্ড একটি নিজস্ব প্রাকৃতিক বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ শুধু একটি ভৌগোলিক একক-ই নয়, আমরা পূর্বেই আভাসিত করেছি যে, একে ঘিরে, অন্ততঃ প্রান্তিক উত্তরভাগে, একটি নিজস্ব ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিবর্তিত হয়ে আসছে। এই প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের জনগণের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের নিজস্বতা—একে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।

যদিও ভৌগোলিক অর্থে গঙ্গাই উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ সীমানা কিন্তু উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তের ইতিহাস তার একান্ত নিজস্ব ইতিহাস নয়, বরং সারা বাংলার ইতিহাস। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও তাই। ভৌগোলিক অর্থে প্রায় কেন্দ্র-ভূমি বলেই হোক, তিনদিকে বিশাল নদীর প্রতিরক্ষাব্যূহের সুবিধা থাকার জন্যেই হোক—উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ সীমানায়, গঙ্গার উত্তরেই অধিকাংশ সময় বাংলার রাজা ও সুলতানদের রাজধানী গড়ে ওঠে। শশাঙ্কের গৌড়, পালদের রামাবতী, সেনদের লক্ষণাবতী, মুসলমানদের গৌড়

ও পাণ্ডুয়া সবই উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। সে ইতিহাস বৃহত্তর বাংলার ইতিহাস। কিন্তু এর আত্মগত ইতিহাস, এর নিজস্ব জনজীবন ও সংস্কৃতির বিশিষ্টতা রূপলাভ করেছে প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের সীমানাতে, যেখানে বিচিত্র জাতি প্রবাহের সংমিশ্রণ ও সহাবস্থান এক উদার ও মহৎ মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দান করেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এই বিশিষ্টতাও উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের স্বতন্ত্র অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তাকে তীব্রতর করে তোলে।

## ৩. তথ্যের অপূর্ণতা বনাম অজ্ঞতা

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে তথ্যের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কিন্তু তাতে ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের একটি রূপ পরিস্ফুট করে তুলতে অসুবিধা হয় না। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী, এমন কি উত্তরবঙ্গবাসীদের মনেও এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে, উত্তরবঙ্গের জ্ঞাত ইতিহাস অনতিপ্রাচীন; কিছু লেখকও এমন মন্তব্য করেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বকালে উত্তরবঙ্গের ইতিবৃত্ত ধূসর, বিচ্ছিন্ন অথবা অজ্ঞাত। সব মিলে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতার আবরণটি অনুন্মোচিতই রয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চাই ব্যাপক গবেষণা। শুধু পুঁথি ঘাঁটার গবেষণা নয়, হাতে নেওয়া দরকার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির উৎখননের কাজ, যে কাজ উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত হয়ে রয়েছে। অতীতের মুখর জনপদ, প্রাচুর্যপূর্ণ নগরী ও রাজধানী, যা একদা দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল, আজ তা মৃত্তিকাগহ্বরে লুক্কায়িত। প্রাক্-আর্য সভ্যতার লীলাভূমি উত্তরবঙ্গের মৃত্তিকা গহ্বরে খুঁজে পাওয়া সম্ভব মানুষের দূরতম অতীতের পরিচিতি। অতিরিক্ত বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিকম্পের দেশে, অনতি-প্রাচীন নগর ও স্থাপত্যও, সহজে অবক্ষয় বরণ করে নিয়েছে উত্তরবঙ্গে। অবক্ষয়ের অস্পষ্টতাকে দূর করতে হবে ব্যাপক গবেষণায়; ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রে ও গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের যে ইঙ্গিত রয়ে গেছে—তাকে সপ্রতিষ্ঠ করতে হবে প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব আর ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যাপনে। রাজতন্ত্রের ইতিহাসের ওপারে ভাস্বর হয়ে উঠবে—মানুষের ইতিহাস।

বর্তমান লেখক ইতিহাস-গবেষক নয়, এ গ্রন্থও গবেষণামূলক নয়; শুধু তাৎক্ষণিক প্রেরণায় তাড়িত হয়ে—সামান্য যা তথ্য আমার হাতে সংগৃহীত

হয়েছে তা থেকেই উত্তরবঙ্গের ধারাবাহিকতামুক্ত একটি ইতিবৃত্তের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সাধারণ পাঠকের কতগুলি দৃঢ-বদ্ধ ভ্রান্তিকে দূর করে নিম্নলিখিত দাবীগুলি প্রতিষ্ঠিত করা যায় ঃ—

(ক) উত্তরবঙ্গ ভারতের আদিতম মানব-বসতির একটি পীঠস্থান; অধিকাংশ বঙ্গভূমি এবং উত্তর ভারত যখন জলমগ্ন থাকায় জন-বসতির অযোগ্য ছিল, তখনও এখানে প্রবাহিত ছিল বিচিত্র মানব-প্রজাতি ও তার সংস্কৃতি ধারা। মানুষ থাকলে মানুষের ইতিহাস থাকে। উত্তরবঙ্গে তাই মানুষের ইতিহাসের সূত্রপাত শুধু প্রাক্-আর্য যুগ থেকেই নয়, একেবারে মানবেতিহাসের সূত্রপাতের যুগ থেকে।

(খ) উত্তরবঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের সূত্রপাতও হয়েছিল প্রাক-আর্য যুগে এবং আর্যসভ্যতা এর শক্তিশালী নগর ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করতে পারেনি বহুকালের চেষ্টাতেও।

(গ) ঐতিহাসিক পর্বে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের মধ্যে দু'একটি স্থানে ধারা-বাহিকতার অনুপস্থিতি থাকলেও প্রবহমান ইতিহাসের ইঙ্গিতটুকু পেতে অসুবিধা হয় না। বরং অনেক প্রদেশের ইতিহাসের চেয়েও ধারাবাহিকতায় উত্তরবঙ্গীয় ইতিহাস অনেক বেশি সংহত। এমন কি বাংলার ইতিহাসে বিচ্ছিন্নতার অধ্যায়গুলি উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের চেয়ে সংখ্যায় ও ব্যাপ্তিতে বেশি। শশাঙ্কের পরবর্তী বাংলার ইতিহাসের শতবর্ষের অন্ধকারময়তাকে মাৎস্যন্যায় দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা হলেও আসল সত্য হ'ল একশত বছর কোন দেশ রাজাহীন হয়ে টিকে থাকেনি, নিশ্চয়ই যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজশক্তি তখনকার বাংলা শাসন করতেন, তাদের নাম গোত্র কিছুই জানা যায় না। সেদিক থেকে উত্তরবঙ্গের ঐ যুগ—শতবর্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, মাৎস্যন্যায়ের অজুহাত সেখানে, বিশেষতঃ প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে একেবারেই দেখানোর প্রয়োজন হয় না।

## ৪. উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের উল্লেখ্য বিশিষ্টতা

মূল ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনার প্রারম্ভে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের কয়েকটি মৌলিক বিশিষ্টতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা অবান্তর হবে না, কারণ তাতে গ্রন্থের মধ্যে এই বিশিষ্টতাগুলির অনুসন্ধান কর্ম সহজতর হবে।

(ক) উত্তরবঙ্গের জনজীবনের ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্য জাতি-সংমিশ্রণ ও সংস্কৃতি সমাহার। ভারতের প্রায় সবগুলো মানবগোষ্ঠীর প্রবাহ এখানে মিলিত হয়েছে—সংঘাতহীন সমন্বয়ে তৈরী করেছে এক উদার এবং মিশ্র লোকয়াত সংস্কৃতি।

(খ) উত্তরবঙ্গ ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে ছিল পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা-প্রেমী। ইতিহাসের কোনো পর্বেই সে বহিরাগত রাজশক্তিকে প্রবেশ করতে দেয়নি বিনা বাধায় এবং অন্ততঃ প্রান্তিক উত্তরবাংলার ক্ষেত্রে সে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রয়াসে আগাগোড়াই সফলকাম ছিল।

(গ) উত্তরবঙ্গের রাজন্যবৃন্দ স্থানীয় জনসমাজ থেকে সম্পর্কহীন ছিলেন না, তাঁদের অনেকেই লোকায়ত জনজীবন থেকে, এমন কি—অনুন্নত সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। সমভাষাভাষী, সম-সংস্কৃতি এমন কি সমগোত্র থেকে জাত এই রাজগণের প্রতি প্রজার আনুগত্যও ছিল অসীম।

(ঘ) অতীব দুর্দিনে বা রাষ্ট্রবিপ্লবেও—এতদঞ্চলে রাজতন্ত্রের যুগে কখনো প্রজাবিদ্রোহের ঘটনা পাওয়া যায় না। বরং রাজশক্তির বিপদের দিনে, মধ্যযুগীয় মানসিকতা নিয়েও—তারা চিরকাল রাজার সাহায্য ও সহযোগিতার উৎসরূপে দেখা দিয়েছে। নগরী অধিকৃত হলে বহিরাগত শত্রুকে তাড়াতে রাজার ডাকে তারা আপন আপন শস্যভাণ্ডার পর্যন্ত পুড়িয়ে শূন্য করে দিয়েছে। স্থানীয় প্রজাগণের এই সহযোগিতা ও ভালোবাসাই উত্তরের রাজশক্তিগুলিকে পূর্বাপর বহিরাক্রমে ধ্বংস বা পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

(ঙ) উত্তরবঙ্গ নামক প্রাকৃতিক ভূখণ্ড প্রায় কখনোই একটি শাসনতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়নি। প্রধানতঃ এই ভূখণ্ড ত্রিকেন্দ্রিক শাসনেই শাসিত হয়ে এসেছে। মূলতঃ এই কারণেই উত্তরবঙ্গের একীভূত ইতিহাস পরিচিতি গড়ে ওঠেনি। বিষয়টি একটু বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

## ৫. উত্তরবঙ্গে ত্রিকেন্দ্রিক শাসন

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা গেছে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূভাগ ভৌগোলিক কারণেই তিনটি শাসন-পীঠ থেকে শাসিত হয়েছে। পশ্চিম পূর্ব এবং দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রায় নির্দিষ্ট রাজধানী থেকেই এই শাসন প্রচলিত ছিল। ত্রিকোণ উত্তরবঙ্গের নিম্নতম বাহু হিমালয়-সন্নিহিত; এই বাহুই দ্বিধা-বিভক্ত

হয়েছে, দুর্জয় নদী প্রাচীন করোতোয়া (বৈদিক সদারীনা) এবং আধুনিক তিস্তা-কর্তৃক। এক দিকে তিস্তা-করোতোয়া এবং অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র এই দুইয়ের কৌণিক মিলনের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গভূমি প্রায় সব সময়ই প্রাক্-জ্যোতিষ, কামরূপ বা কামতাপুর থেকে শাসিত হয়েছে। করোতোয়ার পশ্চিমে ও কোশী নদীর পূর্ববর্তী ভূখণ্ডে দীর্ঘ-জীবী রাজতন্ত্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত। প্রাক্-আর্য যুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত এ অঞ্চলের শাসন কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়। আর একেবারে গঙ্গানদী-সন্নিহিত দক্ষিণতম-প্রান্তেও, অন্ততঃপক্ষে খৃ. পূ. চতুর্থ শতাব্দ থেকে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্ত বঙ্গভূমির প্রায় মধ্যদেশে অবস্থিত বলে এবং মগধ-পাটলিপুত্র-পাটনাব রাজপাট থেকে সংযুক্ত, নদী-বন্দরের বাণিজ্যিক, সামরিক, সুবিধা থাকায় এতদঞ্চলে বহুকাল বাংলার রাজনীতির মূল রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। গঙ্গাবিধি সাম্রাজ্যের রাজধানী তথা গৌড-রামাবতী-লক্ষণাবতো আদিনা-স্থিত পরবর্তী রাজপাটগুলি এই সত্যকে তুলে ধরে। আর এখানে বলশালী রাষ্ট্রশক্তির উত্থান ঘটলে তার ব্যাপ্তি উত্তরবঙ্গের একটি বড অংশে থাকবে সে তো স্বাভাবিক কথা।

এই তিনটি শাসন-কেন্দ্রের মধ্যে প্রাচীন কালের সবচেয়ে খ্যাত কেন্দ্র ছিল পশ্চিম-কেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন; কিন্তু গুপ্তযুগের শেষে এই পশ্চিমাঞ্চলটি কখনো দক্ষিণী শাসন-কেন্দ্রের আওতায়, কখনো পূর্বী শাসনকেন্দ্রের আওতায় শাসিত হয়েছে, অর্থাৎ কখনো গৌড়ী এবং কখনো কামরূপীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কোচরাজতন্ত্রেব যুগে পশ্চিমাঞ্চলে অবশ্য একটি ছোট অঙ্গরাজ্যের অর্থাৎ বৈকণ্ঠপুরের শাসন চালু হয়। বিভিন্ন সময়ে এই অঙ্গরাজ্য অবশ্য প্রকাবান্তরে স্বাধীনতাই ভোগ করতে থাকে—এবং সেই অর্থে প্রায় সমকালেও—ত্রিকোণীয় শাসনের ক্ষীণ ধারাটি বর্তমান ছিল। তিস্তা-করোতোয়ার দুরতিক্রম্যতাব ক্রমাবনতিই পশ্চিম ভূখণ্ডে স্বতন্ত্র শাসন-পাট গডে ওঠার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে এবং অঞ্চলটি হয় কামরূপীয় না হয় গৌড়ীয় শাসনের আওতাভুক্ত হওয়ার দোদুল্যমানতায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। যে কারণে এই পশ্চিমাংশের স্বতন্ত্র ইতিহাস বা ইতিহাসে স্বতন্ত্র উল্লেখ দু'টিই বন্ধ হয়ে যায়। আবার উত্তর-বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ড অর্থাৎ তিস্তা-করোতোয়ার পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশের বঙ্গভূমিটি—কামরূপীয় শাসনে, থাকায়—বাংলার ইতিহাসে তার ধারাবাহিক ঘটনাবৃত্ত রক্ষা করা হয়নি। অপরদিকে উত্তরবঙ্গের দক্ষিণাংশ—বাংলার মূল রাজনৈতিক ঘটনার কেন্দ্রভূমি হয়ে ওঠায়, সে ইতিহাস বাংলার

সাধারণ ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়, উত্তরবঙ্গের বিশেষ ইতিহাস নয়। এই তিনটি কারণ একসঙ্গে যুক্ত করলে বোঝা যাবে—এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের নিজস্ব ইতিহাসের গণ-পরিচিতি এত কম কেন। অথচ ত্রিকেন্দ্রিক শাসনেব ত্রিস্রোতা ইতিবৃত্ত থেকে চয়ন করে নিলে—এই বিশাল ভূখণ্ডেব সুশৃংখল ও ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রিত করা সম্ভব।

## ৬. বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য

ত্রিকেন্দ্রিক শাসনের ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের কালানুক্রম বক্ষা করা মাঝে মধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে। যেহেতু ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রত্যেক কেন্দ্রে সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে—ফলে কোন একটি শাসন-কেন্দ্রের একটি অধ্যায় সমাপ্ত করতে যে যুগে এসে পড়া যায়, অন্য একটি কেন্দ্রের আলোচনা-আরম্ভে আবার তৎপরবর্তী যুগ থেকে শুরু করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উত্তবঙ্গের ত্রিকেন্দ্রিক শাসনেব এই রহস্যটি মনে রেখে আশাকরি পাঠক গ্রন্থমধ্যে কালানুক্রম-ভঙ্গের অপরাধ মার্জনা করবেন। তবুও শতাব্দীর পর্যায়ক্রমে মূল ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা বক্ষা করে একটি সরলীকৃত ইতিহাস এতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের আরো দু'টি স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটির প্রতি পাঠককে প্রথম থেকেই অবহিত কবে বাখা ভালো। এই গ্রন্থের মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য একটি বদ্ধমূল ভ্রান্তি সাধারণ পাঠক-মন থেকে দূব করা যে, কোচ-রাজতন্ত্রের পূর্ববর্তী যুগের উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ধারাবাহিকতা-বিচ্ছিন্ন। আমরা দেখাতে চেয়েছি কত প্রাচীনকাল থেকে এখানকার মানুষ, তার বিবর্তনশীল সংস্কৃতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইতিহাসের সোপান বেয়ে; দেখাতে চেয়েছি রাজনৈতিক উত্থানপতনের ধারা বেয়ে কিভাবে এগিয়ে চলেছে—এর ইতিহাস। বিশাল সময়ের পরিধিতে একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের পূর্বাপর ইতিহাস রচনায়, গ্রন্থের কলেবর ক্ষীণতম রাখার আবশ্যিক শর্ত রক্ষার্থে, দু'টি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে (ক) রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-ব্যাখ্যান বর্জন এবং (খ) যেসব অধ্যায়ের ইতিহাস—বাংলার মূল ইতিহাসের ঘটনা-সম্পৃক্ত, সে সব অধ্যায়ের—আলোচনার সংক্ষিপ্তকরণ; কারণ সে ইতিহাস সাধারণ পাঠকের জানা। বাংলার সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল ও সম্পৃক্ত ইতিহাসের,

থেকে শুধু সেই তথ্যই গ্রহণ করা হয়েছে—যা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিকতা সৃজনে আবশ্যিক।

চেষ্টাকৃত সম্ভাব্য ক্ষীণতর কলেবরের এই গ্রন্থ শুধু তীক্ষ্ণতর একটি সূত্র দিয়ে আত্মবিস্মৃত উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে গ্রথিত করে যাবে, যথার্থ ইতিহাস-গবেষকের কাছে বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর বিশ্লেষণে উত্তরবঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার আকৃতি তুলে ধরে। মানববিকাশের ধূসরতম কাল থেকে সাম্প্রতিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের এই ভাষণাত্মক রচনায় সাধারণ পাঠকের মনে—এতদঞ্চলের জীবন ও রাষ্ট্রপ্রবাহের সরলতম রেখাটিকে ধারাবাহিকতায় মুদ্রিত করে দিতে পারলেই বর্তমান লেখকের প্রয়াস ও অভিলাষ চরিতার্থ হবে।

———

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# প্রাগৈতিহাসিক উত্তরবঙ্গ

( খৃ. পূ. ১০,০০০ বছর থেকে খৃ. পূ. ১৫০০ বছর )

## ১. ভূমিকা

উত্তরবঙ্গে মানব-বসতিব ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। ভারতে মানব-প্রজাতি প্রবাহেব সব ক'টি ধারা এই ভূখণ্ডেব উপব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। আর্যদের অনেক আগে দ্রাবিড়গণ এখানে রাজত্ব করেছেন, তারও আগে অষ্ট্রিকেরা কৃষির বিকাশ ঘটিয়েছেন, এমন কি মধ্যপ্রস্তরযুগে ভারতের প্রথম অভ্যাগত মানবগোষ্ঠী নেগ্রিটোবাও একদিন এখানে পদ-চারণা করেছেন এবং এই পথ দিয়েই চলে গেছেন সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে। অনিবার্য যুক্তি ও তথ্যের উপবে এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত এবং পববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাবে।

কিন্তু নেগ্রিটোগণ মাত্র খৃ. পূ. দশ সহস্র বৎসর পূর্বের লোক অথচ বিশ্বে মানব-বিকাশেব ধাবায় সূত্রপাত ঘটেছে আনুমানিক দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। বিশ্ব মানব-বিকাশেব ধারায় ভারতের যে নিশ্চিত ভূমিকা ছিল, উত্তর-বঙ্গের উপব সে ভূমিকা পালনের কতটুকু দায়িত্ব ছিল, 'হোমিনিড্' গোষ্ঠীর জীবাশ্ম উত্তরবঙ্গের মাটিতে আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত—সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কোনো মন্তব্য করা কঠিন। তবে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও পণ্ডিতদের মতবাদের অনুসরণে একথার অনুমান করা যায় যে—'প্রায় মানবদের' পূর্ব-পশ্চিমের যাত্রা-পথের অন্তর্ভুক্ত ছিল হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ। কথাটি কিঞ্চিৎ বিশদ করে তোলা যাক।

## ১. মানব-বিকাশের ধারা ও উত্তরবঙ্গ

পণ্ডিতদের ধারণা পৃথিবীর বয়স প্রায় ২০০ কোটি বছর হলেও—এই পৃথিবীতে মানুষের বিকাশ-ধারার সূত্রপাত মাত্র আড়াই কোটি বছর আগে অর্থাৎ 'মায়োসীন' যুগের প্রথমে মনুষ্যেতর প্রাণী 'হোমিনয়েডে'র থেকে।

'হোমিনিড্' গোত্রীয় প্রাণীদেহে বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানব-বিকাশের দীর্ঘ ধারার সূচনা হলো। প্রায় ৮০ লক্ষ বছর আগে 'প্রায় মানব'দের একটি শাখা 'রামাপিথেকাস'-গণ ভারতের মাটিতেই বর্ধিত ও বিবর্তিত হচ্ছিল, ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত তাদের জীবাশ্ম থেকেই তা প্রমাণিত। বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ্ লিকির মতে এই 'রামাপিথেকাস'গণই হল 'অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস' যারা আফ্রিকা মহাদেশে বিচরণ করেছে আজ থেকে ২০ লক্ষ বছর পূর্বে। এক সময় আফ্রিকার গণ্ডী ছাড়িয়ে 'অস্ট্রালোপিথেকাস্'রা ছড়িয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগর হয়ে ভারতের দিকে এবং তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। আবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আদি-প্রস্তর-যুগের সূত্রপাতে 'পিথেকান্‌থ্রোপাস'-গণ বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল 'হোমো-ইরেক্টাস' বা পূর্ণ মানবে এবং বর্মা ও ভারতের মধ্য দিয়ে তারাও ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে। 'পিথেকান্‌থ্রোপাস'দের হাতিয়ার, করোটি ও কঙ্কাল পাওয়া গেছে ঐসব মহাদেশে।

আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হলো এই যে, ব্রহ্মদেশ ও আসামের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবিষ্ট এবং ভারত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রস্থিত এই সব আদি মানব পিথেকান্‌থ্রোপাস বা প্রায় মানব অস্ট্রালোপিথেকাসরা অবশ্যই হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে; কারণ—দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ খৃ. পূ. চার হাজার বছর আগেও জলমগ্ন ছিল এবং প্রাগৈতিহাসিক এই মানবশ্রেণীর পক্ষে নৌকা তৈরী একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার ছিল। ভবিষ্যৎ কালের গবেষণার এ প্রসঙ্গে হয়তো আরো ব্যাপক আলোকপাত করা সম্ভব হবে।

## ২. উত্তরবঙ্গে প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার নিদর্শন

প্রস্তর যুগের সময়-সীমা নিরূপণ করা দুরূহ। তবে এই সময়-সীমায় চার চারটি হিমবাহের যুগ অতিবাহিত—এ থেকেই এ যুগের বিস্তৃতি অনুমেয়। এই চারিটি হিমবাহ যুগের মধ্যবর্তী তিনটি আন্তঃহিমবাহ যুগে ভারতে আদি-প্রস্তর-যুগীয় জন-বসতি ও তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া যাচ্ছে—ভারতের চারিটি বিশেষ ভূখণ্ডে যথা—(১) পাঞ্জাব (২) জম্মু-কাশ্মীর (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি থেকে ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত এবং (৪) উত্তরবঙ্গ ও আসামের পার্বত্যময় অরণ্য অঞ্চলে। এর মধ্যে শোন নদীর অববাহিকা অঞ্চলেই আদি-প্রস্তর যুগের নিদর্শন ব্যাপকতা ও বিকাশের ধারাবাহিকতা নিয়ে উপস্থিত।

উত্তরবঙ্গে এ যুগের হাতিয়ার ও অন্যান্য নিদর্শন সংগ্রহের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রযাস আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবু দৈবক্রমে যেসব নিদর্শন হাতে এসেছে তাতে মধ্য ও নব্য প্রস্তরযুগীয় স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক ই এইচ. সি ওয়াল্‌স্‌ দার্জিলিং জেলার নিম্ন-হিমালয়ের পাহাড়ী এলাকায় খুঁজে পান প্রস্তর যুগের নানা হাতিয়ার। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি সমীক্ষক দল কালিম্পং-এর ঢালু পর্বত-গাত্রে আবিষ্কার করেন—কোয়ার্টজ, ডায়োরাইট ইত্যাদি প্রস্তরে গঠিত বেশ কয়েকটি নব-প্রস্তরযুগীয় কুঠার। এই হাতিয়ারগুলি ঘষে মসৃণ ও তীক্ষ্ণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ঐ সমীক্ষক দল বিলী নদীর উপত্যকায় এবং স্থানীয় গ্রামাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন কয়েকটি নিক্ষেপযোগ্য পাথর এবং আরো দু'একটি নিদর্শন। ঐ সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি হাতীর মুখের কঙ্কাল যা প্রাচীন শিবালিক যুগের নিদর্শন বলে অনুমিত হয়েছে।

কালিম্পং-এর নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলে ও নদী অববাহিকা থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রস্তর যুগের। এই হাতিয়ারগুলির মধ্যে—রয়েছে দীর্ঘাকৃতি কুঠার, স্কন্ধযুক্ত কুঠার, পাথরের ছেনী, খাঁজকাটা হাতিয়ার এবং নানা শ্রেণীর কোদালী। এছাড়াও রয়েছে ছিদ্র-যুক্ত কুঠার এবং ছিদ্র-যুক্ত ছোট পাথর যা মালাও হতে পারে আবার জালের কাঠিও হতে পারে। পণ্ডিতদের অনুমান তুরপুন ও বালির সাহায্যে এই ছিদ্রগুলি করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে কাশ্মীর থেকে আসামের মধ্যে প্রাপ্ত ছিদ্র-সমন্বিত নানা প্রস্তরযুগীয় নিদর্শন সভ্যতার সংযোগ ও ধারাবাহিকতাকে প্রমাণিত করে।

"কালিম্পং-এর নিকটবর্তী চত্বরসমূহ ও ঢাল-এ প্রাপ্ত সমগ্র সংগ্রহের মধ্যে বিশেষভাবে মূল্যবান বিবেচিত হবে সবুজাভ জেডাইট প্রস্তরের একটি অলংকার। এই মনোরম সছিদ্র নিদর্শনটি সম্ভবতঃ কোনো কণ্ঠহারের দীর্ঘাকৃতি লকেট-রূপে শোভিত হত। এই নিদর্শনটির সঙ্গে কাশ্মীরে বুরজা হোমে আবিষ্কৃত পূর্ববর্ণিত শস্যচ্ছেদক অথবা অলংকারের কিছুটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।"[১]

দার্জিলিং জেলায় আবিষ্কৃত নব্য-প্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারগুলি সাধারণতঃ 'ডায়োরাইট' নাইস্‌, চার্ট, ফিলাইট এবং কোয়ার্টজাইট পাথর থেকে তৈরী।

---

১ প্রাগৈতিহাসিক বাংলা (শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত-কৃত) পৃ. ৭৯

এগুলির গঠন প্রাকৃতিতে সমকালীন চৈনিক নবাশ্মীয় হাতিয়ারের সাদৃশ্য দৃষ্টে কেউ কেউ মনে করেন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর তথাকথিত 'কিরাত' জনই উত্তববঙ্গের সীমায় একদা এই প্রস্তর যুগের নিদর্শনাদি ব্যবহার করে গেছেন এবং প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতায় নতুন সম্পদ যুক্ত করেছেন।

উপযুক্ত সন্ধান ও গবেষণার অভাবে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিতে এখনো পর্যন্ত নবাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। অথচ ইতিহাসের ইঙ্গিত এবং মানব-প্রবাহের ধারা দৃষ্টে একথা অনুমান করা সঙ্গত হবে যে—প্রস্তর যুগীয় সভ্যতার ব্যাপক নিদর্শন উত্তরবঙ্গের মৃত্তিকাতলে আবিষ্কারের অপেক্ষায় বর্তমান। উত্তরবঙ্গের অরণ্য-ভূমিতে একদা-জাগ্রত জনপদে, সুউচ্চ নদীখাতে এবং উপত্যকায়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরযুগীয় সভ্যতাব সমতুল্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। বরেন্দ্রভূমির ভূপ্রকৃতি অতি প্রাচীন সভ্যতার অস্তিত্বকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পশ্চিম দিনাজপুরে পুনর্ভবা নদীর তীবে অবস্থিত মহাভারতের যুগের রাজধানী বাণগড়ে খননকার্য চালাবার সময় ভূপৃষ্ঠেব ১৬২ ফুট নীচে পাওয়া গেছে নব্য-প্রস্তরযুগীয় একটি কুঠার। 'আবিষ্কৃত কুঠারটি হলুদ বর্ণের 'ফ্লিন্ট' পাথরকে পরিকল্পিত ও সংযত আঘাতের দ্বারা একটি মনোমত তিনকোণা আকৃতি দান ক'রে এবং পরে ঘষে (তীক্ষ্ণ ও মসৃণ) বানানো।'[১] প্রস্তর নির্মিত এই সব উন্নত জাতের অস্ত্রপাতি দেখে মনে হয় দ্রাবিড়দের আগমনের আগে এই জনপদে অষ্ট্রিকগণ বা তাদেরও পূর্ব পুরুষ নেগ্রিটোগণ বসতি বিন্যাস করেছিল। সে যাই হোক—উত্তরবঙ্গে ব্যাপক গবেষণার অভাবে প্রস্তরযুগীয় নিদর্শনাদির প্রাপ্তি সংখ্যা সীমিত হলেও এতদঞ্চলে প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও প্রসার আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

## ৩. নেগ্রিটো জাতি-প্রবাহ ও উত্তরবঙ্গ

(খৃ. পূ. ১০,০০০ বছর থেকে খৃ. পূ. ৭৫০০)

ভারতের শেষ তুষার যুগের পর থেকে ঐতিহাসিক কালের সূত্রপাতের মধ্যবর্তী সময়ে—উত্তরবঙ্গের বিশাল প্রান্তরে যে দুটি প্রধান মানব-গোষ্ঠীর

১ প্রাগৈতিহাসিক বাংলা- পৃঃ ৮১

স্রোত বয়ে গেছে—তাদের মধ্যে প্রথমে এসেছিল নেগ্রিটোগণ। এদের মূল নিবাস ছিল আফ্রিকা এবং প্রধান জীবিকা ছিল পশু-শিকার। তাছাড়া আরণ্য-ফলমূল সংগ্রহেও ক্ষুন্নিবৃত্তি করে বেঁচেছিল এরা। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, ফলমূলের অভাব-জনিত প্রেরণায় অথবা শিকার যোগ্য প্রাণীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতেই এরা বেরিয়ে পড়েছিল আফ্রিকা থেকে এবং মধ্যপ্রাচ্য পেরিয়ে একদা ভারতে প্রবেশ করেছিল—খৃষ্টপূর্ব দশ সহস্রাব্দের কাছাকাছি সময়ে।

প্রাচীন ভারতের ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, নেগ্রিটোগণ ভারতের সর্বত্র বিচরণের সুবিধা পায়নি। কারণ তৎপূর্বে ভারতে চতুর্থ তুষার যুগ ও তৎপর্ববর্তী তৃতীয় হিমবাহযুগে উত্তর ভারতেব বিস্তৃত সমতলভাগ অবনত ও জলমগ্ন হয়ে যায় এবং আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্বের আগে তা জনবসতির যোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাই অনুমান করা হয় যে, নেগ্রিটোগণ ভারতের পার্বত্যময় উচ্চভূমি বা দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি শাখা আরাবল্লী পর্বতমালা পেরিয়ে দক্ষিণ ভারত ঘুরে, ছোটনাগপুর রাজমহল হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে এবং অপব শাখা হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য-উচ্চভূমির পথে উত্তরবঙ্গে উপনীত হয়। এই দুইটি পথেই মধ্য ও নব্য প্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারের নিদর্শনগুলি থেকে সে অনুমান বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নেগ্রিটোদের ব্যাপক অবস্থিতি থেকে অনুমান করা হয় যে, এরা আসাম ও ব্রহ্মপুত্রের পথেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপনীত হয় এবং সেক্ষেত্রে হিমালয়-সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের পথে প্রস্থান করা ছাড়া এই অনুন্নত মানব সম্প্রদায়ের অন্য কোনো গত্যন্তর থাকার কথা নয়।

আধুনিক ভারতে নেগ্রিটোদের বংশধরগণের অবস্থিতিও উক্ত পথ-পরিক্রমার তত্ত্বকে সপ্রমাণ করে। বর্তমানকালেও এদের বংশধর বলে চিহ্নিত হয়েছেন—ত্রিবাঙ্কুর পর্বতশ্রেণী ও কোচিনে বসবাসকারী কাদার ও পালয়গণ, ওয়ানাদের ইরুলাগণ, রাজমহল পাহাড়ের কয়েকটি আদিবাসী এবং আসামের আঙ্গামি শ্রেণীর নাগা-সম্প্রদায়। বাদ বাকী ভারতস্থিত নেগ্রিটোগণ হয় বিলুপ্ত হয়েছে নতুবা ভারতের পরবর্তী জনপ্রবাহ অষ্ট্রিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

যাই হোক উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রায় যাযাবর নেগ্রিটোগোষ্ঠী যে একদা বসবাস করেছিল এবং এই পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবেশ করেছিল, এতে আজ,

সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। তবে এতকাল পরে এবং প্রজাতি-মিশ্রণের অসংখ্য ধারায় পড়ে উত্তরবঙ্গের জনসম্প্রদায়ের মধ্যে নেগ্রিটোদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার কোনো উপায় আজ আর অবশিষ্ট নেই, তবু এদের সাংস্কৃতিক স্পর্শ রয়ে গেছে উত্তরবঙ্গের লোক-জীবনের মর্মমূলে। এদেরই কাছ থেকেই ভারত তথা উত্তরবঙ্গের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসে রয়ে গেছে নেগ্রিটো-সংস্কৃতি—বৃক্ষপূজায়, প্রজনন ও উর্বরাশক্তির উপাসনায়; মৃতের আত্মার অস্তিত্ব-ভীতিতে, স্বর্গের পথ কল্পনাতে। নেগ্রিটোদের দু' একটি শব্দও রয়ে গেছে ভারতীয় তথা উত্তরবাংলার ভাষাতে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা 'বাদুড়' কথাটা এসেছে মূল নেগ্রিটো ভাষা থেকে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। [ নেগ্রিটো বাড্ >বাদুরিকা ( সং ) >বাদুড, বাদুড়ী ( ওড়িয়া ) >বাদুড় ( বাংলা )। ]

## ৪. অষ্ট্রিক-মানব-গোষ্ঠী ও উত্তরবঙ্গ

( খৃ. পূ. ৭৫০০ থেকে ৪৫০০ খৃ. পূ. )

নেগ্রিটোদের পরে, আনুমানিক ৭৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ করে অষ্ট্রিক-জন-গোষ্ঠী। এদেরও প্রবেশ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে। ভারতবর্ষে এই মানবগোষ্ঠীর ধারাও প্রবাহিত হয় সেই জনপদ পথে যে পথ বেয়ে একদা এগিয়ে গিয়েছিল নেগ্রিটো-জন-গোষ্ঠী। তবে নেগ্রিটোরা ছিল যাযাবর শ্রেণী; খাদ্য সংগ্রহই ছিল তাদের জীবন-চর্যা কিন্তু অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর মানুষ চাষাবাদ জানতো এবং তারা গড়ে তুললো কৃষিভিত্তিক স্থায়ী জনপদ; স্থায়ী আবাস-গৃহযুক্ত গ্রামীন সংস্কৃতি। যদিও নব্য-প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি নিয়ে এরা ভারতে এসেছিল কিন্তু দ্রাবিড়গণের ভারতাগমনের আগেই এরা তাম্রযুগে প্রবেশ করেছিল—তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যাধিক্য মানুষের মধ্যে অষ্ট্রিক রক্ত ও শারীর গঠন লক্ষ্যণীয়। আর্য-সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অধিগৃহীত এই জনগোষ্ঠী নিম্নবর্ণীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশ গড়ে তোলে।

অষ্ট্রিক-জন-গোষ্ঠী বিপুল সংখ্যায় উত্তরবঙ্গেও প্রবেশ করেছিল। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক আসাম ও ব্রহ্মদেশের পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

যাই হোক ভারত তথা উত্তরবঙ্গের জন-জীবনে অষ্ট্রিকেরা শুধু নৃতাত্ত্বিক অস্তিত্বই রক্ষা করেছে তা নয়—আমাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে রেখে গেছে অবিনশ্বর ছাপ। ভারতে এখনো অষ্ট্রিক ভাষায় কথা বলে—কোল ও মুণ্ডাগণ, যাদের ভাষায় আজও ময়ূরকে বলা হয় 'মোর্ক' ( যার মূল অষ্ট্রিক ), যা থেকে হিন্দি 'মোর' এবং বাংলা 'ময়ূব' শব্দের জন্ম। প্রাচীন অষ্ট্রিকের আধুনিক প্রতিরূপ—কোল ও মুণ্ডা ভাষায় "জম" ( খাওয়া )-এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে প্রাচীন আর্যভাষা 'চাম' ( অচাম ), মধ্য-আর্যে যা 'চামলা' এবং আধুনিক বাংলায় যা বিবর্তিত হয়ে এসেছে—'চাউল' বা 'চাল'। ভাষাচার্য স্নুনীতিকুমার আরো দেখিয়েছেন যে কীভাবে মূল অষ্ট্রিক শব্দ থেকে এসেছে তৎসম বাংলা শব্দ 'যব' 'গোধূম' ( >বাং গম ), তাম্বুল, অলাবু ( >বাং লাউ ), নিম্বুক ( >বাং নেবু ), বাতিঙ্গন ( বাং বেগুন ), জম্বু ( বাং জাম ), কন্দলী, ( বাং কলা ) শাল্মলী, কুক্কুট, মাতঙ্গ, গজ, বাণ ইত্যাদি।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক বিষয়ই অষ্ট্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিব উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত। এরাই প্রথম আমাদের দেশে প্রবর্তিত করেছে ধান ও গমের চাষ, এনেছে মৃৎপাত্র তৈরীর কৌশল; লাউ-কুমড়া-বেগুন প্রভৃতি সব্জীর চাষ; আখ থেকে চিনি তৈরীর কৌশল এরাই আবিষ্কার করেছে; এদের কাছ থেকেই আমাদেব জীবনে এসেছে হলুদ ও সিন্দুরের ব্যবহার। এরাই আমাদের শিখিয়েছে হাতী পোষা, শিখিয়েছে স্নতী আর সিল্কের কাঁপড় বোনার পদ্ধতি। কুড়ি কুড়ি করে গোণার রীতিও এসেছে অষ্ট্রিক-সংস্কৃতি থেকে; যা আজও কোল ও মুণ্ডারা শুধু নয়—গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ আজও এ রীতিতে গণনা করে থাকেন। অনেকের মতে—আত্মার অবিনশ্বরতার বোধ এবং জন্মান্তরবাদের প্রাথমিক ধারণা অষ্ট্রিক-ধর্ম-বিশ্বাস-সঞ্জাত। লোক-জীবনে প্রচলিত নানাপ্রকার 'ট্যাবু'ও এসেছে অষ্ট্রিক জনজীবন থেকে।

আর্যগণ তাঁদের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীকে বলেছেন 'নিষাদ'। ঋক্-বেদের 'নাষাদীয়' স্নক্তগুলির মধ্যে হয়তো অষ্ট্রিক ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের সার-সংগ্রহই করা হয়েছে। প্রাচীন আর্য সভ্যতা অষ্ট্রিক সংস্কৃতির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। 'তিথি' দিয়ে মাস গণনার রীতিটি পর্যন্ত অষ্ট্রিক; প্রাচীন অষ্ট্রিক শব্দ জাত 'রাকা' ( পূর্ণচন্দ্র ) এবং 'কুহু' ( প্রতিপদের চাঁদ ) প্রভৃতি আর্যশব্দ মূল অষ্ট্রিক শব্দার্থ আজও হারায় নি। সংস্কৃত 'মাতৃকা' শব্দ পলিনেশীয় ভাষাতে যা 'মাতারিকি'—মূলে অষ্ট্রিক শব্দ জাত।

অনেকে অনুমান করেন পুরাণাদির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কাহিনীর অনেকগুলিই, যথা 'অণ্ড' থেকে বিশ্বের জন্ম, অবতার-বাদ ইত্যাদি অষ্ট্রিক লোকবিশ্বাস থেকে জাত। যাই হোক, আর্যদের আগমনের কাল থেকে আনুমানিক ১০০০ খৃ. পূর্বাব্দের মধ্যেই অষ্ট্রিক জনগোষ্ঠীর ভাষা আর্যায়িত হতে থাকে; এবং তারা নিজেরাও আর্য-সংস্কৃতি ও জন-বিন্যাসের মধ্যে মিশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সমাজের প্রধানতঃ শ্রমজীবী কৌমের মুখ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

## ৫. উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী

ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্ববর্তীকালে মঙ্গোলীয় ও আলপানীয় জনগোষ্ঠী এদেশে আসেন। আনুমানিক দুই হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর একটি ধারা বর্মা-সীমান্ত এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ধরে আসাম ও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এদের আরেকটি শাখা তিব্বত হয়ে নেপাল, সিকিম ও ভুটানের পথে উত্তর ভারত তথা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে এদের 'কিরাত' জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও আসামের রাজনীতি, সমাজ-গঠন, ভাষা-ভঙ্গি ও সংস্কৃতির মধ্যে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষের প্রত্যক্ষ দান ও প্রভাব আজ পযন্ত ক্রিয়াশীল।

## ৬. আল্‌পানীয় নরগোষ্ঠী

আলপানীয় নরগোষ্ঠীর তিনটি শাখা বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করে, যথা—আলপানীয়, দিনারিক ও আর্মেনীয়। এরা ভারতে এসেছিল—মধ্য এশিয়ার পার্বত্য ভূমি থেকে। আল্পানীয় ও দিনারিক গোষ্ঠীর লোকই ভারতের বৃহত্তর ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে; তন্মধ্যে আবার নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালীদের মধ্যে 'দিনারিক' নরগোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাধিক। যাই হোক—জন-গঠনে এসব শ্রেণীর মানব-গোষ্ঠীয় মিশ্রণ বিশেষভাবে চিহ্নিত করা গেলেও ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দিনারিক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ প্রভাব আজ আর কিন্তু সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

## ৭. ভারত তথা উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী

( খৃ. পৃ. ৪৫০০ থেকে খৃ. পূ. ১৫০০ বছর )

অষ্ট্রিকদের পরে এবং আর্যদের আগে ভারতে প্রবেশ করেছিল দ্রাবিড় জাতি। এরা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় এবং দ্রাবিড় ভাষী হলেও এই নরগোষ্ঠীর মধ্যে নৃতাত্ত্বিক গঠনের ব্যাপক বৈচিত্র্য ও পার্থক্য ছিল। এদের মধ্যে প্রথম ধারাটি ছিল মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন, কৃষ্ণকায় ও লঘু-শরীর। আনুমানিক ৪৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে এরা ভারতে প্রবেশ করে এবং মূলতঃ দক্ষিণ ভারতে প্রতিপত্তি লাভ করে। কান্নাড, তামিল ও কেরলে এদের বংশধরেরা এখনো সংখ্যাধিক।

এর পরবর্তী দ্রাবিড় গোষ্ঠী, ভূমধ্যসাগরীয় হলেও, প্রথম গোষ্ঠীর তুলনায় দীর্ঘকায়, উজ্জ্বলবর্ণ এবং দৃঢ়-গঠন। এরা সম্ভবতঃ ৩৭০০ খৃ. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং সমগ্র পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়া আরো পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ ৩০০০ খৃ. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে অপর একটি দ্রাবিড়-জন-শাখা ভারতে প্রবেশ করেছিল, যাদের শারীর বৈশিষ্ট্য ছিল—উন্নত নাসিকা, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকান্তি। এরা প্রধানতঃ রাজপুতনা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর প্রদেশ এমন কি পূর্ব ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

পূর্ববর্তী অষ্ট্রিকগোষ্ঠী যেমন ছিলেন কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার বাহক, নবাগত দ্রাবিড়রা ঠিক উল্টো—অর্থাৎ নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক। তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী নগর-রাষ্ট্রের পত্তন করে এবং সুপরিকল্পিত স্থাপত্য-কর্মে নিপুণ সৌধময় নগরী গড়ে তুলতে থাকে। ভারত-প্রবেশের পথে এবং ভারতে উপনিবেশ গঠনের প্রয়াসে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে আর্যগণ যে 'দাস-দস্যু' জাতির সঙ্গে দীর্ঘপ্রসারী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল—সেই 'দাস-দস্যু' জাতিই আসলে দ্রাবিড়-জাতি। এদের নাগরিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রশক্তির বিকাশ ঘটেছিল—মহেঞ্জোদারো-হরাপ্পাতে, রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত তথা সিংহলে। আবার পূর্ব ভারতে ছোটনাগপুরে রাঢ়ীয় পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতেও দ্রাবিড় রাজশক্তির উত্থান ঘটেছিল—প্রাক-আর্যযুগে।

বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর তীরে আবিষ্কৃত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে প্রাপ্ত লৌকিক জন-জীবনের সকল চিহ্নই বোধহয়—সেখানে উন্নত

অষ্ট্রিক জনপদের পরিচিতি তুলে ধরে এবং তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির পুরুষ-মূর্তি দু'টির মুখাবয়ব, আয়ত নয়ন, দীর্ঘ নাসিকা, বিস্তৃত কর্ণ, সুস্পষ্ট চিবুক, কৌণিক শিরস্ত্রাণ, পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রাকৃতি লৌহ-তরবারিতে (শিল্পীব আঁকা বিদেশী আক্রমণকারীর প্রতিচ্ছবি)। এই পুরুষ মূর্তিদ্বয়—তৃতীয় ধারায় আগত দ্রাবিড় শ্রেণীর নরগণের প্রতিচ্ছবি বলেই মনে হয়। তা যদি হয় তবে বলতে হয়, খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দে এতদঞ্চলে দ্রাবিড়-রাজশক্তির আক্রমণ ঘটে এবং শিল্পী সেই বহিরাগত শত্রুর মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করেন। তার কিছুকাল পরেই দ্রাবিড় আক্রমণে অষ্ট্রিক-জনপদের এই সচ্ছল নগব, বন্দর বা রাজধানীটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

## ৯. উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়-সংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে

তবে প্রায় দেড হাজার খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দ্রাবিড়দের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, অর্থাৎ বহু-খ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন আত্মপ্রকাশ করে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে শুধু উত্তরবঙ্গের গণজীবনে দ্রাবিড়দের প্রধান প্রধান দান ও প্রভাবের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা যাক। দ্রাবিড়-ভাষায় আধুনিক দাক্ষিণাত্য কথা বললেও—বাংলাভাষায় বেশ কিছু দ্রাবিড় শব্দ আজও রয়ে গেছে, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের স্থান নামে। এমন কি দু'একটি দেশী প্রচলিত বাংলা শব্দের মাধ্যমে। যথা—দ্রাবিড় কোট্টাই (শক্ত ঘর) >বাংলা কোঠা, কুঠি, উত্তরবঙ্গে 'কুচি'। এ ছাড়া বল্লম, তরয়াল, ভেলা প্রভৃতি শব্দও মূলতঃ দ্রাবিড় শব্দ-জাত!

আর্যদের জীবনচর্যা ও ধর্মবোধের গভীরে দ্রাবিড়দের স্থায়ী প্রভাব রয়েছে চিহ্নিত। হিন্দু-ভারত 'পূজা' নামক ব্যাপারটাই গ্রহণ করেছে দ্রাবিড়-সংস্কৃতি থেকে। মাতা-ঈশ্বর বা ঈশ্বরের মাতৃশক্তির ধারণা দ্রাবিড়দের কাছ থেকে আযগণ গ্রহণ করেছেন। দ্রাবিড 'পশুপতি' পুরুষ-দেবতা আর্যায়িত হয়ে এবং 'রুদ্রের' স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে—'শিব' নামে পরিচিত হন।

যাই হোক—পার্থিব সম্পদ, ঐশ্বর্য, ভাস্কর্য, নাগরিক সভ্যতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রাবিড়গণ সমকালীন আর্যদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু ইতিহাসের অভিলাষ পূর্ণ করতে গিয়ে এরাই আর্যদের নিকট ধীরে ধীরে পরাভূত হয় এবং রাজ্যসীমা সংকোচনের ফলে এদের কোন কোন রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে। আবার

কোন কোন রাজপরিবার আর্যধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রকে আর্য-শাসনাধীনে নিয়ে আসেন অবলীলায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্ররাজশক্তির দীর্ঘজীবী আর্যবিরোধিতা প্রথম গুপ্ত-পর্ব পর্যন্ত সফলভাবে চালিয়েও শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়েছে। উত্তরবঙ্গীয় রাজতন্ত্রের সেই ঐতিহ্যময় সংগ্রামী ইতিহাস পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হবে।

ব্যবহৃত গ্রন্থ-তালিকা :—

1. Mankind In The Making—
William Howells, London, 1964.
2. World Prehistory In New Perspective—
Graham Clark, Cambrige 1977.
3. Prehistory and Protohistory of India and Pakistan—
H. D. Sankalia, Pune, 1974.
4, Prehistory and Protohistory of Eastern India—
A. H. Dani, Calcutta 1960.
5. Prehistoric Man—John Waechter, London, 1977.
6. Protohistory of West Bengal—
S. C. Mukherjee, Calcutta 1966.
7. প্রাগৈতিহাসিক বাঙ্‌লা—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৮১
8. Kirat-Jana-Kriti—Dr. S. K. Chatterjee, Calcutta, 1951.
9. The History and Culture of Indian People—
Dr. R. C. Mazumdar & Dr. A. D. Pusalkar, London, 1957.
10. বাঙ্‌লার ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৩৭২
11. Prehistory and Beginnings of Civilisation in Bengal—
Dr. A. K. Sur, Calcutta, 1969.
12. The Changing Indian Civilisation—Vol.-1—
O. K. Ghosh, Calcutta, 1976.

# তৃতীয় অধ্যায়

# উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড় শাসন

## পুণ্ড্রবর্ধন রাজতন্ত্রের ইতিহাস

( খৃ. পূ. ১৫০০ সাল থেকে খৃষ্টীয় ৩২০ সন )

### ১. ভূমিকা

উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের বোধহয় সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল তথ্য হ'ল এই যে, প্রাক্-আর্য ভারতবর্ষে যে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নগর-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়—তার মধ্যে অন্যতম হ'ল—উত্তরবঙ্গের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্র ও নগর। ইতিহাসের সেই উষা-লগ্নে পুণ্ড্রবর্ধন দেখা দিয়েছিল এমন একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্ররূপে যার খ্যাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। শুধু তাই নয়, আর্য সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ব ভারতের যে প্রধান রাজশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতিহত করে রেখেছিল—সেটি ছিল গৌরবোজ্জ্বল এই পুণ্ড্ররাজবংশ। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা থেকে একথাও আভাসিত হচ্ছে যে—বঙ্গীয় অপরাপর রাজতন্ত্র উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ-জাত রাজন্যদের দ্বারাই স্থাপিত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, বাংলার প্রাচীনতম রাজতন্ত্র এই উত্তরবঙ্গের মাটিতে গড়ে উঠেছিল—এরূপ অনুমান করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা অন্যরূপ কিছু স্থাপিত হচ্ছে, ততক্ষণ প্রাচীনতম লিখিত গ্রন্থাদির সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমান্বয় নির্ধারণ অপরিহার্য এবং সেই অপরিহার্যতায় উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রতন্ত্র বাংলার অপরাপর রাজ্য ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের প্রজননকারী বলে চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই।

### ২. পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্রের উদ্ভবকাল

ঠিক কোন্ সময় পুণ্ড্রবর্ধনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে বৈদিকগণ ভারতবর্ষে এসেই প্রথমে যে রাষ্ট্রশক্তিগুলিকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন—তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ( ৩৩ অ: ৮ খণ্ড ) প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়—পুণ্ড্র রাজ্য ও পুণ্ড্রগণের। সেখানে পুণ্ড্রগণকে দস্যু-জাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিবগণের ভাই বলে তাদের দেখানো হয়েছে। পণ্ডিতদের অনুমান—প্রায় ১০০০ থেকে ৯০০ খৃ. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে বেদ ও ব্রাহ্মণাদি সংকলিত হয়েছিল। এই সময় আর্যদের উপনিবেশ কেবলমাত্র সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্তে বিস্তৃত হয়েছিল। ব্রহ্মাবর্তে স্থিত আর্য-সমাজ ভারতের পূর্ব প্রান্তে স্থিত পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রজনগণ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, তা থেকে অনুমিত হয়—আর্য সভ্যতার অতি দূর প্রান্তে অবস্থিত এই সব দ্রাবিড় শাসিত জনপদ ও রাষ্ট্র তৎপূর্ব কালেই ভারতের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়—১০০০ থেকে ৯০০ খৃ. পূর্বাব্দে সংকলিত হলেও—বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল আর্যদের ভারতে প্রবেশের সমকালে বা সামান্য পরবর্তীকালে; যদিও অনেকের অনুমান—ঋক্‌বেদের অংশ বিশেষ ভারত-প্রবেশের আগেই রচিত হয়েছিল। যাই হোক, সংকলনের কাল ছেড়ে রচনার কালকে ধরলে এবং তৎপূর্বে পুণ্ড্রজনপদকে খ্যাতিমান হতে গেলে—কমপক্ষে ১৫০০ খৃ পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে পুণ্ড্রবর্ধনের প্রতিষ্ঠাকাল অনুমান করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরবর্তী আলোচনায়, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও তথ্যের বিচারেও, পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্রের উদ্ভবের কালসীমার পূর্বোক্ত অনুমানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

## ৩. পুণ্ড্ররাজশক্তির জাতি-বিচার

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সপ্তম অধ্যায়ের ১৩শ থেকে ১৮শ শ্লোকে পুণ্ড্রদের 'দস্যু-জাতি' বলে উল্লেখ করেছে। এই দস্যু জাতির সঙ্গে আর্যগণ প্রথম পরিচিত হন ভারতে প্রবেশের আগেই, সেকথা প্রথম যুগের বৈদিক সাহিত্য পাঠেই জানা যায়। তথা-কথিত এই 'দস্যু' জাতি বা 'দাস-দস্যু' জাতি প্রাক্-আর্যযুগে সমগ্র পূর্ব-ইরাণ, আফগানিস্থান, উত্তর-পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে এবং সম্ভবতঃ গাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্ব সীমানায় একটি দীর্ঘায়িত 'সাব-বেল্ট' ( sub belt ) রচনা করে অবস্থিত ছিল। 'দস্যু' শব্দের—প্রথম দিকের মানে ছিল 'দেশীয়', অতএব 'দস্যু জাতি' অর্থ দেশীয় জাতি ( men of the Country side or local tribe ), সংস্কৃত দস্যু কথাটি এসেছে ইন্দো-ইরাণীয় 'দাহ' শব্দ,

থেকে। ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় 'দাহু' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'দেশীয়', যদিও হয়তো রূঢ়ি প্রয়োগে এতে ভূমিজ ( aborigins ) কোন উপজাতি ( tribe ) বোঝাতো। এই 'দাহু'গণই তাদের প্রশংসনীয় নাগরিক সভ্যতা নিয়ে ছড়িয়ে ছিল - ভারতের প্রান্ত থেকে ভূমধ্যসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত। প্রাচীন গ্রীক-সাহিত্যের উল্লেখ থেকে জানা গেছে এদের কাস্পিয়ান সাগরীয় অঞ্চলে ( দক্ষিণ পূর্ব তীরে ) বসবাসের কথা। গ্রীকগণ অবশ্য—এদের 'দাহাই, জাতি বলে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। [ আধুনিক পারস্য উচ্চারণে শব্দটি হয়েছে 'দিহ' ]।

যাই হোক—আর্যগণ যে দীর্ঘপথ পরিক্রমা শেষে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন সেই পথের স্থানে স্থানে তারা এই শক্তিশালী 'দাস দস্যু'-দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন, ক্রমিক বাধাদান ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। সেই জন্যেই হয়তো 'দেশীয়' অর্থ দ্যোতক মূল 'দাহু' শব্দটি বৈদিক উচ্চারণে এবং নিন্দার্থে প্রযুক্ত 'দস্যু'তে পরিণত হয়েছিল। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করলেও কখনোই যে বুঝতে পারেন নি যে, তাঁরা নতুন দেশে ঢুকেছেন, তার কারণই হলো এদেশে তাঁদের সেই পূর্ব পরিচিত 'দাস-দস্যু'দের ব্যাপক উপস্থিতি। এবং সেইহেতু ভারত-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এতঞ্চলীয় শাসক-গোষ্ঠীর বা নরগোষ্ঠীর শ্রেণী গোত্র নির্ধারণে তাদের দেরী হয়নি। পণ্ডিতদের ধারণা—দ্রাবিড়দের তারা ভারতে যেমন 'দাস দস্যু' বলে অভিহিত করেছেন, তেমনি অষ্ট্রিকদের চিহ্নিত করেছেন—'নিষাদ রূপে এবং মঙ্গোলীয়দের অভিহিত করেছে 'কিরাত' রূপে।

নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এটা আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাক-আর্য যে জাতি এতদঞ্চলে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও রাষ্ট্র-শাসনের ক্ষমতা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন – তারা হলেন দ্রাবিড়-জাতি। জাতি-প্রবাহের ধারা বর্ণনায় আগেই তা দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর লোক ভারতে প্রধাণতঃ কৃষিভিত্তিক কৌম তৈরী করেছিলেন এবং তৎপূর্ববর্তী নেগ্রিটো'গণ যাযাবর শ্রেণীর খাদ্য সংগ্রহমূলক জীবনবৃত্তে জড়িত ছিল। তাই ঐতিহাসিক ধারানুক্রমেও—আর্যদের ভারত-প্রবেশের সময়—রাষ্ট্র-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী মূলতঃ 'দাস দস্যু' আখ্যাত দ্রাবিড়গণ না হয়ে উপায় নেই। ভারতে প্রবেশ-কালীন সময়ে অথবা আর কিছু পূর্ব থেকে ভারত-প্রবেশের পরবর্তী সময়-সীমায় আর্য ভাষাতে এই কারণেই দ্রাবিড় বর্ণ ও শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আর্য ভাষায় অজস্র দ্রাবিড়-জাত শব্দ এবং বর্ণমালায় মূর্ধা জাত ধ্বনি ( যথা ড, ড়, ঢ়, ণ, ষ

প্রভৃতি) পূর্বোক্ত তত্ত্বের অভ্রান্ত ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ। যাই হোক— আর্যদের ভারতাগমনের সময়—পূর্ব ভারতে শাসকীয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত পুণ্ড্রগণ, তথা বৈদিক-সাহিত্যে 'দস্যু' জাতি বলে আখ্যাত পুণ্ড্রগণ, ছিলেন নিঃসন্দেহে দ্রাবিড়-জাতি ভুক্ত একটি শ্রেণী বা বংশ।

## ৪. পূর্বভারতে আর্যাভিযান ও পুণ্ড্রবর্ধনের প্রতিরোধ ব্যূহ

আগেই বলা হয়েছে যে, ন্যূনপক্ষে আনুমানিক ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করেন এবং সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মাবর্তে নিজেদের মূল উপনিবেশ গড়ে তোলেন। প্রত্যাশিতভাবেই সেই সুদূর অতীত-কালের মানুষেরা আধুনিক অর্থে সাল-তামামীযুক্ত ইতিহাস রচনা করে যান নি আমাদের জন্যে, কিন্তু তাদের সেই বিজয়গাথা এত বিচিত্রভাবে আখ্যাত, চিত্রিত ও রূপকায়িত করে গেছেন সমকালীন সাহিত্যে যে, তার থেকে আর্যদের বিজয়াভিযানের ধারা, তাঁদের সভ্যতার বিকাশের পথ ঘটনার ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত এবং সেই থেকে ভারতে আর্যদের বিজয়াভিযান ও উপনিবেশবাদের একটি সাধারণ ইতিবৃত্ত রচনা করা সম্ভব। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ইতিহাস আলোচনায় সে সব কথা অসম্পৃক্ত বলে, আমরা শুধু কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তথ্যের প্রয়োগে আর্যদের পূর্ব-ভারত অভিযানের ইতিবৃত্তকে আভাসিত করে তুলবো।

পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পর আর্যগণ প্রধানতঃ গাঙ্গেয় অব-বাহিকায় রাজ্যবিস্তার করতে অগ্রসর হন এবং পূর্বমুখী প্রসারেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর কারণ দু'টি :—প্রথমতঃ নদীমাতৃক ও নবগঠিত পাললিক সমভূমিময় গাঙ্গের অববাহিকায় ছিল প্রচুর শস্যের প্রলুব্ধ হাতছানি এবং দ্বিতীয়তঃ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে—সুদৃঢ় দ্রাবিড় রাষ্ট্রশক্তিগুলির প্রতিরোধপরিখা।

ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি ঋকে (১০।৪।৫৩-৮) আমরা দেখতে পাচ্ছি সমকালীন বৈদিক ঋষি আর্যগণকে দৃশদ্বতী নদীর পূর্বদিকে রাজ্য-বিস্তারে আহ্বান জানাচ্ছেন। ঋষি বলছেন,

"অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং
বীরয়ধ্বং প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রাজহীত যে অসন্ দুরে বা
অনমীবামুত্তরেমাভি বাজান॥"

অর্থাৎ 'হে বন্ধুগণ, ( সামনে ) অশ্মন্বতী ( দৃশদ্বতী ) নদী বয়ে চলেছে। তোমরা উৎসাহ ও বীর্য্যের সাথে এই নদী উত্তীর্ণ হও। আমাদের ( জীবনে ) যে সব দুর্দশা আছে—তা এপারে বিসর্জন করে যাই। আমরা এই নদী পার হলেই প্রচুর অন্নলাভ করবো।'

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষির এই আহ্বানে সাড়া দিয়েই হয়তো আর্যরাজন্যগণ দলে দলে পূর্ব ভারতের দিকে রাজ্যবিস্তারে এগিয়ে চলেন এবং আনুমানিক ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময় পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত আর্য-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। পুণ্ড্রদেশ পর্যন্ত আর্যদের রাজ্যবিস্তারের এই ঘটনাবলী শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে।

সম্ভবতঃ উত্তর ভারতে এইভাবে আর্য-সভ্যতা বিস্তারের নায়ক—মহারাজ বিদেঘ মাথব। তিনি এ সময়ে ব্রহ্মাবর্তে রাজত্ব করতেন। সরস্বতী নদী তীরে তাঁর রাজধানী ছিল। সেকালে সম্ভবতঃ অশ্বমেধের পরিবর্তে যজ্ঞাগ্নির শিখা নিয়ে বিজয় পরিক্রমায় বেরোবার নিয়ম ছিল। অন্ততঃ মহারাজ—বিদেঘ তাই করেছিলেন এবং বিহারের কুশী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন; কিন্তু সদানীরা বা করোতোয়া নদীর তীরে তিনি ( স্থানীয় রাজার কাছে ) যুদ্ধে পরাভূত হন অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নি করোতোয়া অতিক্রম করতে পারেনি। ঠিক এই কথাগুলোই লেখা আছে শতপথ ব্রাহ্মণে ( ৪।১।১৪-১৭ )। উক্ত শ্লোক চতুষ্টয় থেকে একথাও জানা যায় যে—এই বিজয়াভিযানে মহারাজ বিদেঘ মাথব একা যাননি; সঙ্গে ছিল ( তাঁর পুরোহিত ও মন্ত্রী ) রাহুগণ গোতম। আর্য-যজ্ঞাগ্নির এই প্রতীকী বিজয়ে যে সব রাজ্যে তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন, তার জন্যে দৃশদ্বতী ছাড়াও যমুনা, সরযূ, গণ্ডকী এবং কোশী নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল।

যাই হোক—আর্যদের এই সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারা আর্যরাজশক্তি পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের সীমানায় এসে দাঁড়ায় এবং এই দ্রাবিড়-শক্তির সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিদেঘ মাথবের তৈরী সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ কিছুকালের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ে পবং আর্য-দখলীকৃত উত্তর ভারতে অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যার মধ্যে করোতোয়ার পশ্চিমভাগে জন্ম নেয়—বিদেহ ও কোশল। সদানীরা বা করোতোয়া ছিল পুণ্ড্রদেশের অন্তর্ভুক্ত নদী এবং এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল দীর্ঘস্থায়ী পুণ্ড্ররাজতন্ত্রের রাজধানী। ইতিমধ্যে মধ্যদেশের অন্তর্গত অপর

আর্যরাষ্ট্র অযোধ্যা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং অনার্য মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে আর্য সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারে ব্রতী হয়। যজ্ঞবিরোধী দ্রাবিড়গণের আক্রমণ-বিপন্ন অনুষ্ঠানমুখর আর্যসভ্যতাকে বাঁচাতে [ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার রূপক ] এবং উক্ত দ্রাবিড় রাজগণের ( সম্ভবতঃ ) শস্যাদি লুণ্ঠনের অভিযানকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে [ সীতাহরণের রূপক ]—যুবরাজ রামকে প্রেরণ করা হয় দাক্ষিণাত্যে, যিনি দাক্ষিণাত্যের বিবদমান দ্রাবিড়শক্তির একটিকে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে এবং কিছু রাজ্যকে করদ বা সন্ধিভুক্ত মিত্ররাজ্যে পরিণত করে—সিংহল পর্যন্ত প্রাকারান্তরে আর্যপ্রভাবের বিস্তার ঘটিয়ে প্রায় দেবত্বের মহিমায় ভূষিত হয়ে ওঠেন।

কিন্তু রামায়ণের যুগেই আর্য-প্রভাব দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর সিংহলে বিস্তৃত হলেও করোতোয়ার তীরে তা প্রতিহত হয়ে পড়েছিল আরো এক সহস্রাব্দের অধিকাংশ সময় জুড়ে। পূর্ব ভারতে আর্য-সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখার কাজে পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে সহযোগী ছিল আরো একাধিক রাষ্ট্র—যথা অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিবগণ। শাস্ত্রের সাক্ষ্যে জানা যায়—এরাও সবাই ছিল দ্রাবিড়, কেননা এরা পুণ্ড্রদের সমবংশোদ্ভূত। পণ্ডিতদের অনুমান—অন্ধ্রগণ অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব সীমানায় পার্বত্য রাষ্ট্রে, মুতিবগণ—পশ্চিম উড়িষ্যায়, পুলিন্দরা কলিঙ্গে এবং শবরগণ—সাঁওতাল পরগণায় দ্রাবিড়-রাজতন্ত্রের পত্তন করেছিল। এবং সমবংশীয় এই দ্রাবিড়-ভ্রাতৃরাষ্ট্রগুলি পূর্ব ভারতে একটি 'জ্যা'-এর আকৃতি-বিশিষ্ট প্রতিরোধব্যূহ রচনা করে—আর্য উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করে চলেছিল।

## ৫. স্বাধীন পুণ্ড্রবর্ধন রাষ্ট্রের স্থিতিকাল

স্বতন্ত্র জনপদীয় শাসন বা স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধন কতকাল টিকেছিল—প্রাচীন গ্রন্থাদির বর্ণনা ও উল্লেখ বিশ্লেষণ করে সে বিষয়ে একটি খসড়া ধারণা তৈরী করা যেতে পারে। পরবর্তী কয়েকটি অনুচ্ছেদে ঘটনার কালানুক্রমিক উপস্থাপনে বা প্রাচীন গ্রন্থের তথ্যাদি সন্নিবেশে সে বিষয়টি পাঠক সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখানে শুধু এই কথাটি বলে রাখা চলে যে—খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের পত্তনের আগে পুণ্ড্রবর্ধন যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল সেরূপ

অনুমানের যথেষ্ট যুক্তি আছে। তবে খৃ. পূ. ১৫০০ বছর থেকে খৃষ্টীয় ৩২০ বছরের মধ্যে এই জনপদে মাত্র একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ অনুমান করা কঠিন। এবং যে বংশগুলি এখানে একে একে শাসন করেছেন তাঁরা যে পূর্বাপর আর্য-গোষ্ঠী থেকেই এসেছিলেন এরূপ চিন্তা বাস্তবসম্মত হবে না।

কনিষ্ক থেকে 'কিরাত' বংশোদ্ভূত অহমরাজগণ পর্যন্ত অনেক 'অন্-আর্য' রাজন্যবর্গই রাজনৈতিক সামাজিক প্রয়োজনে ভারতীয় আর্যভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিলেন। পুণ্ড্রবর্ধনের মৌলিক দ্রাবিড় রাজবংশও হয়তো—আর্য-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল স্বাধীনতা সংগ্রাম করে গেলেও, তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে—'ক্ষত্রিয়' বলে 'স্বীকৃতি-লাভে সচেষ্ট হয়ে থাকবেন। কারণ আর্য আগমনের সূত্রপাতে এই পুণ্ড্রজনগণ দস্যু বলে খ্যাত ছিলেন, পরে ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং তারও পরে সদ্‌বংশীয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিতি লাভ করেন। অতএব নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে দ্রাবিড় এই জনশ্রেণী ভাষা-সংস্কৃতি ও ধর্মে এঁরা আর্যীকৃত হয়ে গেলেও—রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা এঁরা করে গেছেন গুপ্তযুগের সূত্রপাত পর্যন্ত। হয়তো সেই আর্যীকরণের ধারা মহারাজ বলির আমল থেকেই চলে আসছিল।

## ৬. মহারাজ বলি

প্রাচীন শাস্ত্রমতে অনার্য রাজা অসুরবংশীয় হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ এবং তৎপৌত্র ও বিরচণের পুত্র বলি পূর্বভারতে এক বিশাল ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন; তাঁর রাজধানী ছিল গঙ্গা নদীর তীরে। হরিবংশ বলির পাঁচ পুত্র সকলেই পরবর্তীকালে পুণ্ড্রবর্ধন থেকে শুরু করে ওড়িষ্যা ও অন্ধ্র পর্যন্ত স্থানগুলিতে পৈতৃক রাজ্য লাভ করে—এই কাহিনী থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, বলি বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এক রাজা ছিলেন এবং হয়তো গৌড়-সংলগ্ন গঙ্গার তীরেই তা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমকালীন ভূপ্রকৃতি বিচারে এ অনুমান অনিবার্য হয়ে ওঠে। যাই হোক —তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই সময় একদিন রাজধানী সন্নিহিত নদীতে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিলেন—ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৮ নম্বর সূক্তের রচয়িতা ঋষি দীর্ঘতমা। অসুরবংশীয় রাজা আর্য-ঋষিকে আপন ঘরে নিয়ে স্থান দেন। রাজার নিয়োগক্রমে উক্ত ঋষি রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে যে পাঁচটি ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্মদান করেন—তাঁরাই পরবর্তীকালে পুণ্ড্র,

সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশে রাজা হন। তবে কি বলিরাজের বিশাল রাজ্য পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বিভক্ত হয়ে খণ্ড খণ্ড জনপদীয় শাসন চালু হয়। এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার উপায় নেই, এবং এসব কাহিনীর যাথার্থ নির্ণয় করার পথও আজ আর নেই। কিন্তু এসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই সত্য আভাসিত হতে পারে যে, রাজনৈতিক সামরিক দিক থেকে অনার্য-শাসিত পূর্বভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগে—আর্যগণ তাদের ঋষি এবং সন্তদের দিকে পূর্বভারতে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন। মিশনারী কাজের সাফল্যের পথেই কি তবে এসেছিল শক্তিশালী দ্রাবিড়-সাম্রাজ্যে আর্যবিজয়াভিযানের জয় রথ?

## ৭. মহারাজ বাণ

যাই হোক, হরিবংশ মতে এবং মহাভারতের বর্ণনা থেকে জানা যায়—মহারাজ বলি তৎপুত্র মহারাজ বাণ মহাভারতের যুগে জীবিত ছিলেন। আধুনিক পশ্চিম দিনাজপুরে গঙ্গারামপুর থানায় বাণরাজের রাজধানী বলে কথিত 'বাণগড়'-এর ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেছে। তারই অনতি দূরে বাণরাজার দুই স্ত্রী—ধল-রাণী ও কালো-রাণীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাণরাজ-নির্মিত দুইটি বিশাল দীঘির অস্তিত্ব আজও লক্ষ্য করা যায়। কিছু দূরেই তপন থানায় অবস্থিত করদহ। মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজার কন্যা উষাকে হরণ করে। একে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণ ও মহারাজ বাণের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে বাণ পরাজিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হস্তদ্বয় কেটে যে দহতে ফেলেন—জনশ্রুতি অনুসারে তাই আজ করদহরূপে পরিচিত। এসব কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিরূপণ করা না গেলেও—এর থেকে দু'টি কথা আভাসিত হয়—(এক) পূর্বভারতে প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় শক্তিগুলির সঙ্গে মধ্যদেশে অর্থাৎ উত্তর ভারতের মধ্যাংশে প্রতিষ্ঠিত আর্য রাষ্ট্রগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে সংঘর্ষ (দুই) মূলতঃ দ্রাবিড় হলেও মহাভারতের যুগে এইসব রাজবংশ সৎ-ক্ষত্রিয়-রূপে গৃহীত এবং যার জন্যে আর্য রাজন্যগণ এদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে অনিচ্ছুক ছিলেন না।

বাণরাজার সম্বন্ধে আরো জানা যায় যে তিনি শিবোপাসক ছিলেন এবং শিবের তর্পণ উপলক্ষ্যে তিনি একটি বিশাল দীঘি খনন করেন। তপন থানার অন্তর্গত তর্পণ (তপন) দীঘিরূপে যা আজও প্রসিদ্ধ।

বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী বাণগড়ই পরবর্তীকালে কোটিবর্ষ বা দেবকোটরূপে পরিচিতি লাভ করে এবং তা পুণ্ড্রবর্ধনের দীর্ঘকালীন রাজপাট-রূপে খ্যাতিলাভ করে। বাণরাজা অনেকগুলো শিবমন্দির স্থাপন করেন এবং স্নান-তর্পণাদির জন্য বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় নির্মাণ করেন। বাণগড়ের সংশ্লিষ্ট বাণ-কৃত অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ডের জলে স্নান করার জন্য এখনো অনেক শিবোপাসকেরা এখানে প্রতি বছর বারুণী মেলায় সমবেত হন।

## ৮. পুণ্ডরীক বাসুদেব

পুণ্ড্রবর্ধনের সর্বাধিক খ্যাতিমান্ ও শক্তিশালী নৃপতিরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন—পুণ্ডরীক বাসুদেব। সম্ভবতঃ মহারাজ বাণের পর ইনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহাভারতীয় আখ্যান থেকে জানা যায় যে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র এবং কিরাত দেশকে একত্রিত করে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করে তোলেন। এবং পাণ্ডববংশী রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁর উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুণ্ডরীক বাসুদেবের সামরিক সংঘাত বাধে। এই সামরিক সংঘাতের হেতু ও তাৎপর্য বুঝতে গেলে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার একটু খসড়া পরিচয় দরকার।

আর্যাবর্তের রাজন্যবর্গের মধ্যে সে সময় কুরুবংশীয় রাজপুরে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে এবং রাজ্যটি দ্বিধা বিভক্ত হয়। এর মূল অংশে, হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং পূর্বাংশে নতুন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডুপুত্রগণ শাসন ক্ষমতায় আসেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহায়তায় জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে ভারতের অবিসম্বাদী রাজ-চক্রবর্তী সম্রাটে পরিণত করবার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার সামনে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়—পূর্ব ভারতে জরাসন্ধের সামরিক শক্তি ও তার সহযোগী রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি। জরাসন্ধকে সামনে রেখে ভারতে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে মিলিত হন পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের তথা নিম্ন-নেপালের শাসক পুণ্ডরীক বাসুদেব এবং প্রাক্-জ্যোতিষে নব-জাগ্রত মঙ্গোলীয় শাসক ভগদত্ত। তিনটি বৃহৎ সামরিক শক্তির এই আঁতাত এবং পূর্বভারতের অপরাপর রাজন্য-বর্গের সহায়তায় জরাসন্ধের ভারতে একছত্র প্রতিপত্তির এই প্রস্তুতি—শ্রীকৃষ্ণকে ভাবিয়ে তুলেছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কিছুই করা যাবে না জেনে, ছদ্মবেশে

নগরীতে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রস্তুত আক্রমণে একাকী জরাসন্ধকে হত্যা করান ভীমকে দিয়ে এবং আর কাল-বিলম্ব না করে তাঁতাতের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য রাজন্যবর্গকে একে একে আক্রমণ করতে থাকেন। মহাভারতের সভাপর্বে (৩০ অঃ।২২-২৫) বর্ণিত হয়েছে ভীম ও "পুণ্ড্রদেশাধিপতি মহাবল বাসুদেবে"র যুদ্ধকথা। এই যুদ্ধে বাসুদেব পরাজিত হন এবং আসন্ন রাজসূয় যজ্ঞে হাজির হবার অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন। প্রাক্-জ্যোতিষরাজ ভগদত্তও আট দিন যুদ্ধের পর পরাভূত হন এবং রাজসূয় যজ্ঞে উপঢৌকনসহ যেতে বাধ্য হন। সভাপর্বে লক্ষ্য করা যাবে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজনে যে সব রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে যজ্ঞে আগমনে বাধ্য করতে হয়, যথা পুণ্ড্র, চেদি, প্রাক্জ্যোতিষ, মগধ, তাম্রলিপ্তি এবং সূক্ষ্ম, তারা অধিকাংশই পূর্ব ভারতের। এতেই বোঝা যাবে মগধকে কেন্দ্র করে পূর্ব ভারতে একটি সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা কতখানি দানা বেঁধে ছিল। যাই হোক—পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ রাজন্য স্বেচ্ছায় এবং পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজন্য দায়ে পড়ে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে হাজির হন।

মহাভারতের যুদ্ধ এবং বিশেষ করে সারা ভারতের ক্ষত্রবৃন্দের দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যে সর্বনাশা সংগ্রাম—তার মূল কারণ নিহিত রয়েছে রাজসূয় যজ্ঞের সময় শ্রীকৃষ্ণের অসমৃবৃত ও হঠকারী আচরণে; অভ্যর্থিত নৃপতিগণের মধ্যে শিশুপালকে যজ্ঞস্থলেই ক্রোধান্ধ হয়ে হত্যা। কৌশলগত দিক দিয়ে আত্মসংযম করাই এখানে বড় বেশি দরকার ছিল, তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ছাড়াই অবলীলায় যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্বীকৃত রাজচক্রবর্তীর মর্যাদায় ভূষিত করা যেতো। কিন্তু যজ্ঞের শুরুতেই প্রথাগতভাবে রাজন্যবর্গকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে যুধিষ্ঠির প্রথমেই বেছে নিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবকে, যিনি কোনো রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না। এতে রাজন্যবর্গের এক বৃহদংশ রাগে অপমানে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। চেদীর রাজা শিশুপাল তো প্রকাশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করতে থাকেন। ক্রোধান্ধ কৃষ্ণ চক্রনিক্ষেপে শিশুপালকে বধ করেন। বেধে যায় ধুন্ধুমার কাণ্ড; অভ্যর্থিত অতিথিকে যজ্ঞসমীপে প্রকাশ্যে হত্যা করায়—শিশুপালের সমর্থক রাজন্যেরা ক্ষেত্রস্থলেই অস্ত্রধারণ করেন। এই অপ্রত্যাশিত ও অপ্রস্তুত যুদ্ধভূমিতেই সম্ভবতঃ পুণ্ডরীক বাসুদেব প্রাণ হারান। কারণ—মহাভারতের যুদ্ধে পুণ্ড্রগণ যুদ্ধে যোগদান করলেও পুণ্ডরীক বাসুদেবের কোনো উল্লেখ নেই।

যাই হোক—পাণ্ডববংশের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ হত্যাকাণ্ডে ভারতের রাজন্যবর্গ সমর্থক ও বিরোধী দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়,—এবং এই বিরোধী রাজন্য-গোষ্ঠীর নেতৃপদ গ্রহণ করে কৌরবরাজ দুর্যোধন। সম্ভবতঃ এই ঘটনায় রাজ্যে ও রাজধানীতে যুধিষ্ঠিরকে এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় যে, দ্বাদশ বর্ষ আত্মগোপন করে থাকতে হয়। যাই হোক—এই আত্মগোপনকৃত সময়ে তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নি ; তপস্যা করেছেন নতুন অস্ত্রের, বন্ধুত্ব করেছেন নতুন রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে—প্রয়োজন হলে বৈবাহিক সূত্রের মাধ্যমে। এইভাবে সার্বিক ভাবত স্পষ্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে—যুধিষ্ঠিরের অসমর্থিত রাজচক্রবর্তীত্বের শেষ ফয়সলা করতে সমবেত হন। এই যুদ্ধের কর্ণ পর্বে আমরা দেখতে পাই ( মহা, কর্ণ পর্ব ১।২৩ অঃ ) যে, অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রগণ বিপুল হস্তীবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছে। এই ঘটনায় দুটি জিনিষ বোঝা যায়—(১) পুণ্ডরীক বাসুদেবের যজ্ঞস্থলে আকস্মিক মৃত্যু ঘটলেও—পুণ্ড্র রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি। এবং তৎকালীন পুণ্ড্ররাজ প্রাক্তন রাজার অহেতুক মৃত্যুর জন্য দায়ী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের শেষ সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছেন। (২) তবে এই বাসুদেবের মৃত্যুতে পুণ্ড্ররাজ্যের হাত থেকে বঙ্গ বেরিয়ে যায়। ভীষ্মপর্বে দেখা যায়—বঙ্গরাজ পর্বতাকার হস্তীতে আরোহণ করে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে নিরত।

## ৯. মহাভারতোত্তর সাহিত্যে পুণ্ড্রবর্ধন

যাই হোক—বঙ্গভূমি হাতছাড়া হলেও পুণ্ড্ররাজ্য তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল গুপ্তযুগ পর্যন্ত। মহাভারতের পরবর্তীকালে বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের সংকলন-কাল যাই হোক না কেন ঐ কাহিনীতে বিধৃত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতাগণ মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব সহস্রাব্দে বর্তমান ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দে লেখা 'বোধায়ন ধর্মসূত্রে' পুণ্ড্ররাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে লিখিত 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায়' বর্ণিত রয়েছে—পুণ্ড্রদেশে স্বয়ং বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারে আগমনের কাহিনী। এছাড়া পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুণ্ড্রবর্ধনের নাম রয়েছে। মনুস্মৃতিতে পুণ্ড্রগণের উল্লেখ রয়েছে। পালি ও সংস্কৃত দু'টি

বিনয়পীটকেই পুণ্ড্র বর্ধনের উল্লেখ আছে। 'কথা সরিৎ সাগর' এবং হরিসেনের 'বৃহৎকথা'তে পুণ্ড্রগণ ও পুণ্ড্র রাজ্যের উল্লেখ আছে।

এছাড়া দিব্যবদনের রচনা থেকে জানা যায় যে সম্রাট অশোক একবার পুণ্ড্রবর্ধনে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং রাজধানীর জৈনগণকে হত্যা করেছিলেন। পৌণ্ড্রবর্ধনে এ সময় জৈনধর্মাবলম্বী লোকেরা বুদ্ধদেবের এমন একটি চিত্র আঁকেন যাতে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব মহাবীর জৈনের পদতলে আপতিত। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নাকি সম্রাট অশোক পুণ্ড্রবর্ধন আক্রমণ করেন এবং শহরের ১৮০০০ অজীবক-কে হত্যা করেন। যাই হোক এই ঘটনা ঘটে থাকলেও তাতে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য বিলুপ্ত হয়নি বা একে মৌর্য-সম্রাট অঙ্গদ বা করদ রাজ্য করেছিলেন বলেও কোনো উল্লেখ নেই।

## ১০. মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধন

পুণ্ড্রবর্ধন যে মৌর্যযুগে স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল তার কতকগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। প্রথম প্রমাণ এই যে, মৌর্যযুগের বা তার পরবর্তী কোনো গ্রন্থে একথা কোথাও উল্লিখিত হয়নি যে, মৌর্যগণ পুণ্ড্ররাষ্ট্রকে পরাজিত ও রাজ্যভুক্ত করেছেন। সম্রাট অশোক, যিনি তাঁর অধীনস্থ ভারতের দূরতম প্রান্তেও মূল্যবান স্তম্ভ ও শিলালিপি স্থাপন করে গেছেন। পাটলিপুত্রের এত কাছের পুণ্ড্রবর্ধন যদি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই থাকতো তবে তাতে কি একটিও স্তম্ভ বা শাসনলিপির সন্ধান পাওয়া যেতো না?

অন্যদিকে 'কল্পসূত্র' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ভদ্রবাহুর শিষ্য "গোদাস" যে জৈনমতাবলম্বী 'গোদামাগণের' জন্ম দিয়েছিলেন, তার ছিল তিনটি শাখা—পৌণ্ড্রবর্ধনীয়, কোটিবর্ষীয় ও তাম্রলিপ্তীয়। তাছাড়া মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধনে শাসকীয় নির্দেশনামার স্তম্ভ বা শিলালিপি না পাওয়ার এবং তার পরিবর্তে বৌদ্ধসংঘের প্রতি পাঠানো শাসকীয় শীলমোহর থেকে মৌর্য অধিকারের অভাবই সূচিত করে। ১৯৩১ সালের খননকার্যে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের ঐ সীলমোহরে ছাবগ্যীয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের শ্রমণদের প্রতি এই নির্দেশ খোদিত আছে যে, পৌণ্ড্রনগরে দুর্ভিক্ষ এলে তারা যেন জনসাধারণের সেবা ও সাহায্যে নামেন এবং কী কী ভাবে তা করতে হবে সে ব্যাপারেও নির্দেশ

রয়েছে। পুণ্ড নগরে যদি বৌদ্ধ-রাজশক্তির (মৌর্যদের) অন্তর্ভূক্তই থাকবে তবে দুর্ভিক্ষের দিনে মৌর্য-রাজশক্তি শ্রমণের কাছে আবেদন পাঠাতো না, শাসকীয় ভাণ্ডার থেকেই ব্যবস্থা হতো।

## ১১. সুঙ্গ ও কুশান যুগে পুণ্ড্রবর্ধন

সুঙ্গ ও কুশান যুগে পুণ্ড্রবর্ধনের স্বাধীন অস্তিত্বের ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে সুঙ্গ ও কুশাণগণের সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের ব্যবসা-বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৩৭-৪১-এর খননকাযে মহাস্থানগড়ে ও বাণগড়ে যে সব টেরা-কোটা মূর্তি পাওয়া গেছে তা সব সুঙ্গ-যুগের। তাছাড়া ঐ খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে কুশান যুগের স্বর্ণমুদ্রা। বাণিজ্যিক যোগাযোগের এটা অভ্রান্ত প্রমাণ।

তাছাড়া সাঁচীস্তূপের শিলালিপি থেকে একথা জানা গেছে যে, পুণ্ড্রবর্ধন নগরের বৌদ্ধ-উপাসিকা ধনাঢ্য মহিলা ধর্মদত্তা এবং অন্য এক ধনাঢ্য ব্যক্তি 'ঋষিনন্দন' সাঁচীস্তূপের প্রস্তর-তোরণ ও শিলাবেষ্টনী (রেলিং) তৈরীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। সাঁচীস্তূপের অস্থায়ী কাঠের গেট ও রেলিং পাল্টে দিয়ে পাথরের কারুকৃতিপূর্ণ তোরণ তৈরী হয়—সুঙ্গ আমলের শেষ ভাগ থেকে কুশান যুগের সূত্রপাতের মধ্যে কোন এক সময়। তোরণের কারুকার্য ও শিল্পকলার বিশ্লেষণে পণ্ডিতেরা এ সিদ্ধান্তে এসেছেন। খৃষ্ট পূর্ব ৩য় শতাব্দে সম্রাট অশোকের তৈরী কাঠ বা ইটের তৈরী গেট ও রেলিং ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেও অন্ততঃ দু'তিন শ' বছর লাগবার কথা। যাই হোক—খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দ বা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে যদি সাঁচীর প্রস্তর তোরণ নির্মিত হয়ে থাকে, তবে ঐ সময় পুণ্ড্রবর্ধন-রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্বের কথা মধ্য ভারতে জ্ঞাত ছিল এবং এখানকার রাজধানীর ধনাঢ্য বৌদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিরা মধ্যপ্রদেশের স্তূপ নির্মাণে আর্থিক সাহায্য দানে বাংলার পক্ষে গৌরবের কাজই করেছিলেন। এই সময় পুণ্ড্রবর্ধন-নগরের ঐশ্বর্য ও সম্পদের পরিচয়ও এ কাহিনীতে প্রকারান্তে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে, গুপ্তযুগে পুণ্ড্রবর্ধন গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উত্তরবঙ্গের বহু শতাব্দীর এই গর্বিত স্বাধীন জনপদ সাময়িকভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা হারায়। কিন্তু ঠিক কোন সময় পুণ্ড্রবর্ধন গুপ্তদের দখলে

আসে তা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে, সে প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা "গুপ্ত যুগের উত্তরবঙ্গ" অধ্যায়ে আলোচিত হবে ।

ব্যবহৃত গ্রন্থ তালিকা :—

1. History of Ancient Bengal—
Dr. R. C. Mazumdar, Calcutta, 1974.
2. Kirat-Jana-Kriti—Dr. S. K. Chatterjee
3. History And Culture of the Indian People—
Dr. Mazumdar & Dr. Pusalkar, Landon, 1957
4. Early History of Kamarupa—
K. L. Barua, Gauhati, 1966.
5. Asura India—Banerjee Sastri, Patna, 1926
6. Aryan Immigration into Eastern India—
D. R. Bhandarkar.
7. Aryans in Eastern India in Rigvedic Age—
H. C. Chakladar.
8. Aryanization of East India—V. R. R. Dikshitar.
9. বাঙ্লার ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৩৭২
10. বাঙ্গালীর ইতিহাস—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, কলিকাতা, ১৯৮০
11. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার,
কলিকাতা, ১৯৮১
12. Gazetter of Bengal and North—East India—
E. A. Gait, Delhi, 1979.
12. West Bengal District Gazetter ( Maldah )—
J. C. Sengupta, 1969.
13. Do ( West Dinajpur )—1965

# চতুর্থ অধ্যায়

# কামরূপ ও গৌড়ীয় শাসনের ধারা

## ক. পূর্বীয় উত্তরবঙ্গে কামরূপীয় শাসন

[ প্রাগৈতিহাসিক ও অর্ধঐতিহাসিক পর্ব :
খৃ. পূ. ১০০০ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দ ]

### ১. কামরূপীয় শাসন আসাম-বাংলার যৌথ ইতিবৃত্ত

নব্যভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের জন্য, উক্ত সময় থেকে, ভারতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-সচেতনার জন্ম। আধুনিক ভারতের অনেকাংশে এই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বিভাগের জন্য—প্রাদেশিক ইতিহাস রচনার ধারা প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রদেশগুলির ইতিহাস চর্চা বর্তমান রাজনৈতিক বা শাসকীয় সীমা-রেখায় আবদ্ধ রেখে করা সম্ভব নয়। কারণ—কোন কোন প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস, শাসনকার্যীয় বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের মধ্যে প্রবিষ্ট বা তার নিজের মধ্যেই অন্য প্রদেশের ইতিহাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আসামস্থিত কামরূপ-রাজপাট যেমন অধিকাংশ সময়েই উত্তরবঙ্গের পূর্বার্ধকে আপন শাসনের অন্তর্ভুক্ত রেখেছে, আদিকাল থেকে কামতাপুর শাসনের পত্তন অবধি। অধুনা কামরূপ আসামে পড়েছে বলে, পূর্বীয় উত্তরবঙ্গের ইতিহাসকে আসামের ইতিহাসের মধ্যে খুঁজতে হচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে তাকে মুখ্যত পাওয়া যায় না।

কামরূপীয় শাসন তো শুধু অহমদের শাসন নয় বা মঙ্গোলদের শাসন নয়—কামরূপের রাজপাটে সময়ে সময়ে বঙ্গজ রাজন্যগণও তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কামরূপকে কেন্দ্র করে বাঙলার ধর্ম-সাধনা প্রসারিত হয়েছে। কামরূপের ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণই তো বঙ্গের বৃহত্তম সংখ্যক কায়স্থ শ্রেণী গঠন করেছে। আবার কামতাপুর থেকে বঙ্গভাষী রাজাগণও তো পশ্চিম আসাম শাসন করেছেন। আসলে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নিম্ন আসাম এবং করোতোয়ার পূর্বে অবস্থিত পূর্বীয় উত্তরবঙ্গ একই ভৌগোলিক পরিবেষ্টনীতে; এবং ১৬শ শতাব্দ পর্যন্ত একই ভাষাভাষী থাকার ঐতিহাসিক কারণে একটি রাজনৈতিক ও

শাসকীয় এককে শাসিত হয়ে এসেছে। এই অঞ্চলের ভাষাভঙ্গীও পূর্ব মাগধীর শাখা 'বঙ্গ-আসামীয়' ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত একই ছিল। যাই হোক, সব দিক বিচার করলে—একথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে পশ্চিম কামরূপীয় অঞ্চলের তথা পূর্বীয় উত্তরবঙ্গের ইতিহাস—বঙ্গ ও আসামের যৌথ ইতিহাস এবং তার মধ্যে পূর্বীয় উত্তরবঙ্গের ইতিবৃত্তকে বঙ্গীয় ইতিহাসে চিত্রিত করতে হলে—তার যে প্রাচীন রাজপাট, প্রাক্‌জ্যোতিষ বা কামতাপুর, তার সাধারণ ইতিহাস বর্ণনা অনিবার্য হয়ে পড়ে। কামরূপীয় শাসন, অংশতঃ পূর্বীয় উত্তরবঙ্গের ইতিবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত এবং বঙ্গীয় ইতিহাসের অচ্ছেদ্য অংশ।

## ২. দানব ও অসুর বংশের শাসন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আনুমানিক দুই হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর একটি বিশিষ্ট শাখা বর্মাসীমান্ত পেরিয়ে আসামে প্রবেশ করে এবং আসাম অববাহিকায় নিজেদের বিস্তৃত করতে থাকে। পণ্ডিতদের অনুমান প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত, আসামের জ্ঞাত প্রথমতম রাজা মহীরঙ্গ<মৈরাং ('বেড়ো শব্দ') দানব। সম্ভবতঃ এই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক পরবর্তী ঘটনাক্রমের থেকে কালক্রমের উর্ধ্বমুখী বিশ্লেষণে মনে হয়—১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে মহীরঙ্গ দানব কামরূপ অঞ্চলে ক্ষমতায় আসেন। বর্তমানে পরিচিত 'মৈরাং পর্বত' বোধ হয়, মৈরাং ( সং মহীরঙ্গ ) দানবের রাজধানী ছিল। তাঁব রাজ্যের অধিকাংশ প্রজারাও ছিলেন, প্রাচীন শাস্ত্রাদির উল্লেখ মতে, কিরাত ও ম্লেচ্ছ। কিরাত ও ম্লেচ্ছগণও পণ্ডিতদের দ্বারা মঙ্গলীয় বলে চিহ্নিত হয়েছে। মৈরাং-এর মৃত্যুর পরে ইটাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর এবং ঘটকাসুর রাজত্ব করেন। এঁরা নতুন রাজবংশের রাজা, না মৈরং-এর বংশধর, তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে এই রাজবংশের পৌরাণিক কাহিনীর সপক্ষে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রাক্‌-জ্যোতিষ অঞ্চলে এঁরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন।

## ৩. দ্রাবিড় রাজবংশ—নরকাসুর

মৈরাং-এর বংশধর রত্নাসুরকে উচ্ছেদ করে মহারাজ নরক পরবর্তী রাজবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন। পণ্ডিতদের অনুমান—নরকাসুর জন্মগত

ভাবে দ্রাবিড় ছিলেন অথবা কোন-না-কোনভাবে শংকর-জাত অনার্য ছিলেন। মহাভারতের মতে—তিনি উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বাণরাজার সমসাময়িক ছিলেন। কালিকা-পুরাণের মতে মহারাজ নরক, বিদেহ রাজপুরীতে পালিত ও বর্ধিত হন ( বিদেহ-রাজ কি মাতুল বংশ ? ) এবং মঙ্গোলীয় শাসক ঘটককে আক্রমণ ও পরাভূত করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি অতঃপর কিরাত ও ম্লেচ্ছদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেন সমুদ্র পর্যন্ত এবং তাদের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডে, বিশেষতঃ করোতোয়া ও ললিতকন্থার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেন। এই সব ব্রাহ্মণদের আনা হয়েছিল পূর্ব ও মধ্য ভারত থেকে। সেটাই বোধহয় কামরূপীয় অঞ্চলে আর্যদের প্রথম উপনিবেশ। আর্য সংস্কৃতিপূর্ণ বিদেহ নগরের পরিবেশে গঠিত মানসিকতায় নিয়ে দ্রাবিড় রাজা নরক—কামরূপ অঞ্চলে আর্য সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচারে যে অভিনিবেশ দান করেছিলেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শাস্ত্রমতে পার্শ্ববর্তী দ্রাবিড় রাজাগণের উপদেশে—তিনি আবার দ্রাবিড় জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারক হয়ে ওঠেন এবং 'লিঙ্গ' পূজা শুরু করেন। বাণের উপদেশেই তিনি আর্যদেবগণের পূজা পরিত্যাগ করেন এবং আর্য-উপনিবেশ-বাসীদের উপর পীড়নমূলক আচরণ শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই দ্রাবিড়-পুনরুত্থান বন্ধ করতে পূর্ব ভারতে আগমন করেন—বাণরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর হাত দু'টি দ্বিখণ্ডিত করে করদহের জলে ফেলে দিয়ে তিনি প্রাক্‌জ্যোতিষ অভিমুখে অগ্রসর হন। কালিকা-পুরাণ-মতে নরকের রাজধানী ছিল—বর্তমান গৌহাটির তিন মাইল দক্ষিণে। যা আজও "নরকাসুর গাঁও" বলে পরিচিত। এই স্থানটি ছোট ছোট পাহাড়ের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সম্বলিত। পুরাণ-মতে—এই নগরী ছিল দুর্ভেদ্য এবং দেবতাদের প্রবেশ অযোগ্য। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও অবশেষে নরকাসুর পরাজিত ও নিহত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ নরকের পুত্র ভগদত্তকে সিংহাসনে বসান।

## ৪. মহারাজ ভগদত্ত

মহাভারত ভগদত্তকে ইন্দ্রের সমান পরাক্রান্ত রাজন্য বলে অভিহিত করেছে। ভগদত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও—কিছুদিনের মধ্যেই পাণ্ডব প্রভাব অস্বীকার করেন এবং জরাসন্ধকে [ যিনিও হয় অনার্য অথবা শংকর-বংশীয় রাজা ছিলেন ; শাস্ত্র অন্ততঃ তাঁকে পূর্বজন্মে অসুর ছিলেন বলে চিহ্নিত করেছে ]

ভারতের রাজচক্রবর্তীর মর্যাদায় বসাবার উদ্যোগে পুণ্ড্রবর্ধন-রাজ বাসুদেব ও অন্যান্যদেব সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে কিভাবে ভগদত্ত-আদির সে প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং পরাজিত ভগদত্ত ও বাসুদেবকে রাজসূয় যজ্ঞে হাজির হতে হয়। রাজসূয় যজ্ঞ মধ্যেই রাজন্যদের সম্মান রক্ষার যুদ্ধে বাসুদেব নিহত হন; কিন্তু ভগদত্ত আত্মগ্লানি মুছে ফেলবার সুযোগ নেন—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগদান করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভগদত্ত অবশ্য প্রায় বৃদ্ধ কিন্তু তা সত্বেও মহাভারতকার তাঁর বলশালী পর্বতাকার হস্তী এবং তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের খ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগদত্ত নিহত হয়ে ভূপতিত হলে—যুদ্ধ বন্ধ রেখে পাণ্ডবপক্ষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভগদত্তের শবদেহকে প্রদক্ষিণ করে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন কবে।

## ৫. ভগদত্তের অধস্তন পুরুষগণ

কামরূপ শাসনাবলীতে দেখা যাচ্ছে ভগদত্তের পরে তৎপুত্র বজ্রদত্ত সিংহাসনে আবোহণ করেন। কিন্তু বাণভট্টের লেখক ভগদত্তের দুই পুত্রের কথা বলেছেন যথা জ্যেষ্ঠ পুষ্পদত্ত এবং কনিষ্ঠ বজ্রদত্ত। মহাভারতের বর্ণনাতে দেখা যায় ভগদত্তের এক পুত্রও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হন; সম্ভবত তিনিই ছিলেন পুষ্পদত্ত এবং সেই হেতু কনিষ্ঠ বজ্রদত্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। বজ্রদত্তের মৃত্যুর পরে কামরূপের ইতিহাস অন্ধকারে ডুবে যায়। পরবর্তীকালের আর কোনো রাজা আপন কৃতিত্বে ও গরিমায় ভারতেতিহাসে ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। বর্মণরাজবংশের আবির্ভাবের আগে আর কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময় কামরূপ ও সমগ্র আসামের শাসনব্যবস্থা স্থানীয় ভূস্বামী বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক নৃপতির হাতে চলে যায় এবং স্বভাবতঃই সে সব রাজতন্ত্র আপন কৃতিত্বে ও গরিমায় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি।

## ৬. প্রাক্‌গুপ্ত যুগের অন্ধকারময়তা

শুধু নরকের ১৯তম বংশধর 'সুবাহু'র কথা জানা যায় যে, তিনি বিক্রমাদিত্যের (?) সময় কামরূপের রাজা ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের অশ্বমেধের ঘোড়াকে বন্দী করেছিলেন। উপক্রমণিকাতে বলেছি এই অঞ্চলের রাজতন্ত্র কোনো যুগে বিনা যুদ্ধে বিদেশীর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, তা সে

শক্তি থাক আর না থাক। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে সুবাহু পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। এর পরে হঠাৎ জিতারি নামক একজন দ্রাবিড় রাজার নাম পাওয়া যাচ্ছে যিনি ধর্মপাল নাম নিয়ে কিছুদিন কামরূপ শাসন করেন। কিন্তু তাঁর সঠিক সময় ও বংশ-পরিচিতি বিশেষ কিছু জানা যায় না।

তবে বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে বর্ণিত ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় কামরূপ বা আসামের উল্লেখ নেই। তন্মধ্যে "অঙ্গুত্তর নিকায়" এবং "জৈন ভগবতী" মোটামুটি খৃ. পূ. পঞ্চম শতাব্দের রচনা। অতএব ঐ সময় পর্যন্ত আর্যরাজশক্তির প্রতিষ্ঠা আসামে ঘটেনি। অর্থাৎ গণ-সংস্কৃতি ও শাসক-গোষ্ঠীর সংস্কার মূলতঃ অনার্য মঙ্গোলীয় তবে তার উপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল।

## খ. দক্ষিণ-উত্তরবঙ্গে গৌড়-কেন্দ্রিক শাসনের সূত্রপাত

### ১. ভূমিকা ও সম্ভাবনার ইঙ্গিত

উত্তরবঙ্গের দক্ষিণতম প্রান্ত গৌড়ীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক কারণেই একটি নগর-রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে ওঠার উপযুক্ত ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে উল্লেখও আছে এখানে গড়ে-ওঠা উন্নত নগরের। কিন্তু সে নগর বাণিজ্যিক কারণে বা স্থানীয় রাজধানীরূপে গড়ে উঠেছিল এবং রাজধানী হলেও কার রাজধানী কবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান করাই কঠিন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, আনুমানিক ১০০০ খৃ. পূর্বাব্দে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন—পূর্বভারতে পাঁচটি গোষ্ঠীর অনার্য রাজাগণ রাজত্ব করেছেন—যথা পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, অন্ধ্র ও মুতিবাস। এঁরা একই বংশোদ্ভব ছিলেন। এর মধ্যে পুণ্ড্রগণ নিশ্চিতভাবে দ্রাবিড় বলে চিহ্নিত হওয়ায় অপর গোষ্ঠীগুলিকেও আমরা দ্রাবিড় বলে গণ্য করেছি। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, মহাভারতের যুগে মধ্যভারতের পাণ্ডব-রাজশক্তি যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তী মর্যাদায় ভূষিত করতে পূর্বাঞ্চলে অভিযান করে এবং স্থানীয় অনার্যশক্তিগুলিকে পরাভূত করে। রাজসূয় যজ্ঞকালে পরাভূত রাজশক্তিগুলি—মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং তারপরে আবার অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছে। তা থেকে প্রমাণিত হয়—পাণ্ডবদের দিগ্বিজয়ের ফলে পূর্বভারতে দ্রাবিড় রাজশক্তি বিলুপ্ত

হয়নি। খৃ. পূ. ৫ম শতকে রচিত "অঙ্গুত্তর নিকায়" বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আর্যদের শাসনপীঠ ১৬টি মহাজনপদের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মগধ ও অঙ্গের পূর্বে আর্য রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতএব মহাভারতের যুদ্ধে স্থিত দ্রাবিড় রাজশক্তিরই শাখা প্রশাখা, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্র রাজশক্তি যে প্রাচীনকালে অধিকাংশ উত্তরবঙ্গে, এমন কি বাসুদেব বা অপরাপর শক্তিশালী রাজার অধীনে উত্তর রাঢ়াদি অঞ্চলেও ক্ষমতা বিস্তার করে থাকতে পারে, তাতে বিচিত্র কিছুই নয়। বাসুদেব যে বঙ্গভূমি ও উত্তর হিমালয়ে রাজ্য বিস্তার করেন—মহাভারতে তার উল্লেখ আছে। এই সময়ে রাজ্যের মধ্যকেন্দ্ররূপে—কোটিবর্ষ অপেক্ষা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করাও অসম্ভব না হতে পারে।

## ২. গৌড়-নগরী ও দ্রাবিড় জনপদী ঐতিহ্য

আমরা পূর্বেই বলেছি—পণ্ডিতগণ শবরজাতি (দ্রাবিড়)কে-সাঁওতাল পরগণা থেকে ছোটনাগপুর এলাকায়—ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠ বলে দাবী করেছেন—প্রাকার্য শাসনের যুগে। এই দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর কোনো শাখাও—গঙ্গারাঢ়ীয় অঞ্চলে রাজত্ব স্থাপন করে থাকতে পারে তা এঁরা শবর বা পুণ্ড্র যে গোষ্ঠীরই হোন।

রাঢ় গৌড় ও পুণ্ড্রে যে দ্রাবিড়গণই প্রথমে নগর ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতে এইসব প্রধান নগরের নাম বিশ্লেষণেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাঢ়, গৌড় বা পুণ্ড্র—তিনটি নামের মধ্যেই দ্রাবিড় উচ্চারণ, দ্রাবিড় শব্দমূল ও প্রত্যয় লুকিয়ে আছে অর্থাৎ এরা দ্রাবিড় শব্দভাণ্ডার জাত, যদিও শব্দ তিনটিকে, পরবর্তীকালে উচ্চারণে সামান্য ভেদ ঘটিয়ে, আর্যায়িত করা হয়েছে। দ্রাবিড় ভাষায় উর্ (ur) মানে শহর। শব্দমূলে 'উর্' যোগ করে স্থান-নাম তৈরী করা দ্রাবিড় ভাষার একটি লক্ষণ, এবং তা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। অধুনা প্রখ্যাত দক্ষিণ ভারতীয় অনেক শহরের নামও এভাবে তৈরী যথা—

ভেল্ল্+উর্ (>ভেল্লুর), আট্ট+উর্ (>আট্টুর) রানীবেন্ন+উর> রানীবেন্নুর ইত্যাদি।

রাঢ়বঙ্গের 'নান্নুর' প্রভৃতি স্থান-নামও এইভাবে করা হয়েছে। এবং পূর্ব কথিত নগর-রাজধানীগুলির নামের উৎসও তদ্রূপ। যথা :—

(১) ল্লা+উর্>লাঢ় (প্রাঃ সং উচ্চারণে)>রাঢ় (তৎসম)।

(২) গা+উর্>গাউর্>গৌর্, গৌড় (সং/বাং)।

(৩) পুণ্ড্+উর্>পুণ্ডুর্>পুণ্ড্রঃ>পুণ্ড্র (সং/বাং),

গৌড়নগরীর নামের উৎপত্তি দ্রাবিড় হলেও এবং নগরীটি দ্রাবিড়-প্রতিষ্ঠ হলেও কোন্ আমলে কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। অথচ উত্তর বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে গৌড় যথেষ্ট পরিচিত নগর। প্রাক্-মৌর্যযুগে স্বখ্যাত অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হয়—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই নগর-রাজধানীর উল্লেখ থেকে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই নগরীর উল্লেখ রয়েছে। বাৎসায়নও একে একটি পরিশীলিত নাগরিকদের নগররূপে সুখ্যাতি করেছেন। খৃষ্ট-পূর্ব-যুগের এতগুলো স্বতন্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ থেকে—গৌড়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। শুধু তাই নয়—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়—গঙ্গারাঢ়ীয় এই অঞ্চলের রাজন্যদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য ও সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যে সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার সামরিক শক্তি দুঃসাহসী ও পরাক্রান্ত আলেকজাণ্ডারের বিজয়াভিযানকে বিনাযুদ্ধে সমাপ্ত করে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

## ৩. গৌড়ের অবস্থানগত বিশিষ্টতা

গৌড় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুবিধাগুলি একে পূর্বভারতের একটি সাম্রাজ্যের শাসনকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠার সবরকম আনুকূল্যই যোগাতে সক্ষম ছিল। যথা—(ক) নদীপথে উন্নত ও দীর্ঘপ্রসারী যোগাযোগ (খ) পশ্চিমে বিশাল নদী ও রাজমহল পর্বতমালার প্রকৃতিদত্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ, যে-দিক থেকেই শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক বিপদের আশঙ্কা ছিল সেকালে (গ) বাণিজ্যিক সুবিধা—নদীবন্দর ও জলপথের সুযোগে (ঘ) সমগ্র বঙ্গ তথা উৎকল ও মগধাদিসহ মূল ভূখণ্ডের মধ্য বিন্দুরূপে—রাষ্ট্রশক্তির যোগ্য শাসন কেন্দ্র হতে গৌড়ের অগ্রাধিকার। এইসব সুযোগের স্বাভাবিক আকর্ষণে—পুণ্ডরীক বাসুদেবের সময় থেকে যে-কোন দ্রাবিড় শক্তির সাম্রাজ্য-প্রয়াসের মূল ঘাঁটি গৌড়েরই হওয়া সম্ভব ছিল। এবং পুণ্ড্ররাজশক্তির খ্যাতি থেকে অনুমিত হয়—এ

ধরনের কোন প্রয়াস ও তার আংশিক সাফল্য পূর্বকালে এসেও থাকতে পারে। অধুনা মধ্যরাঢ়ে পাণ্ডুরাজার যে ঢিবি পাওয়া গেছে—তা পুণ্ড্ররাজার কোনো স্থানীয় নগব হওয়াও বিচিত্র নয়। অষ্ট্রিক সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের উর্ধ্বাংশে দ্রাবিড় সংস্কৃতির চিহ্ন এবং নাম সাদৃশ্য (পুণ্ড্ররাজা>পাণ্ডুরাজা) থেকে এ অনুমান খুব কষ্ট-কল্পিত নাও হতে পারে। কারণ শবর-বংশীয় দ্রাবিড়দের কোন রাজা কোন বিশেষ সময়ে প্রখ্যাতি লাভ করে ইতিহাস-চিহ্নিত হয়ে ওঠেননি। অন্যদিকে পুণ্ড্রদের উত্তরবঙ্গের বাইরে দক্ষিণে ও পূর্বে শক্তি বিস্তারের উল্লেখ রয়েছে।

## ৪. পূর্বভারতে সাম্রাজ্য-সৃষ্টির প্রয়াস

জরাসন্ধকে (অন্ততঃ অর্ধদ্রাবিড়) সামনে রেখে আনুমানিক এক হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে বাসুদেবের সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বিনষ্ট হলেও—সে প্রয়াস পরবর্তীকালে যে হয়নি—তা নয়। এবং পূর্বভারতে অর্ধ-জ্যা-এর আকৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় রাষ্ট্রকে সংহত বা একত্রিত করে মধ্যবঙ্গের গৌড়ে এ ধরনের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রয়াসের অনুকূল পরিস্থিতি ঐতিহাসিক তথ্যে সমর্থিত হয়েছে।

বরাহমিহিরের মতে (বৃহৎ সংহিতা, সপ্তর্ষিবিচার, ৩ শ্লোক) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে সম্রাট হয়েছিলেন। কিন্তু সে সাম্রাজ্য টেকেনি। পরীক্ষিৎ এবং জন্মেজয়ের পরে সে সাম্রাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়—একটি অংশ ইন্দ্রপ্রস্থেই থাকে, অন্য অংশ কৌশাম্বীর শাসনাধীনে চলে যায়। ধীরে ধীরে ছোট ছোট রাজ্যে উত্তর ভারত বিভক্ত হয়ে যায়। বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় এমনি ষোলটি ক্ষুদ্র-রাষ্ট্র ভারতবর্ষের পরস্পর বিবদমান শক্তিরূপে বিরাজমান ছিল। কিন্তু খৃষ্ট পূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে এই বিবদমান শক্তিগুলিকে পরাভূত করে—সমগ্র উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে—যার শাসকীয় মূল ছিল গঙ্গারাঢ়ীয় অঞ্চলে এবং যে শক্তির শাসকশ্রেণীকে গঙ্গারাঢ়ীয় জনগণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায় সমসাময়িক গ্রীক-লেখকদের রচনা থেকে এ তথ্য জানা গিয়েছে।

## ৫. গৌড়কেন্দ্রিক রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব

এ বিষয়ে প্রথম ও মূল তথ্য পরিবেশন করেন—চন্দ্রগুপ্তের সভায় প্রেরিত গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস; তাঁর "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থ অধুনা পাওয়া না গেলেও—বহু গ্রীক ও লাটিন ঐতিহাসিক উক্ত গ্রন্থের যে সকল অংশ উদ্ধৃত রেখে গেছেন তা সংগ্রহ করে—মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণরূপে প্রচারিত হয়েছে। উক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়—ঝিলমের তীরে পুরুরাজকে পরাজিত করে আলেকজাণ্ডার—বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এখানে তাঁর শিবিরে সংবাদ পৌছায় যে, অনতিদূরে প্রাসিয়ই (Prasioi) ও গণ্ডরিদই (Gandaridoi) [ এবং প্লিনীর বানানে যা গঙ্গারিদাই (Gangaridai) ] নামক দু'টি পরাক্রান্ত জাতি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে আসছে। এই সংবাদ শ্রবণে আলেকজাণ্ডার আর পূর্বদিকে অগ্রসর না হয়ে এবং স্থলপথে প্রত্যাবর্তন না করে সমুদ্রপথে দেশের অভিমুখে পাড়ি জমান।

## ৬. গণ্ডরিদই (গৌড়ীয়) জনগণ ও রাষ্ট্রশক্তি

খৃ, পূ, প্রথম শতকে ডিওডোরাস—উক্ত জাতি দু'টির একমাত্র রাজার নাম 'জাণ্ড্রামিস' (Xandrames) বলে জানিয়েছেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্লুটার্ক (Plutarch) লিখেছেন—পূর্বোক্ত জাতিদ্বয় মোট দুই লক্ষ পদাতিক, ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ৮০০০ রথ ও ৬০০০ হস্তী সঙ্গে নিয়ে আলেকজাণ্ডারকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছিল। ট্রাবো (খৃ. পূ. ৫৪ অব্দে জন্ম), প্লিনী (জন্ম ২৩ খৃ.), আরিয়ান (১০০-১৩৮ খৃষ্টাব্দ) এবং কার্টিয়াস রুফাস (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ)—ঐ একই কাহিনী জানাচ্ছেন। প্লিনী নতুন তথ্য সংযোজন করে বলেছেন—প্রাসিয়ইদের নগর ছিল পালিবোথ্রা (Palibothra) এবং গঙ্গারিদাইদের নগর ছিল—পার্থালিস (Parthalis)। পার্থালিসেই রাজা থাকতেন এবং তাঁর শুধু শরীর রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল, ৬০,০০০ পদাতিক, ১০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ সজ্জিত হস্তী। "Saint Martin-এর মতে প্লিনীর কথিত Parthalis (পার্থলিস) শব্দটি "বর্দ্ধন" ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। 'বর্দ্ধন' যে পুণ্ড্রবর্ধনের সংক্ষিপ্ত নাম—তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"*

---

* বাঙলার ইতিহাস—শ্রী প্রভাসচন্দ্র সেন, পৃ. ৭৮-৭৯

পার্থালিস 'পুণ্ড্রবর্ধন'রূপে, 'পলিবোথ্রা' পাটলিপুত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে; অপর দিকে ডিওডোরাস যাকে Xandrames বলেছেন, Curtius Rufus তাঁকে Agrammes বলেছেন, এবং সমসাময়িককালের বিবেচনায়—পণ্ডিতগণ 'নন্দবংশীয় উগ্রসেন'কে পূর্ব ভারতের এই পরাক্রান্ত সম্রাট বলে চিহ্নিত করেছেন। গঙ্গরিদই বা প্রাসিয়ই নিয়ে পূর্বে কিছু বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে এই দুই শব্দে গ্রীক ও ল্যাটিনগণ যে গঙ্গারাঢ়ীয় ও পলাশীয় জনগণ বুঝিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। শব্দ-কল্পদ্রুমে ও শব্দরত্নাবলী দৃষ্টে দেখা যায়—পলাশ শব্দের অর্থ মগধ দেশ। মেগাস্থিনিস, ডিওডোবাস, প্লাটার্ক যাকে গণ্ডরিদই বলেছেন—বহু লেখক তাকে 'গৌড়ীয়' শব্দের গ্রীকরূপান্তর বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঘটনাকাল (আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের) থেকে চারশ' বছর পরে—প্লিনী শব্দটিকে 'গঙ্গারিদাই' বলে উল্লেখ করেছেন, হয়তো গঙ্গানদীর অস্তিত্বের স্মৃতি সঙ্গতিতে, হয়তো বা দেশ অর্থে গঙ্গারাঢ়ীয় দেশ বা অঞ্চল বোঝাতে। তবে প্রাচীনতম উল্লেখে 'গণ্ডরিদই' থাকলে—তাকে বর্জন করে নতুন বানান গ্রহণের যুক্তি নেই। অতএব—গণ্ডরিদই জাতি বলে গৌড়ীয় জাতি হিসেবে নেওয়া যেতে পারে তবে সে জাতি গঙ্গা ও রাঢ়ের গাঙ্গেয় ভূমির জনতা দিয়েই গঠিত হওয়া স্বাভাবিক। গৌড়কে কেন্দ্র করে নগর বা রাষ্ট্রের উল্লেখ এভাবেই প্রথম পাওয়া যায়। প্রাক্‌মৌর্যযুগেই গৌড়ের অস্তিত্বের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে ঘোষিত। অতএব—সে দিক থেকেও, 'গঙ্গারিদই' অর্থে 'গৌড় নগরের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নেওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অতএব গ্রীক ও ইটালীর প্রাচীন গ্রন্থাদির সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে যে—খৃ. পূর্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে, গঙ্গারাঢ়ীয় জনগণ এবং পলাশীয় (মগধীয়) জনগণের রাজা উগ্রসেন, যিনি তৎকালে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে বসবাস করতেন, এবং যার দেহরক্ষী বাহিনী ষাট হাজার পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী ও সাত শত হস্তী নিয়ে গঠিত, যার বিশাল সাম্রাজ্য বিপাশার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যিনি অগ্রগামী গ্রীকবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে দুই লক্ষ পদাতিক, ৮০ হাজার অশ্বারোহী, ৮ হাজার রথ এবং ৬ হাজার হাতী পাঠিয়েছিলেন।

### ৭. গণ্ডরিদই ও প্রাসিয়ইদের সম্রাট উগ্রসেনের বংশপরিচিতি

স্মৃতি গ্রন্থে উগ্রসেনের মাতৃকূলকে অনুন্নত বর্ণীয় বলা হয়েছে—'অনুলোমাস্ত মাতৃসবর্ণাঃ' ( বিষ্ণু স্মৃতি, ১।৬২ )। নারদীয় মনুবচনে "শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াজ্জাতো নাপিতোবর্ণ-সঙ্করঃ" এই নির্দেশ রয়েছে। সম্ভবতঃ উগ্রসেন শূদ্র-মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত ছিলেন, এবং তাই শাস্ত্র বিচার মতেই গ্রীকগণ উগ্রসেনকে নাপিত বলে উল্লেখ করেছেন। পুরাণকারগণ শূদ্ররক্ত-জাত বলে উগ্রসেনকে পুরোপুরি শূদ্র বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের—শূদ্র স্ত্রী থাকা অবিধেয় ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখেছে যে, ক্ষত্রিয় নৃপতিব চারিজাতীয়া স্ত্রী পরিলক্ষিত হয়—( শত. ব্রা. ১৩।৪।১৮ ) এবং পুবাকালে—বহু ক্ষত্রিয়ের শূদ্রস্ত্রীজাত সন্তানাদিকে শূদ্র বলা হয়নি, ক্ষত্রিয় বলাই বিধেয় জ্ঞান করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ভারতের শূদ্রশ্রেণী মূলতঃ অষ্ট্রিক গোষ্ঠীয় আর্যসংস্কৃতিভুক্ত জনগণ। এদের সঙ্গে রক্ত মিশ্রণ ভারতীয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সমাজে নূতন নয়, এবং অষ্ট্রিক শ্রমজীবি জেলে কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভেই ভারত সংস্কৃতির সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠার স্থপতি ব্যাসের জন্ম। এবং ব্যাস শূদ্র বলে পরিগণিত হননি। সেইজন্যে অনুমিত হয়—নন্দবংশীয় পিতৃকুলের ক্ষত্রিয় রক্তও ছিল—অনার্য শ্রেণীর অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয় এবং এত বড় বাজাব পুণ্ড্রবর্ধন নগরে রাজধানী থাকায় মনে করা অন্যায় হবে না যে, তিনি ছিলেন পুণ্ড্রবংশীয় দ্রাবিড়-সন্তান, যে পুণ্ড্রবংশ প্রথমে দাসদস্যু জাতি বলে ধিকৃত হলেও পরবর্তী আর্যসমাজ যাদের সৎ ক্ষত্রিয় বলে মেনে নিয়েছিল ( তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। তাই দ্রাবিড়ও অষ্ট্রিকের দ্বিবিধ সংকর—ইন্দ্রসেনকে শূদ্র বলেই চিহ্নিত করলেন পুরাণকারগণ, নারদীয় মনুবচনের নির্দেশ অমান্য করেও।

যাই হোক গঙ্গারিদাই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই পূর্বভারতের রাজশক্তির মহাভারতীয় যুগের অসম্পূর্ণ অভিলাষ পূর্ণ হল এবং সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গৌড়-কেন্দ্রিক নগর ও শাসন-ব্যবস্থার প্রথম আভাস সূচিত হল।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( চতুর্থ অধ্যায় ) ঃ—

1. Ancient Countries in Eastern India—F. E. Pargiter.
2. Ancient India as described by Magasthenes and Arrian —Mc Crindle. I. W.

3. The Invasion of India by Alexander, the Great—
Mc Crindle, I. W.

4. Analysis of Race-Mixture in Bengal ( Royal Asiatic Society, Bengal, N. S. XXIII, 301 ).—By P. C. Mahalanabis.

5. Excavations at Bangarh—Goswami, K G.

6. Early History of Kamarupa—K. L. Barua Bahadur.

7. The Early History of Bengal—K. C. Mazumdar

8. History of North-Eastern India—R. Basak

9. Gait's History of Assam

10. Kirat-Jana-Kriti—S. K. Chatterjee

11. Aitareya Aranyaka—Keith

12. Political History of Ancient India—
H. C. Roy Choudhury

13. বাঙ্গালার ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

14. বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদি পর্ব )—নীহাররঞ্জন রায়

15. বাংলাদেশের ইতিহাস ( প্রাচীন যুগ )—রমেশচন্দ্র মজুমদার

16. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন

17. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়—অতুল সুর

# পঞ্চম অধ্যায়

# গুপ্তযুগের উত্তরবঙ্গ

( খৃষ্টীয় ৩২০ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় ৫৭৫ অব্দ পর্যন্ত )

## ক. পুণ্ড্রবর্ধন ( মহাস্থানগড়, কোটিবর্ষ ও গৌড়সহ )

### ১. পুণ্ড্রবর্ধনে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধিকারের সূচনা

হরিসেনের এলাহবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, সমতট ছাড়া সমগ্র বঙ্গভূমিই সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুণ্ডবর্ধন ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনীতে পুণ্ড্রবর্ধনের দিকে সেনা প্রেরণের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। অতএব মনে করা যেতে পারে যে সমুদ্রগুপ্তের পক্ষে পুণ্ড্রবর্ধনের দিকে অভিযান করার প্রয়োজন হয়নি, তার পূর্বপুরুষই কেউ এটা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে থাকবেন।

কারণ এটা নিশ্চিত যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাছে পুণ্ড্রবর্ধন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ছিল। একথাও বিবেচ্য যে—এই শত শত বছরের প্রাচীন ও স্বাধীন রাজতন্ত্রের পতনের কাহিনী হরিসেনের কাছে অনুল্লেখ্য বলে গণ্য হতে পারে না। তাছাড়া ঐতিহ্যমণ্ডিত ও স্বাধীনতাকামী এই রাজশক্তি তার দৌর্বল্যের দিনেও বিনাযুদ্ধে রাজত্ব হারায়নি। অথচ গুপ্তযুগে কোন বিবরণে তেমন কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। সে কারণে কেউ কেউ মনে করেন গুপ্তদের পূর্বপুরুষদের আমলে, একাধিক প্রয়াসে অল্প অল্প করে এই রাজ্য গুপ্ত-শাসনে চলে যায়। কারণ এক সঙ্গে এই ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্যের পতনের জন্য বড় যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল এবং সে কাহিনীও উল্লেখযোগ্য বলেও বিবেচিত হতো।

এই সব কারণেই এবং এ বিষয়ে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, গুপ্তশক্তি একটি ভুঁইফোঁড় ব্যাপার নয়—সমুদ্রগুপ্তে যে সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ, তার জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস কমপক্ষে দেড়শ বছরের; তেমনি বঙ্গভূমিও একদিনে গুপ্তদের করতলগত হয়নি—হয়েছে ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে। রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুপ্তের রাজ্য দিয়েই হয়তো সে

ইতিহাসের শুরু। বিশ্লেষণের ভঙ্গি ছেড়ে—ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিবেশন করে আমাদের অনুমানকে পরিষ্কার করতে পারি।

## ২. শ্রীগুপ্তের শাসনাধিকার

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ-এর বিবৃতি থেকে জানা যায় উত্তররাঢ় ও দক্ষিণ বরেন্দ্রভূমির এক উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ডে ১৮৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় শ্রীগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন, যিনি 'মিলিকিয়া সিকিয়া পোনো'-তে চৈনিকদের জন্য একটি বৌদ্ধমন্দির বা স্তূপ তৈরী করেন। চৈনিক উচ্চারণের ঐ স্থান নামটি ভারতীয় ভাষায় মৃগস্থাপন। এই মৃগস্থাপন স্তূপ বীরেন্দ্রভূমিতে (আধুনিক মালদার দক্ষিণাংশে) অবস্থিত ছিল। ফাউচারের লেখা 'Iconographic Buddhique' গ্রন্থের সাক্ষ্যে এবং ১০১৫ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত 'বরেন্দ্রভূমির মৃগস্থাপনাস্তূপে'র ছবিতে সেকথা নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গুপ্তসম্রাটদের পূর্বপুরুষ এবং হয়তো রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত দক্ষিণ উত্তরবঙ্গ ও উত্তর রাঢ়ে প্রথম ক্ষমতা দখল করেন।

## ৩. প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার

এর পরে মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভলিপি থেকে জানাতে পারা যাচ্ছে যে মহারাজ চন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে অনেকগুলো রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। স্বখোদিত প্রশস্তিতে বিজয়ীর ভূমিকায় বর্ণিত হলেও তিনি যে উক্ত ভূখণ্ড দখল বা রাজ্যভুক্ত করেছিলেন উক্ত লিপিতে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। কোন রাজপদবীর উল্লেখ না থাকায় অনেকেই একে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ১ম চন্দ্রগুপ্ত বলে মানতে রাজী হননি। তাছাড়া—"বঙ্গেষু" বলতে বঙ্গের কোন কোন অংশের রাজন্যদের বুঝিয়েছেন সে বিষয়েও অনিশ্চয়তা থেকে যায়। কারণ বঙ্গে তখন অনেকগুলো স্বখ্যাত জনপদ ও রাষ্ট্র ছিল এবং তার মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন এত ঐতিহ্যপূর্ণ রাজ্য যে তার বিশেষ উল্লেখ ছাড়া শুধু বঙ্গেষুর মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি বোঝানো দুষ্কর। কিন্তু এই লৌহ-স্তম্ভ-লিপি অন্ততঃ এটুকু ইঙ্গিত তুলে ধরে যে সমুদ্রগুপ্তের আগেই

গুপ্তরাজাদের পূর্বপুরুষগণ একাধিক বার বঙ্গভূমি আক্রমণ ও অংশবিশেষ দখল করেন এবং এই লিপি কথিত চন্দ্র রাজার আক্রমণে বাংলার রাজন্যবর্গ দুর্বল ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। এ ঘটনা কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ ছাড়াই বঙ্গভূমির গুপ্তদের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।

## ৪. উত্তরবঙ্গে গুপ্ত অধিকারের পূর্ব সীমানা

যাই হোক এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে—সমতট ছাড়া প্রায় সমগ্র বঙ্গই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইসময় পুণ্ড্রবর্ধনও নিশ্চয় ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে থাকবে। অন্ততঃ বুদ্ধগুপ্ত প্রচারিত দামোদরপুর তাম্রলিপি থেকে একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশরূপে শাসিত হয়েছে। তবে বাংলার মধ্যে রক্ষা পেয়ে থাকবে—অধুনা পশ্চিম ডুয়ার্স, যা যখন করতোয়া বেষ্টনে এবং কামরূপের অন্তর্ভুক্ত থাকায় রক্ষা পায়। কারণ কামরূপ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পূর্বে মহানদী করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রই ছিল গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমানা। তবে দক্ষিণ বঙ্গে রক্ষা পেয়েছিলেন সমতটের রাজা—যিনি করদ রাজ্যের অঙ্গীকারে আত্মরক্ষা করেছিলেন। হরিসেনের প্রশস্তি থেকে তা প্রমাণিত হয়। ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় সম্ভবতঃ সমতটও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

## ৫. পুণ্ড্রবর্ধনের স্বতন্ত্র জনপদ ও শাসকীয় ঐক্যের ঐতিহ্য রক্ষা

পুণ্ড্রবর্ধন গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার স্বতন্ত্র সত্তা কোনদিনই বিলুপ্ত হয়নি; গুপ্তসাম্রাজ্যের মধ্যে তা একটি অখণ্ড প্রশাসনিক ঐক্যে বিধৃত হয়ে শাসিত হয়েছে। আনুমানিক ৪১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের শাসনকাল থেকে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি বা শেষভাগ পর্যন্ত বাঙলায় গুপ্ত-রাজত্বের 'প্রধানতম' কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। এই রাষ্ট্রবিভাগ (পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি) এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সম্রাট স্বয়ং এর শাসনকর্তা (উপরিক) নিযুক্ত করতেন এবং কখনো কখনো তন্নিম্ন পদ 'বিষয়পতি' পর্যন্ত নিযুক্ত করতেন। আবার কখনো কখনো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই প্রদেশের 'উপরিক' নিযুক্ত হতেন—রাজপুত্রগণ স্বয়ং। যেমন

দামোদরপুরে প্রাপ্ত একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়—৫৪৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং সম্রাটপুত্র পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির শাসনকর্তারূপে (উপরিক) নিয়োজিত ছিলেন।

যাই হোক গুপ্তদের আবির্ভাবে উত্তরবঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীন রাজতন্ত্রের অবসান হলেও গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কিছুকাল পরেই অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৌড়ের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে স্বাধীন রাজতন্ত্রের পতাকা পুনরায় উত্তোলিত হয়। সে ঘটনা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

## খ. পূর্বীয় উত্তরবঙ্গে তথা কামরূপে স্বাধীন বর্মণ রাজত্ব

### ১. গুপ্তসাম্রাজ্যবাদ ও পুষ্যবর্মণ

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকেই জানা যাচ্ছে কামরূপ রাজ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়নি তবে সে দেশের রাজা গুপ্ত-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছেন এবং কর দানে স্বীকৃত রয়েছেন। উক্ত স্তম্ভলিপি থেকে আরো জানা যায় পূর্ব ভারতে সমতট, দাবক, নেপাল এবং কর্তৃপুর (কীর্তিপুর)-ও উক্ত প্রকারে বশ্যতা স্বীকারপূর্বক স্বাধীন সত্তা রক্ষা করেছে।

সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক এই স্বাধীন কামরূপরাজ কে ছিলেন, তা নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও, অধিকাংশ পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাজা পুষ্যবর্মণ। পুষ্যবর্মণের ডাকনাম ছিল সম্ভবতঃ সুবাহু, যেমন সুস্থিত বর্মণের ডাক নাম ছিল মৃগাঙ্ক। কামরূপের জনশ্রুতি ও পরবর্তী সাহিত্যের বর্ণনাতে জানা যায় এই সুবাহু গুপ্তসম্রাট বিক্রমাদিত্যের অশ্বমেধের ঘোড়াকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন এমন কোনো উল্লেখ গুপ্তদের রাজশাসনাবলীতে বা তাঁদের সভাকবিদের বর্ণনাতে নেই। বরঞ্চ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ করেছিলেন, সে বর্ণনা রয়েছে। এজন্যে মনে করা হয় যে পরবর্তী জনশ্রুতি ও লৌকিক সাহিত্য বহু যুগের ব্যবধানে সমুদ্রগুপ্তের স্থানে তৎপুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। যাই হোক সুবাহু পুষ্যবর্মণের রাজত্বকালেই সমুদ্রগুপ্তের সেনাবাহিনী কামরূপ আক্রমণ করে এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা যায়।

## ২. মহারাজ সমুদ্রবর্মণ

পুষ্যবর্মণের পরে তৎপুত্র সমুদ্রবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময় দেশব্যাপী 'মাৎস্যন্যায়' সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় বলে নিধনপুর শাসনলিপি থেকে জানা যায়। সমুদ্রবর্মণের পরে প্রথম বলবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সত্যিই পরাক্রমশালী ও যুদ্ধপটু রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ বলবর্মণের কন্যা অমৃতপ্রভাকে বিবাহ করেন কাশ্মীররাজ মেঘবাহন। স্বয়ম্বর-সভামাধ্যম এই বিবাহানুষ্ঠানের বর্ণনা রেখে গেছেন কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কলহন তাঁর 'রাজতরঙ্গিনীতে। এর থেকেই বোঝা যায় সর্বভারতীয় রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে আসামের কত গভীর যোগসূত্র ছিল।

মহারাজ বলবর্মণের পরে কল্যাণবর্মণ, গণপতিবর্মণ, মহেন্দ্রবর্মণ এবং নারায়ণবর্মণ রাজত্ব করেন। কিন্তু এঁরা কেউ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। নিধনপুর অনুশাসন থেকে শুধু এটুকুই জানতে পারা যায় যে, গণপতিবর্মণ ছিলেন দানপটু এবং নারায়ণবর্মণ াছলেন বিদ্যানুরাগী।

## ৩. মহারাজ মহাভূতবর্মণ

যাই হোক—নারায়ণবর্মণের পরে তাঁর পুত্র মহাভূতবর্মণ সিংহাসন লাভ করেন। একেই বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে 'ভূতিবর্মণ' নামে অভিহিত করেছেন। এই মহাভূতবর্মণ বা ভূতিবর্মণ চন্দ্রপুরী বিষয়ে প্রায় ২০০ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন—তাম্রশাসন জারী করে। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রপুরী বিষয় ছিল কৌশিক ( কোশী ) নদীর তীরে ; অর্থাৎ বর্তমান পূর্ণিয়া জেলাতেও সেকালে কামরূপের শাসন চালু হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া পূর্বোক্ত যে দু'শ জন ব্রাহ্মণের নামের তালিকা আছে তার মধ্যে ঘোষ, দত্ত, দাম, দেব, সোম, পালিত, পাল, কুণ্ড, দাস, নাগ, নন্দী পদবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাম্রশাসনে এরা ব্রাহ্মণ বলে কথিত হলেও এই সব পদবীই তো বাঙলার অধিকাংশ কায়স্থ জনসাধারণের পদবীই। অতএব দেখা যাচ্ছে একদা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে ভূমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরাই পরবর্তীকালে ব্রাত্য হয়ে বঙ্গভূমিতে কায়স্থরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়েছেন।

যাই হোক—মহাভূতবর্মণের রাজত্বের শেষ ভাগে উত্তর ভারতে আকস্মিক উল্কাপাতের মত যশোধর্মণের আবির্ভাব। মূলে তিনি মালবের রাজা ছিলেন—

কিন্তু অদ্ভুত সামরিক প্রতিভা দেখিয়ে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। তিনি পশ্চিমে হুন সম্রাট মিহিরগুলাকে পরাজিত করেন এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ( লৌহিত্য ) পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। মান্দাসোর স্তম্ভ-লিপিতে তাঁর এই বিজয়কাহিনী খোদিত রয়েছে। যশোধর্মণের আক্রমণে গুপ্তদের মগধীয় শাসন ভেঙ্গে পড়লে এবং যশোধর্মার সাম্রাজ্য অল্পকাল স্থায়ী হওয়ায়, পূর্বভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার সুযোগ নিয়ে বঙ্গে যেমন স্বাধীন রাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভাবিত হয়, তেমনি কামরূপের পক্ষে পশ্চিমমুখী রাজ্যবিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠে। এই সময় কামরূপ সম্ভবতঃ পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির বৃহত্তম অংশ, অন্ততঃ উত্তরভাগ, আপন শাসনভুক্ত করে নেয়। মহাভূতিবর্মণের কোশী নদীর তীরভূমিতে ভূ-দানের তথ্যই পুণ্ড্রবর্ধনে কামরূপ শাসনের বিস্তারকে প্রমাণিত করে।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহাসেনা গুপ্তের আবির্ভাব ঘটে; পরবর্তী গুপ্তদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও পরাক্রমশালী এই মহাসেনা গুপ্ত, মধ্যভারতে মৌখরীদের দমন করে কামরূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। প্রসরমান কামরূপ রাজ্যের তৎকালীন রাজা সুস্থিত বর্মণের সঙ্গে মহাসেনা গুপ্তের বলপরীক্ষা অনিবার্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধে সুস্থিতবর্মা ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং গুপ্তগণ তাদের রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভুক্তি পুণ্ড্রবর্ধন পুনরুদ্ধার করেন। সুস্থিতবর্মা তাঁর জীবৎকালে তাঁর হারানো রাজ্যাংশ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারেননি। সে কাজ সম্পন্ন করেন—তাঁর পুত্র ভাস্করবর্মণ, যথাস্থানে সে আলোচনা হবে।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( পঞ্চম অধ্যায় )

1. Epigrahia Indica—Vol-X.
2. Early History of India—Vincent Smith
3. Eastern India—Martin
4. Early History of Bengal—P. L. Paul
5. Dynastic History of Northern India—H. C. Roy
6. Age of Imperial Guptas—R. D. Banerjee
7. Kamrupa Sasanvali—P. N. Bhattacharya
8. Dynastic History of Bengal—A. M. Choudhury

9. Inscriptions of Early Gupta Kings—Fleet
10. History of Bengal—J. N. Sarkar
11. History of Bengal—(1943)—R. C. Mazumdar
12. District Gazetter of Rangpur, Maldah & Rajshahi.
13. Cambridge History of India—W. Haig
14. History and Culture of Indian people—
Mazumdar & Puspal Kar
15. Political History of Ancient India—
H. C. Roy Chowdhury
16. History of Assam—Gait
17. বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
18. বাংলাদেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
19. বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়
20. বাঙ্‌লার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# উত্তর-গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ : গৌড়ে স্বাধীন রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান

( আ. ৫১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আ. ৬৪২ খৃষ্টাব্দ )

### ১. পটভূমিকা ও বঙ্গরাজ্য

গুপ্ত-সাম্রাজ্যবাদের কবলে পড়ে গৌড়সহ সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধন স্বাধীনতাচ্যুত হলেও উত্তরবঙ্গের পূর্বীয় ভূখণ্ডে স্বাধীনতার অনুজ্জ্বল শিখাটিকে জ্বালিয়ে রেখেছিল—কামরূপের বর্মণ-বংশ। গুপ্তসাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মহাভূত বর্মণ পুণ্ড্রবর্ধনকে গুপ্ত-অধীনতা থেকে মুক্ত করলেও, তৎপুত্র সুস্থিতবর্মণের সময়—পুণ্ড্রবর্ধন আবার গুপ্ত অধিকারে চলে যায়। কিন্তু নিরন্তর গৃহবিবাদে দুর্বল, পুনঃপুনঃ হুন আক্রমণে পর্যুদস্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি নাড়িয়ে দিয়ে হঠাৎ উল্কার মত আবির্ভূত হলেন—মালবরাজ যশোধর্মণ; যার প্রবল সামরিক শক্তিতে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম ভারত পদানত হলেও সে সাম্রাজ্য আকস্মিকভাবে অবলুপ্ত হওয়ায়, পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন হ'ল।

যে ছ'টি তাম্রশাসন এ বিষয়ে পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমিত হয়—গুপ্ত-বংশীয় বৈন্যগুপ্তের রাজত্বকালের শেষে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গোপচন্দ্র স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যে পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং বিশাল ভূখণ্ড তাঁর অধীনে ছিল—তৎকর্তৃক গৃহীত মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ থেকে তা আভাসিত হয়। তাছাড়া তাঁর জয়রামপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত একখানি গ্রাম তিনি দান করেছিলেন। এতে সপ্রমাণ হয় যে—উড়িষ্যার অন্ততঃ উত্তর ভাগ তাঁর রাজ্যান্তর্গত ছিল।

গোপচন্দ্রের পরে সম্ভবতঃ ধর্মাদিত্য বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হন। গোপচন্দ্রের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক কী তা ঠিক করে বলা কঠিন। কিন্তু ইনিও মহারাজাধিরাজ উপাধিযুক্ত ছিলেন। ধর্মাদিত্যের পরে এই বিশাল রাজ্যের রাজা ছিলেন—সমাচার দেব। এঁর সময় বঙ্গরাজ্য বোধহয়—পশ্চিম দিকে আরো প্রসারিত হয়। সমাচার দেবের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রা এবং নালন্দার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে

প্রাপ্ত তাঁর নামাঙ্কিত শাসনমুদ্রা—তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে ইঙ্গিত তুলে ধরে। কিন্তু আরো তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এই বিশাল বঙ্গ-রাজ্যের বিষয়ে ব্যাপকতর পরিচিতি তুলে ধরা যাচ্ছে না।

উক্ত তিনজন—মহারাজাধিরাজের শাসনকাল ঠিক কতটা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে তা আনুমানিক ৬০ বছর ধরা যেতে পারে। এঁদের শক্তিশালী রাজত্বের অবসানে—বঙ্গভূমি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এই অনুমানের ভিত্তি বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত, একাধিক রাজার নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি। সব রাজার নাম—ক্ষয়িত স্বর্ণমুদ্রাগুলি থেকে পড়া সম্ভব হয়নি। দু'টি নামমাত্র পড়া সম্ভব হয়েছে অবিতর্কিতরূপে। একটি রাজা পৃথুবীর অপরটি শ্রীসুধন্যাদিত্য। নামের আগে সম্রাটসূচক কোন উপাধি না থাকায়—আমরা এদের স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবক্ষয়যুগের রাজা বলে গণ্য করতে পারি। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের স্বাধীন রাজতন্ত্রের এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে উত্তরবঙ্গের গৌড়ভূমিতে প্রতাপশালী রাজতন্ত্রের পত্তন হয় এবং সে রাজতন্ত্র সমগ্র বঙ্গ ও বাংলার বাইরেও রাজ্যবিস্তার করে এক শক্তিশালী বঙ্গীয় সাম্রাজ্যের জন্ম দেয়।

## ২. স্বাধীন গৌড়-রাজ্যের উদ্ভব কাহিনী

গুপ্তসম্রাটদের প্রতাপের যুগ শেষ হলেও, উত্তরকালের গুপ্তদের শিথিল শাসনের সুযোগে—প্রাচীন গৌড়-নগরীর ঐতিহ্যময় মঞ্চে একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠতে থাকে। নামে গুপ্তরাজাদের অধীন বলে গণ্য হলেও—ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই গৌড় সম্ভবতঃ একটি সামন্ত-রাজ্যীয় শাসন-পদ্ধতির আওতায় আসে এবং এর নিজস্ব সমর-বাহিনীও গড়ে ওঠে। মৌখরিবংশের পরাক্রান্ত রাজা ঈশানবর্মা যখন গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করেন—তখন মগধের সিংহাসন অধিকার করেই কার্য সমাধা করতে পারেননি, গৌড়ের সঙ্গে তাঁকে আলাদাভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ঈশানবর্মার একখানি শিলালিপিতে দাবী করা হয়েছে যে, তিনি গৌড়গণকে পরাজিত করেন এবং তাদেরকে সমুদ্র পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। এতে মনে করা যায় যে, গৌড়ের পরাজিত সেনাপতি ও সৈন্যগণ বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত পশ্চাদপসারণ করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হন এবং এই পর্যন্ত তাদেরই রাজ্যান্তর্গত ছিল; এবং এতে আরো প্রমাণিত হয় যে,

নৌবাহিনীর দৌর্বল্য হেতু মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা গৌড়ীয়গণকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে ব্যর্থ হন। ঈশানবর্মার প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে গৌড়ের পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তারের সপ্রমাণ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার 'দুবি' তাম্রশাসনে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে যে, গৌড়ের সৈন্যদল ঐ রাজ্য আক্রমণ করে এবং রাজা সুস্থিতবর্মণের দুই পুত্র প্রবল বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও অন্তিমে পরাজিত ও বন্দী হন। গৌড়ের এই যুদ্ধ সম্ভবতঃ গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের সামন্ত-রাজ্য হিসেবে এবং এ বিজয় তাই মহাসেন গুপ্তের বিজয়। আদিত্যসেনের অফসরলিপিতে বলা হয়েছে—মহাসেন গুপ্ত ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। দু'টি পুরাতাত্ত্বিক দলিল একই ঘটনার বর্ণনা করেছে বলে অনুমিত। কারণ সুস্থিতবর্মার আমলে দু' দু'বার বহিরাক্রমণের কোনো তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। এতএব দেখা যাচ্ছে—নামে গুপ্তদের সামন্ত হলেও—গৌড় কার্যতঃ পরাক্রান্ত সামন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মহাসেন গুপ্তের রাজত্বকালেই, অর্থাৎ ৫৯৫ খৃষ্টাব্দের আগে।

## ৩. গৌড়রাজ শশাঙ্ক-দেব

প্রায় নয় শত বছর আগে পুণ্ড্রবর্ধনবাসী উগ্রসেন গৌড়-রাঢ় অঞ্চলের বঙ্গ-সন্তানদের নিয়ে এবং মগধীয় প্রজাদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে উত্তর ভারতে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। নয় শত বছর পরে ইতিহাসের আংশিক পুনরাবৃত্তি হলো গৌড়রাজ শশাঙ্কের মাধ্যমে। কিন্তু উগ্রসেন সমকালীন ও পরবর্তী লেখকগণের লেখনীতে মর্যাদার আসন পাননি; শশাঙ্কও তেমনি সমকালীন লেখকদের হাতে শুধু কালিমালিপ্তই হয়েছেন। কিন্তু তথ্যের অভ্রান্ত ইঙ্গিতে—বহুকাল পরে ধীরে ধীরে শশাঙ্কের কৃতিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়ে চলেছে।

## ৪. শশাঙ্কের বংশ পরিচয়

শশাঙ্কও নন্দবংশীয় রাজাদের মত ঐতিহ্যময় রাজবংশের সন্তান ছিলেন না এবং নন্দদের মতই—সাধারণ ভারতীয় রাজবংশের নকলে চন্দ্র বা সূর্যবংশীয় বলে আত্মমর্যাদা বাড়াবার কৌশল গ্রহণ করেননি। প্রাচীন রোহিতাশ্বের ,

গিরিগাত্রে খোদিত "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" এই নামটি থেকে আভাসিত হয় যে, শশাঙ্ক প্রথম জীবনে মহাসামন্ত ছিলেন এবং যখন তাঁর নাম রোটাসগড় পর্যন্ত বিস্তৃতির কারণ ঘটেছিল, তখনও তিনি মহারাজ বা সম্রাট উপাধির লোভ ত্যাগ করেছিলেন।

## ৫. শশাঙ্কের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা

যাই হোক—প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণে এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যে, তিনি গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের অধীনে গৌড়ের মহাসামন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং মহাসেন গুপ্তের নির্দেশে তিনি গৌড়-সামন্তরাজ্যের সৈন্যসহ কামরূপ আক্রমণ করে সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধন এবং ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ কিছু রাজ্য গুপ্ত অধিকারে নিয়ে আসেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে পরবর্তী বর্মণ-রাজ ভাস্কর বর্মার সীমাহীন আক্রোশের মূলেও শশাঙ্ক-কর্তৃক কামরূপ জয় ও রাজপুত্রগণকে বন্দী করার অপমান ও ক্ষোভ যুক্তিপূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। যাই হোক এই বিজয়াভিযানের ফলে গুপ্তরাজ্যের পূর্বভাগে শশাঙ্কের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

## ৬. শশাঙ্কের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের হেতু ও পটভূমি

এই সময় ভারতবর্ষে গুপ্তসম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনের এলাকা কমে গিয়েছিল এবং তাদের প্রভাবাধীন এলাকায় অনুগত সামন্তরাজগণ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই সব নামমাত্র অধীনত বা অনুগত রাজন্য হলেন—সৌরাষ্ট্রে মৈত্রকবংশীয় ধ্রুব সেন, মান্দাশোরে বিষ্ণুবর্ধন, পশ্চিম মালবে হর্ষগুপ্তের পুত্র জীবিতগুপ্ত, কান্যকুব্জে মৌখরি-রাজ ঈশানবর্মা, স্থানীশ্বরে আদিত্যবর্দ্ধন, সমতট ও বর্দ্ধমান ভুক্তিতে গোপচন্দ্র ও তাঁর উত্তরসূরীগণ। কিন্তু গুপ্তসাম্রাজ্যের ক্রমিক অবনতির সুযোগে এঁরাও ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন। এর মধ্যে মান্দাশোরের বিষ্ণুবর্দ্ধন আকস্মিক সামরিক-বিপ্লব ঘটিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত আপন করতলগত করলেও —সে ক্ষমতা স্থায়ী হয়নি। মহাসেন গুপ্তের সময় পর্যন্ত সামন্তরাজ্যগুলি নামতঃ অধীনতা ও আনুগত্য প্রকাশ করলেও—তারা প্রত্যেকেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য

আপন করতলগত করবার উদ্যোগে ছিলেন। কান্যকুব্জের ঈশানবর্মা সেই কার্যে আংশিক সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। কলচুরিরাজ শঙ্করগণ কর্তৃক মালব আক্রান্ত হয় এবং তারা পশ্চিম মালব দখল করে; অতঃপর গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করে গুপ্তরাজধানী উজ্জয়িনী দখল করে। গুপ্তরাজের এই আকস্মিক নিধনে, তাঁর নাবালক পুত্রদ্বয়—কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত—স্থানীশ্বর-রাজের আশ্রিত হয়। স্থানীশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধন ছিলেন কুমারগুপ্ত ও মাধব-গুপ্তের পিসতুতো দাদা [প্রভাকরবর্ধনের পিতা আদিত্যবর্ধন হতভাগ্য পুত্রদ্বয়ের জনক মহাসেনগুপ্তের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন]। কিন্তু প্রভাকর-বর্ধন—এই নাবালক সম্রাট-পুত্রদ্বয়কে সাম্রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য তো করলেনই না, বরঞ্চ আপন পুত্রদ্বয়ের অনুচররূপে নিয়োজিত করেন [হর্ষচরিত দ্রষ্টব্য]। মহাসেনগুপ্তের বিশ্বস্ত সামন্ত শশাঙ্ক কেন প্রভাকরবর্ধন ও তাঁর পুত্রদের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জা করেন—তার ইঙ্গিত এখানে লুকিয়ে আছে।

যাই হোক, গুপ্ত-সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায়—পূর্বে উল্লিখিত অধীনতঃ সামন্তরাজগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যকে চারিদিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ব ভারতে গুপ্তদের সাম্রাজ্যের যে অংশটুকু ছিল তা গ্রাস করতে উদ্যত হলেন—তিনজন; পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের রাজা সমাচারদেব বা তাঁর বংশধরগণ, কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ এবং পশ্চিমে স্থানীশ্বররাজ প্রভাকর বর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন। পূর্বভারতে গুপ্তদের একমাত্র যোগ্য ও বিশ্বস্ত কর্মচারী মহাসামন্ত শশাঙ্কের উপর আপতিত হ'লো এই ত্রিকোণিক সামরিক চাপ। কিন্তু রাজনীতি ও সমরনীতিতে দক্ষ শশাঙ্ক এই ত্রিকোণিক বিপদকে যোগ্যভাবে সামাল দিয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষাই শুধু করলেন না—পূর্ব ভারতে এক ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন।

## ৭. শশাঙ্কের রাজ্যবিজয়

গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত, অতএব স্বভাবতঃই নৌবলে বলীয়ান শশাঙ্ক, প্রথমেই পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ সমাচারদেবকে পরাস্ত করে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে আপন রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তবে তিনি

যে সমাচারদেবের রাজ্য একবারেই দখল করতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না।' কারণ সমাচারদেবের পরেও রাজা উপাধিধারী একাধিক বঙ্গরাজার স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ প্রান্তিক পূর্ববঙ্গে এঁরা আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিলেন এবং শশাঙ্কের রাজত্বের মধ্যমভাগের কোন এক সময় এই অবশিষ্ট বঙ্গরাজ্য অবলুপ্ত হয় এবং শশাঙ্কের শাসনাধীনে আসে। সমাচারদেবকে প্রথমেই আক্রমণ করার কারণ এটা হতে পারে যে, তিনি পশ্চিম ভারতের রাজন্যবর্গের সঙ্গে সামরিক আঁতাতভুক্ত ছিলেন না এবং তাঁকে পরাভূত করে শশাঙ্কের রাজ্যবৃদ্ধি, সম্পদবৃদ্ধি ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল পশ্চিমের ও উত্তরের প্রস্তুতশীল আসন্ন ঝড়ের মোকাবিলা করার ক্ষমতা অর্জনের জন্যই।

স্থানীশ্বর রাজ নিশ্চয়ই শশাঙ্কের এই শক্তিবৃদ্ধিকে ভালো চোখে দেখেন নি, এবং হৃতরাজ্য ও হৃত-সম্মান কামরূপরাজও পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একাকী শশাঙ্ককে আক্রমণ করতে সাহসী ছিল না। অনিবার্য কারণেই স্থানীশ্বররাজ ও কামরূপ-রাজের মধ্যে সামরিক আঁতাত তৈরী হলো এবং তাঁরা একযোগে গৌড় আক্রমণে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

## ৮. মগধ, মিথিলা, বরেন্দ্র, কলিঙ্গ ও বারাণসী অধিকার

ইতিমধ্যে শশাঙ্ক দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হয়ে গুপ্তদের অরক্ষিত রাজ্য মগধভুক্তির অন্তর্গত ভূখণ্ড নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন। মহাসেনগুপ্তের সময়ে মগধভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল মগধ-মিথিলা-বরেন্দ্র ও কলিঙ্গ এবং যুবাবয়সে মহাসেনগুপ্ত এর উপরিক ( বা গভর্ণরও ) নিযুক্ত ছিলেন ; তাঁর পিতা দামোদর-গুপ্তের রাজত্বকালে। যাই হোক গুপ্তসম্রাটের পতনের ফলে—অরক্ষিত এই বিশাল সাম্রাজ্য স্বভাবতঃই আত্মাধিকারে আনতে শশাঙ্কের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তিনি এতেই সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিদিগকে দমন করতে কৃতসংকল্প হলেন। সম্ভবতঃ মৌখরিরাজ ঈশান-বর্মার গৌড় আক্রমণ এবং গৌড়বাসীগণের পরাজয় ও লাঞ্ছনার অপমান তখনো শশাঙ্কের চিত্তে জাগরূক ছিল।

## ৯. সামরিক আঁতাত ও কান্যকুব্জ অভিযান

এই সময়ে মৌখরিরাজ ছিলেন গ্রহবর্মা, তাঁর রাজধানী ছিল কান্যকুব্জে এবং তিনি স্থানীশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহসূত্রে উক্ত রাজ্যের সামরিক সহযোগিতার আশ্রয়ে বলশালী হয়ে ওঠেন। এই দুই শক্তির একযোগে মোকাবিলা করতে শশাঙ্ককেও বেছে নিতে হয় মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে সামরিক আঁতাত। শশাঙ্ক ও দেবগুপ্তের এই যৌথ আঁতাত বিরোধী পক্ষকে কালমাত্র প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে আক্রমণে উদ্যত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে এই আক্রমণ পরিচালিত হয়। শশাঙ্ক প্রথমে বারাণসী অধিকার করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং দেবগুপ্তও মালব থেকে সসৈন্যে কান্যকুব্জ যাত্রা করেন। সমসাময়িক রচনা বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' এই যুদ্ধের ও পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার পক্ষে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বহুখ্যাত এই ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ ঃ—

মালবরাজ দেবগুপ্তের আক্রমণে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হন। রানী রাজ্যশ্রী বন্দিনী অবস্থায় বিজয়ী সৈন্যসহ মালবের পথে প্রেরিত হন। বিজিত কান্যকুব্জের দখল রাখতে কিছু সৈন্য রেখে অবশিষ্ট সৈন্যসহ দেবগুপ্ত শশাঙ্কের আগমনের অপেক্ষা না করেই একাকী স্থানীশ্বর আক্রমণে রওনা হন। ইতিমধ্যে প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন স্থানীশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেই ভগ্নী ও ভগ্নীপতির ভাগ্যবিপর্যয়ের খবর জানতে পেরে—রাজ্যভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর ফেলে নিজেই দশ হাজার সৈন্যসহ ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করতে ছুটে যান। পথে স্বল্পসৈন্যসহ আগত মালবরাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মালবরাজ পরাজিত ও নিহত হন। এদিকে শশাঙ্ক কান্যকুব্জে পৌঁছে খবর পান যে, দেবগুপ্ত একাকী স্থানীশ্বর আক্রমণে অগ্রসর হয়েছেন। অতএব—তাঁর সাহায্যার্থে শশাঙ্ক আবার স্থানীশ্বরের দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু তিনি মালবরাজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগেই মালবরাজ রাজ্যবর্ধনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। বিজয়ী রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে পথে শশাঙ্কের সাক্ষাৎ হয় এবং যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন পরাস্ত ও নিহত হন। পরাজিত স্থানীশ্বররাজের কলঙ্ক অপনয়নে সভাকবি বাণভট্ট যে শত্রুশিবিরে আমন্ত্রিত রাজ্যবর্ধনের নিরস্ত্র হত্যার কাহিনী প্রচারিত করেছিলেন ঐতিহাসিকদের যুক্তিপূর্ণ তথ্যবিশ্লেষণে সেই কাহিনী অধুনা পরিত্যক্ত হয়েছে।

## ১০. শশাঙ্কের অগ্রসরমান বাহিনীর সঙ্গে হর্ষের সংঘর্ষ

বাণভট্টের কাহিনীতে জানা যায়—রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুতে উত্তেজিত হর্ষবর্ধন নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবী গৌড়শূন্য না করতে পারলে—অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিপুল সমরসজ্জা করেন এবং স্বয়ং স্বসৈন্যে অগ্রসর হতে থাকেন। পথিমধ্যে খবর এলো যে, রাজ্যশ্রী কারাগার হতে পালিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে আত্মগোপন করেছেন। তখন হর্ষবর্ধন সেনাপতি ভণ্ডীকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়ে নিজে ভগ্নীকে উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। বিন্ধ্যপর্বতের জঙ্গল থেকে ভগ্নীকে উদ্ধার করে হর্ষবর্ধন গঙ্গাতীরে নিজ সৈন্যসহ মিলিত হন। এখানেই বাণভট্টের হর্ষচরিত শেষ। কিন্তু এই বিপুল সামরিক উদ্যোগ, এই আস্ফালন, হর্ষবর্ধনের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার ফল কী হ'লো—তা বাণভট্ট উল্লেখ করলেন না। তবে কি সেটা এমন কিছু—যা সভাকবির পক্ষে উল্লেখ করা কঠিন ছিল?

## ১১. হর্ষ-শশাঙ্ক যুদ্ধের ফলাফল

হর্ষবর্ধন তাঁর কোনো অনুশাসন-লিপিতে বা তাঁর চৈনিক-বন্ধু হিউয়েন সাঙও তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ রেখে যাননি। বহু পরবর্তী-কালে 'আর্যমঞ্জুশ্রী মূল কল্পে' এ বিষয়ে কিছু তথ্য পরিবেশন করলেও—অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে হর্ষবর্ধন-শশাঙ্কের যুদ্ধের ফল বর্ণিত হয়নি, এমন কি কোন যুদ্ধ আদৌ হয়েছিল কিনা তাও জানা যায় না। সুদীর্ঘ গঙ্গার কোন স্থলে তীরভূমিতে হর্ষবর্ধনের সৈন্য সমাবেশ ঘটেছিল—তারও কোনো উল্লেখ নেই। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে যে রাজার বিবরণ আছে তার নাম 'সোম'; তাকে যদি শশাঙ্ক ধরা হয় এবং সেখানে ভবিষ্যৎবাণীতে কথিত 'হকারাদ্য' রাজা বলতে যদি হর্ষবর্ধন ধরে নেওয়া যায়—তবে বলতে হবে, হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থেই রয়েছে যে—হ-কারাদ্য রাজা (হর্ষবর্ধন) সোম রাজার বর্বর দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পেয়ে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। এতে হর্ষবর্ধনের পরাজয় ও পলায়নই দ্যোতিত হয়। যাই হোক—যুদ্ধ হোক আর না হোক—হর্ষবর্ধনের বৈরিতায় শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়েছিল তা মনে করা যায় না। শশাঙ্কের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে একখানির তারিখ ৬১৯ অব্দ। তাছাড়া Walters-এর লিখিত On

Yuan Change's Travels in India, Vol-II, পৃ, ১১৫ ও ৩৩৫ থেকে জানা যায় যে, হিউয়েন্থ্‌ সাং ৬৩৭-৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বোধগয়া পরিদর্শন করেন এবং লিখেছেন যে—তার অনতিকাল পূর্বে শশাঙ্কের আদেশে সেখানকার বোধিবৃক্ষ ছেদিত হয়েছে।

## ১২. হর্ষবর্ধনের জীবৎকাল ও সাম্রাজ্যের সীমানা

অতএব শশাঙ্ক কমপক্ষে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ বা তার অনতিকাল পূর্বেও শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং অন্য কোন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত অন্ততঃ এটুকু দাবী করা যায় যে—মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি উৎকল ও কোদঙ্গের অধিপতি ছিলেন। [ বিশদ আলোচনা সপ্তম অধ্যায়ে ]

# খ. পুণ্ড্রবর্ধন

## ১. পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির ভাগ্য-নির্ণয়

কিছু কিছু অহমিয়া লেখক মনে করেন—মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর ফলে অথবা অন্ততঃপক্ষে হর্ষবর্ধন এবং ভাস্কববর্মার যৌথ আক্রমণের ফলে—পুণ্ড্রবর্ধন আবাব কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দাবী কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

আমরা পূর্বেই দেখতে পেয়েছি—মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একান্ত দ্রুতগতিতে শশাঙ্ক পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ এবং সেইসঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মগধ-মিথিলা-ওড়িষ্যা দখল করে নেন। বরেন্দ্রভূমি আগেই গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের এইরূপ শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত ভাস্করবর্মা, বহুমূল্য উপঢৌকনসহ হংসবেগনামক দূত-মারফত হর্ষের নিকট সাময়িক আঁতাতের প্রস্তাব পাঠান। ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাসেনগুপ্ত রাজ্যচ্যুত হন এবং আ. ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার প্রথম যৌথ আক্রমণ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। যদিও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের আগে ভাস্করবর্মা পুণ্ড্রবর্ধন দখল করতে পারেন নি। উদীয়মান শক্তি শশাঙ্কের সঙ্গে একক-যুদ্ধের সামর্থ্য ভাস্করবর্মার ছিল না এবং দ্বিতীয় অভিযানেও ভাস্করবর্মা হর্ষের সঙ্গে যুগ্ম অভিযান চালান ও গৌড়সহ পুণ্ড্রবর্ধন দখল করেন।

## ২. নিধনপুর তাম্রলিপির ব্যাখ্যা

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার যৌথ আক্রমণের ফলে—হর্ষবর্ধন, যিনি মূলশক্তি, বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেনি বলেই স্থিরীকৃত হয়েছে। অথচ এদিকে নিধনপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যাচ্ছে—ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ বিজয় করে সেখানকার বিজয়-শিবির থেকেই ভূমিদান করতে শুরু করেন। যুদ্ধের শিবিরে বসে তড়িঘড়ি ভূমিদান করতে হলো কেন সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে শশাঙ্কের রাজধানী পর্যন্ত ভাস্করবর্মা অগ্রসর হলেন—কিন্তু গৌড়ের সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর কোন বড় বা ছোট যুদ্ধের উল্লেখ নেই। রায়বাহাদুর কে. এল. বড়ুয়া অনুমান করেছেন ( Early History of Kamrupa ) যে, ভাস্করবর্মা ও হর্ষবর্ধনের যৌথ আক্রমণের খবরে শশাঙ্ক সম্ভবতঃ ওড়িষ্যার দিকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন এবং এই সুযোগে ভাস্করবর্মা সমুদ্র পর্যন্ত বঙ্গভূমি দখল করেছিলেন, অর্থাৎ সমগ্র গৌড়বঙ্গ তাঁর দখলে আসে এবং মগধ অঞ্চল হর্ষবর্ধন দখল করেন। এই অনুমানের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে ; যথা ঃ—

(১) যে শশাঙ্ক সসৈন্যে কান্যকুব্জ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে স্থানীশ্বরে ধেয়ে গেছেন—যথাক্রমে মৌখরিরাজাকে এবং বর্ধনদের বিনষ্ট করতে—তাঁর পক্ষে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার আগমন সংবাদমাত্র পলায়ন করা কষ্ট-কল্পিত।

(২) হর্ষবর্ধনকে গৌড়ে এসে শশাঙ্ককে আক্রমণ করতে হয়নি—শশাঙ্কের সহিত অবশ্যই তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন—বারানসীর উত্তরে গঙ্গার কোন তীর-ভূমিতে। কারণ শশাঙ্ক কান্যকুব্জ থেকে ফিরে স্থানীশ্বর আক্রমণের পথেই অগ্রসর হচ্ছিলেন, যখন প্রথমে রাজ্যবর্ধন এবং হর্ষবর্ধনের তিনি সম্মুখ হন।

(৩) শশাঙ্ককে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করতে পারলে—যে কাহিনী হর্ষবর্ধন ও তাঁর সমসাময়িক লেখক ও পরিব্রাজক বন্ধুরা কীর্তিত করে যেতেন।

(৪) শশাঙ্ক কোন যুদ্ধ-বিশেষে পরাজিত হ'লে, যখন তিনি আরো বহু বর্ষ রাজত্ব করেছিলেন, হৃত সম্মান ও হৃত রাজ্য উদ্ধারে নতুন করে উদ্যোগবান হতেন। কিন্তু তেমন কোন ঘটনারও আর কোনো বিবরণ জানা যায় না।

(৫) সমগ্র বঙ্গভূমিতে ভাস্করবর্মার রাজ্য বিস্তৃত হলে—কামরূপের শাসকীয় অনেক নিদর্শনই হয়তো বিরাট বঙ্গভূমিই কোথাও না কোথায়ও পাওয়া যেতো—যথা—ভাস্করবর্মার মুদ্রা, অনুশাসনপত্র, শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রত্নতাত্ত্বিক

নিদর্শন প্রভৃতি। কিন্তু তার কিছুমাত্র পাওয়া যায়নি। হর্ষের তো তেমন কোন নির্দশন বঙ্গভূমিতে পাওয়া যায়নি।

## ৩. শশাঙ্কের মৃত্যুতে হর্ষ ও ভাস্করবর্মার দ্বিতীয় অভিযান

এই সব অসঙ্গতি এখন বিদূরিত হয়েছে হিউয়েন্‌থ্‌ সাঙের জীবন-চরিত পাঠে। সেখান থেকে জানা যায়—হর্ষ ও ভাস্করবর্মা আসলে ৬৪১ থেকে ৬৪৩-র মধ্যে (অর্থাৎ শশাঙ্ক ও তৎপুত্র মানবের মৃত্যুর পরে) দ্বিতীয় প্রয়াসের দ্বারা শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধীরে ধীরে জয় করে নেন। এটা জানা গেছে যে—হর্ষবর্ধন ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মগধ, ৬৪২ খৃষ্টাব্দে উৎকল ও কোঙ্গদ জয় করেন এবং আনুমানিক, ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে গৌড় জয় করেন। ভাস্করবর্মা গৌড়াক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। [ বিশদ বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ]।

এই তথ্যপঞ্জী থেকে নির্ধনপুর তাম্রশাসনের ঘোষণারও যেমন সঙ্গতি পাওয়া যায় তেমনি—বাণভট্টের রচনায় গৌড়-জয়ের উল্লেখ না থাকার কারণ বোঝা যাবে। এতে শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনা ছাড়া গৌড়জয়ের রহস্য পরিষ্কার হবে। এবং এ থেকে শশাঙ্কের পুনরাভিযানে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টার অভাবের মানে বোঝা যাবে।

## ৪. পুণ্ড্রবর্ধনের অবলুপ্তি ও উত্তরবঙ্গের দ্বিকেন্দ্রিক শাসনের শুরু

যাই হোক—শশাঙ্কের জীবৎকালে না হলেও ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপের শাসনে এসেছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিব্বতরাজের আক্রমণে কামরূপসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান তিব্বতের অধীন হয়। সেই সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনও কামরূপের শাসন থেকে ছিন্ন হয়। কিন্তু ৬৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ জয়নাগ নামে এক রাজা উত্তরবঙ্গ ও গৌড়ে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্র স্থাপিত করে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ পুণ্ড্রবর্ধনও এর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পুণ্ড্রবর্ধন কামরূপ বা গৌড় যার অধীনেই থাক—তার স্বাধীন রাজনৈতিক অস্তিত্ব এর পরে প্রায় স্থায়ীভাবে অবসিত হ'ল; এবং সেইজন্য আগামী বহুকাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ত্রিকৌণিকের পরিবর্তে দ্বিকেন্দ্রিক শাসনের মধ্যে চলে আসে—যার এক কেন্দ্র গৌড় অন্য কেন্দ্র কামরূপ।

## গ. কামরূপ ঃ বর্মণরাজবংশের বিলোপ

### ১. ভাস্করবর্মার রাজত্বকাল

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ৫৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে শশাঙ্ক, যিনি গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাটের মহাসামন্ত, কামরূপ আক্রমণ করে পুণ্ড্রবর্ধন ও ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বহুল রাজ্যাংশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরাজিত রাজা সুস্থিত-বর্মার আমলে কামরূপের এই অপমান ও দুর্দশার প্রতিকার হয় না। সে দায়িত্ব নিয়ে আনুমানিক ৫৯৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে—সুস্থিতবর্মার জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মা রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এবং সন্তানাদি না থাকায়—সম্ভবতঃ ৬০২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ভাস্করবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভাস্করবর্মা বর্মণবংশের সর্বাধিক খ্যাতনামা রাজা। উত্তরভারতের রাজ-নীতির উত্থান-পতনের সঙ্গে তিনি বহুলাংশে জড়িত থাকেন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সাময়িক আঁতাত ও বন্ধুত্ব রক্ষা করে তিনি পিতাকর্তৃক হৃতরাজ্য পুণ্ড্রবর্ধন পুনরুদ্ধারে ব্রতী হন এবং ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়ে শশাঙ্ককে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সম্ভবতঃ বিশেষ কোনো ফল লাভ হয় না। অতএব শশাঙ্ক ও তৎপুত্র মানবের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদপূর্ণ গৌড়সাম্রাজ্য ৬৪২।৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পুনরাক্রমণ করেন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে একযোগে—এবং পুণ্ড্রবর্ধন ও গৌড়সহ পূর্ব ভাগ তিনি দখল করেন। মগধসহ পশ্চিমাংশ হর্ষবর্ধনের করতলগত হয়।

৬৪৬।৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে—হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। হর্ষবর্ধনের সম্ভবতঃ কোনো পুত্র ছিল না, ছিল একটিমাত্র কন্যা—যার বিয়ে হয়েছিল বলভিরাজ ধ্রুবভট্টের সঙ্গে। হর্ষের মৃত্যুতে এই ধ্রুবভট্টের পুত্র চতুর্থ ধরাসেন মাতুলের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দাবী করে এবং সরাসরি নিজেকে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর চক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু কনৌজের সিংহাসন দখলের আগেই হর্ষের সেনাপতি ও অমাত্য অর্জুন বা অরুণাশ্ব গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল দখল করে নেন। এই সময় হর্ষের দরবারের উদ্দেশ্যে চীনসম্রাট-প্রেরিত চৈনিক পরিব্রাজকদলের নেতা ওয়াং-হিউয়েন-সী-র সঙ্গে অর্জুনের সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে তিব্বত ও নেপালের বৌদ্ধরাজারা তো সামরিক সাহায্য দেন-ই, তৎসঙ্গে কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মাও সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তিনি ওয়াং-হিউয়েন-সী-র সৈন্যদের সম্পূর্ণ রসদ

এবং তা পরিবহনের জন্য ত্রিশ হাজার ঘোড়া ও বলদ এবং তৎসহ ধনুর্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র ও মূল্যবান সামগ্রী পাঠান। [ Indian Antiquary, Vol XI, p-14 ], এই সব সহায়তা নিয়ে চৈনিক দল—অর্জুনকে পরাস্ত করে—তাঁকে বন্দী অবস্থায় চীন-দরবারে প্রেরণ করেন।

পূর্বভারতের অনেক রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অনেক ঘটনা-বহুল জীবন নিয়ে, প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করে আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্মা দেহত্যাগ করেন। ভাস্করবর্মা চৈনিক গ্রন্থাদিতে ও সমসাময়িক বচনায় 'কুমার-রাজা' বলে অভিহিত হয়েছেন, তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও কাউকে পাওয়া যায় না। এ কারণে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন। সে যাই হোক—উত্তরসূরীহীন ভাস্কর-বর্মণের মৃত্যুতে বর্মণরাজবংশের অবসান ঘটে এবং 'শালস্তম্ভ' নামক এক ব্যক্তি কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করে নতুন রাজবংশের পত্তন করেন।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( ষষ্ঠ অধ্যায় ) :—

1. গৌড়-লেখ-মালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
2. গৌড়রাজমালা—রামপ্রসাদ চন্দ
3. বাংলাদেশের ইতিহাস—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
4. বাঙ্গলার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
5. Harsha Charita—Bana Bhatta ( Cowell's Numlation )
6, Raja Tarangini—Kalhana
7. Political History of Ancient India— H. C. Roy Choudhury
8. Early History of Bengal—G. M. Sarkar
9. Early History of Kumrup—K. L. Barua
10. Kumrupa Sasanavali—Padma Nath Bhattacharya
11. Gazetteer of Bengal and North East India— Allen, Gait and Howard

## সপ্তম অধ্যায়

# শশাঙ্কোত্তর শতবর্ষ ও উত্তরবঙ্গ

( আ. ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে আ. ৭৫০ খৃষ্টাব্দ )

## ক. গৌড়ভূমি

### ১. অন্ধকার যুগ ও মাৎস্যন্যায়ের অভিযোগ খণ্ডন

শশাঙ্কের মৃত্যুতে বঙ্গভূমি এক বিশাল রাজনৈতিক শক্তির ছত্রছায়াশূন্য হয়ে পড়ে এবং একাধিক স্থানীয় শাসনে বিভক্ত হয়ে যায়। স্থানীয় রাজতন্ত্র ও তাদের কীর্তিকলাপগুলিরও ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাই এই সময়টাকে বাংলার 'অন্ধকার যুগ', 'অরাজক' ও 'মাৎস্যন্যায়ের যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঐ সব বিশেষণ প্রয়োগে—বাংলার ইতিহাসের যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে—তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে।

শশাঙ্কের মৃত্যুতে বাঙালীর জীবনে বৃহৎ সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিন অবসিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার জীবনে বিশেষভাবে অন্ধকার নেমে এসেছিল—এ অনুমানের ভিত্তি কোথায়। বাঙালীর সাম্রাজ্য সব সময় ছিল—তবে কি সে সময়টিকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করতে হবে? 'অরাজক' শব্দের মানে কী? অরাজক বলতে, হয় রাজার অভাব বা রাজশক্তির অনুপস্থিতিকে বোঝায়। নতুবা রাঢ়ি প্রয়োগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাহীন সমাজ-ব্যবস্থা বোঝায়। এমন অবস্থা পূর্ব-দক্ষিণ-উত্তর ও পশ্চিমের বিশাল বঙ্গভূমিতে এত দীর্ঘকাল ধরে চালু থাকতেই পারে না। এত বড় ভূখণ্ড এক শতাব্দী ধরে রাজা-হীনও থাকতে পারে না—বা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন স্বেচ্ছাচারিতাতেই টিকে থাকতে পারে না। 'মাৎস্যন্যায়ে'র দর্শনটি কী? না, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে এবং উদরস্থ করে। রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই-ই তো নিয়ম—এবং সর্বকালে সর্বদেশে ইতিহাসের ঘটনাবলীই তাই। মুসলিম যুগের বঙ্গের যে সময়টাকে 'স্বাধীন সুলতানদের আমল' বলি, তখন যে ভাবে দিল্লীর সুলতানগণ বারে বারে বঙ্গকে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও দখল

করেছেন, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেভাবে দ্রুত পটপরিবর্তনে একের পর এক রাজবংশ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়ে অন্য রাজবংশ ক্ষমতায় এসেছে—এবং প্রত্যেক সুলতানের গড় স্থায়িত্বকাল যখন চার বছরে নেমে এসেছিল—তখন একে মাৎস্যন্যায় বলি না কেন? 'মাৎস্যন্যায়' কি তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরন্তর লড়াই। তা যদি হয়—তবে রাজপুতানার রাণাদের আভ্যন্তরীণ কলহের যুগযুগান্তের ইতিহাস—মাৎস্যন্যায়ের ইতিহাস হবে কী?

আসলে—শশাঙ্কোত্তর বঙ্গে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা থাকলেও রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়নি; এবং সেই অর্থে 'অরাজক' অবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই শতবর্ষের বঙ্গে যে সব স্থানীয় রাজা ছিলেন—তাঁদের ধারাবাহিক পরিচিতি আমাদের হাতে পৌঁছয়নি, তাই একে আমরা 'অন্ধকার যুগ' বলে থাকি—এবং অন্ধকার বলেই অরাজক এবং মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলে সহজে অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন—ঐতিহাসিকগণ। কিন্তু তথ্যের অন্ধকার রয়েছে বলে—যুগটি অন্ধকার ও অরাজক ছিল এই অনুমান অসঙ্গত এবং অরাজক না থাকলে—ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের কাহিনীও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। 'মাৎস্যন্যায়ে'র ধারণা সৃষ্টি হয়েছে—মূলতঃ তিব্বতীয় বৌদ্ধলামা তারানাথের উদ্ভট কাহিনী-বর্ণনাতে এবং খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'মাৎস্যন্যায়' শব্দের অস্তিত্বে। তারানাথ তাঁর ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রচিত মগধের ইতিহাসে একথা লিখেছেন—পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কোনো রাজা নেই এবং নিজের কথাই নিজে খণ্ডন করে লিখেছেন—যে সব ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন—তাঁদের মধ্যে ক্রমিক পর্যায়ে একজন নির্বাচিত রাজা কিছুদিন যাবৎ ক্ষমতায় থাকতেন—এবং প্রতি রাত্রে অন্য রাজ্যের একজন করে নির্বাচিত রানীর সঙ্গে সহবাস করতেন। এসব উদ্ভট কাহিনী অবিশ্বাস্য ও পরিত্যজ্য। আর খালিমপুর তাম্রশাসনে—অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী ব্যাখ্যায় জানা যায়—সমকালীন মাৎস্যন্যায় থেকে দেশকে রক্ষা করতে 'গোপাল' রাজারূপে নির্বাচিত হন। এই তাম্রশাসন থেকে গোপালের তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী সময়ে মাৎস্যন্যায়ের ইঙ্গিত মিললেও—বিগত শতবর্ষ যাবৎ এই 'মাৎস্যন্যায়' প্রচলিত ছিল—এরূপ ঢালাও সিদ্ধান্ত করার যুক্তি নেই। আর বাংলার অবস্থা যাই হোক—অধিকাংশ উত্তরবঙ্গে যে তখন অরাজক অবস্থা বা অন্ধকার যুগ ছিল না—তার নিশ্চিত প্রমাণ—এযুগে বঙ্গের এই অংশে ধারাবাহিক রাজতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

## ২. শশাঙ্কোত্তর গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধন

শশাঙ্কোত্তর গৌড় ও পুণ্ড্রবর্ধনের শতবর্ষব্যাপী ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারাবাহিকতা না পাওয়া গেলেও—কিছু কিছু রাজন্যের সন্ধান ও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—যা থেকে প্রমাণিত হয়—সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হলেও স্থানীয় রাজতন্ত্রের শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটেনি এবং হয়তো পরবর্তী গবেষণায় সূত্রগুলির সংযোজনে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্ধকার যুগের অপবাদ দূর হবে।

## ৩. মহারাজ মানবদেব

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানব পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। এরূপ অনুমান করার কারণ নেই যে—শশাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের এই মতের পিছনে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। আর্য মঞ্জুশ্রী মূলে-কল্পের মতে শশাঙ্কের পুত্র মানব মাত্র ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে তৎপরবর্তী কোন রাজার নাম না দিয়ে শুধু জানাচ্ছে এর পরবর্তী রাজাগণ অনেকে আরো কম সময়ের জন্য সিংহাসনে বসেন। এই ঘটনা রাজপরিবারের মধ্যে হিংসা, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তঘাতের পথে নতুন নতুন রাজা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে না। নতুবা এত ঘন ঘন রাজা পরিবর্তিত হতেই পারে না। এবং রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি হতে থাকলে, এই রাজত্ব শশাঙ্কের বংশধরদের মধ্যেই ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই অবস্থা সম্ভবতঃ ৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল, যখন হর্ষ ও ভাস্করবর্মার মিলিত আক্রমণে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়ীয় রাজ্য কিছুদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়।

## ৪. হর্ষের ও ভাস্করবর্মার গৌড় জয়ের সময় নির্ণয়

পূর্বেই বলা হয়েছে—হর্ষ ও ভাস্করবর্মার ৬০৬ খৃষ্টাব্দের মিলিত অভিযানে শশাঙ্কের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। তাই বোধকরি কিছুকাল অপেক্ষা করে বাণভট্ট, যুদ্ধের ফলাফলের অননুকূল তথ্যকে লিখতে না পেরে এবং ভবিষ্যৎ বিজয় সম্ভাবনাকে অনিশ্চিত জেনে যুদ্ধোদ্যোগ বর্ণনাতেই তাঁর কাব্য শেষ করেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পৃথিবী গৌড়শূন্য করতে না পারলে অগ্নিতে আত্মাহুতি

দানের যে প্রতিজ্ঞা হর্ষবর্ধন করেছিলেন তা ভঙ্গের পাপকে স্খালন করতেই কি, বৌদ্ধপণ্ডিতদের বিশেষতঃ চৈনিক বৌদ্ধপণ্ডিত হিউয়েন্‌থ্‌ সাঙের পরামর্শে সর্বস্ব দানপূর্বক জীর্ণ বস্ত্রে বুদ্ধের চরণারতি করতে হয় তাকে [ এলাহাবাদ তীরে প্রয়াগ-বৌদ্ধ-সম্মেলন পঠিতব্য ] ?

সে যাই হোক—হিউয়েন্‌থ্‌ সাঙ-এর জীবন-চরিতে লেখা আছে যে, হর্ষবর্ধন ৬৩২ খৃষ্টাব্দে কোদঙ্গ দখল করেন ( কোদঙ্গ শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল ) এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে কজঙ্গলে শিবির স্থাপন করেছিলেন। পণ্ডিতদের অনুমান ৬৪১ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময় হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং তারপর উৎকল ও কোদঙ্গ অভিযান করেন। আনুমানিক ৬৪২ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের কজঙ্গল রাজ্যে অবস্থানকালে ভাস্করবর্মা বিশ হাজার রণহস্তীসহ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে কজঙ্গলে সাক্ষাৎ করেন। অন্যপথে ভাস্করবর্মার ত্রিশ হাজার রণপোতও কর্ণ-সুবর্ণের পথে অগ্রসর হয়। অতএব ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের কোনো এক সময় ভাস্করবর্মা কর্ণসুবর্ণ দখল করেন এবং নিধনপুর লিপি-কথিত ভূমিদানপত্র প্রদান করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে—হিউয়েন্‌থ্‌ সাঙের জীবন-চরিত পরিবেশিত তথ্য থেকে এতদিনের একটি সন্দেহ দূর হ'লো। শশাঙ্কের রাজ্য ধ্বংসের সময় এবং নিধনপুর লিপির অর্থ এবারে সন্দেহমুক্ত ও অসঙ্গতিমুক্ত হলো। যেহেতু মগধ জয় না করে বঙ্গবিজয় অসম্ভব এবং মগধ ( ৬৩১ ) এবং কজঙ্গল ( ৬৪২ ) দখল করেই হর্ষবর্ধন গৌড়কে আক্রমণ ও ধ্বংস করতে সক্ষম হন। অতএব দেখা যাচ্ছে—শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই কেবল হর্ষ-ভাস্করবর্মার মিলিত সৈন্য গৌড়কে পরাজিত করে এবং এই দু'জনের মধ্যে গৌড়রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলেই ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় শশাঙ্ক-প্রতিষ্ঠিত গৌড়-রাজবংশের অবসান হয়, একথা বলা চলে।

## ৫. গৌড়ের অন্যান্য স্বাধীন রাজাগণ

কিন্তু হর্ষ বা ভাস্করবর্মণের বঙ্গ-দখল এবং বঙ্গ-শাসন একেবারেই স্থায়ী হয়নি। মাত্র ৩।৪ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ৬৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে তিব্বতরাজ কামরূপ ও পূর্ব ভারতের অংশবিশেষ অধিকার করায়—গৌড়ের উপর কামরূপের অধিকার বিলুপ্ত হয়। এটা সম্ভব ৬৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি আনুমানিক ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার

মিলিত আক্রমণে শশাঙ্কের সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হলেও গৌড়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ভাস্করবর্মার শাসনাধীনে আসে। ভাস্করবর্মা সম্ভবতঃ জয়নাগ নামে কোন একজন শাসনকর্তার মারফত গৌড়-শাসন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ৬৪৬ খৃ বা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর অমাত্য ও সেনাপতি অর্জুন বা অরুণাশ্ব হর্ষের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ দখল করেন। এই দখলদার সেনাপতির সঙ্গে চৈনিক-পরিব্রাজক-দলপতি ওয়াং-হিউয়েন-সী যুদ্ধে দ্বিতীয় পক্ষকে রসদ ও পরিবহন দিয়ে সাহায্য করেন—কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা। অরুণাশ্বের বিদ্রোহ ও ক্ষমতা লাভের অস্থিরতার কালে জয়নাগ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন 'গৌড়েশ্বর' রূপে রাজ্য শাসন শুরু করেন। ইতিমধ্যে ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভাস্করবর্মণের মৃত্যু ও তাঁর বংশের শাসন শেষ হওয়ায় জয়নাগের বিপদ কেটে যায়। নতুন কামরূপরাজ, যিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ থেকে হঠাৎ কামরূপ-রাজ্যের অধীশ্বর হন, তিনি নিজ রাজ্যে দখল কায়েম করতেই ব্যস্ত রয়ে যান।

জয়নাগের কয়েকখানি তাম্রশাসন ও অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তা থেকে মনে হয়—তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁর শক্তিশালী রাষ্ট্র হঠাৎই বিলপ্ত হয় এবং এ বিলুপ্তির পিছনে তিব্বতরাজের উত্তরবঙ্গ আসাম ও গৌড় আক্রমণের কাহিনীকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিব্বতের রাজবংশের ইতিবৃত্তে দেখা যায়—আ. ৬৫৩।৬৫৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিব্বত-রাজ 'স্রং-সান্-গাম্পো' নেপাল ও কামরূপ আক্রমণ করে জয়ী হয়েছিলেন এবং সে দেশে অনেক ভূখণ্ড দখল করেছিলেন। সম্ভবতঃ গাম্পোর আসাম অভিযানের পথে গৌড় ও উত্তরবঙ্গ পতিত হওয়ায় জয়নাগের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয়নাগ পরাজিত অথবা দুর্বল হয়ে পড়লে মগধের শাসনকর্তা আদিত্য সেন গৌড় দখল করেন। আদিত্য সেনের পিতা মাধব গুপ্ত হর্ষবর্ধন কর্তৃক মগধের শাসনকার্যে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

আদিত্য সেনের বংশ বহুকাল গৌড়ে রাজত্ব করেছিলেন। আদিত্য সেনের পুত্র দেবগুপ্ত, পৌত্র বিষ্ণুগুপ্ত এবং প্রপৌত্র জীবিতগুপ্তের ( ২য় ) পরিচয় বৈদ্যনাথ মন্দিরে খোদিত রয়েছে। এঁদের সকলেরই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ছিল। মনে হয় গৌড় ও মগধের যুক্ত অধিকার নিয়েই এঁরা 'মহারাজ' রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

আনুমানিক ৭৩৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কামরূপ-রাজ হর্ষবর্মণ গৌড়রাজ জীবিতগুপ্তকে পরাভূত করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন এবং ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওড়িষ্যা-মগধ ও মিথিলা জয় করেন। হর্ষবর্মণের গৌড়ের অধিকারও স্থায়ী হয়নি। সম্ভবতঃ ৭৪১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কনৌজ-রাজ যশোবর্মার আক্রমণে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

কনৌজ-রাজ যশোবর্মা গৌড়ের সিংহাসনে যে ব্যক্তিকে উপবিষ্ট করান—তাঁর নাম জানা যায় না। কিন্তু তিনিও যে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের হাতে নিহত হন—রাজতরঙ্গিনীর লেখক কলহন তার বিস্তৃত পরিচয় রেখে গেছেন।

## ৬. পাল-রাজতন্ত্রের আবির্ভাবের পটভূমি

পর পর দুইজন গৌড়পতি অল্প সময়ের ব্যবধানে নিহত হলে—গৌড়ে রাজনৈতিক শূন্যতা নেমে আসে এবং গৌড়-রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিদের শাসনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ আ. ৭৪০ থেকে আ. ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আর কোনো উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায় না। এই যুগের নৈরাজ্যের কথাই হয়তো খালিমপুর তাম্রশাসন 'মাৎস্যন্যায়'-রূপে উল্লেখিত হয়েছে এবং এই পরিবেশে নির্বাচিত রাজা গোপালের দ্বারা পাল-শাসনে প্রবর্তিত হলে বাংলায় শান্তি শৃংখলা ফিরে আসে।

# খ. প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ

## ১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখতে পেয়েছি উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ ভাগ অর্থাৎ গৌড়াঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব ছিল—কথিত অন্ধকার শতবর্ষে, যদিও রাজাদের নামের ধারাবাহিকতা এখনো জানা যায়নি। কিন্তু প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে এই শতবর্ষে যাঁরা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁদের ধারাবাহিক বংশ-পরিচিতি লভ্য। তাই তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয় এবং অরাজক অবস্থার দীর্ঘাবস্থান এতদঞ্চলে হয়নি।

## ২. শালস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অপুত্রক অথবা চিরকুমার ভাস্করবর্মার মৃত্যু হলে (৬৫০ খৃষ্টাব্দ)—শালস্তম্ভ কামরূপ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রত্নপালবর্মণের বরগাঁও তাম্রশাসন থেকে জানা যায়—ইনি ম্লেচ্ছ ( > মেচ ) বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং এই বংশের দু'একজন রাজার নামও—অনার্য-শব্দজাত। কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, নৃতত্ত্বে অনার্য শ্রেণীভুক্ত হয়েও ভাষা-সংস্কৃতি ও ধর্মে আর্যায়িত অনেকগুলি গোষ্ঠী আর্য ও সৎক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হয়েছেন। আসামের ঐতিহ্য অনুসারে সব বংশের রাজাগণই প্রায় ভগদত্তবংশোদ্ভূত বলে দাবী করে থাকেন। শালস্তম্ভের বংশধরেরাও তা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি—ভগদত্তও মূলতঃ অনার্য (মঙ্গোলীয়)-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। চমৎকারিত্বের বিষয় মেচ (বা ম্লেচ্ছগণ)-ও তাই। সেদিক থেকে ভগদত্তবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে দাবী করে এই রাজবংশ কিছু অন্যায় করেনি।

শালস্তম্ভ সম্ভবতঃ কোন প্রদেশ বা ভুক্তিশাসক ছিলেন ভাস্করবর্মার অধীনে। কিন্তু ভাস্করবর্মার মৃত্যুতে—তাঁর কোন নিকটতম আত্মীয়ের ক্ষমতা দখলের আগেই, অথবা তেমন কোন আত্মীয় ক্ষমতা দখল করে থাকলে তাকে উচ্ছেদ করে সিংহাসন দখল করেন, আনুমানিক ৬৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে। সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন-সহ প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ ভাস্করবর্মার সমগ্র রাজ্যই শালস্তম্ভের শাসনাধীনে আসে। এই বংশের শাসক হর্জরবর্মণের তাম্র-শাসন থেকে জানা যায় যে, শালস্তম্ভের পর তাঁর পুত্র বিজয় রাজত্ব লাভ করেন (আ. ৬৭৫ খৃষ্টাব্দ)। বিজয়ের পর পালক (আ. ৬৮৫-৭০০ খৃ), কুমার (আ. ৭০০-৭১৫ খৃ) এবং বজ্রদেব (আ. ৭১৫-৭৩০ খৃ.) রাজত্ব করেন।

## ৩. মহারাজ হর্ষবর্মন ও তৎকর্তৃক গৌড়বিজয় (?)

আনুমানিক ৭৩০ খৃষ্টাব্দে বজ্রদেবের পুত্র হর্ষবর্মণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এই বংশের অন্যতম বিখ্যাত রাজা। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে—কারণ গৌড়বঙ্গে তাঁর রাজ্য-বিস্তারের কথা জানা গেছে।

হর্ষবর্মণ যখন কামরূপের অধীশ্বর তখন কনৌজের অধীশ্বর যশোবর্মা গৌড় ও বঙ্গের রাজগণকে পরাস্ত করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক যশোবর্মণ পরাজিত হলে—অধীনতঃ গৌড়রাজকে ললিতাদিত্য হত্যা করেন। গৌড়ের এই দুর্দিনের সময় পূর্বদিক থেকে হর্ষবর্মণ গৌড় আক্রমণ করে গৌড়-সহ পশ্চিমবঙ্গও দখল করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে নেপালরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে। নেপালরাজ দ্বিতীয় জয়দেব ছিলেন—হর্ষবর্মণের আপন জামাতা এবং তিনি ১৫৩ সংবতে অর্থাৎ ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন।

এই শিলালিপিতে অবশ্য দাবী করা হয়েছে যে—হর্ষবর্মণ ছিলেন "গৌড়ারি-কলিঙ্গ-কোশল-পতি।" Sir Edward Gait একে কাব্যিক অতিশয়োক্তি বললেও—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিলালিপির ভাষ্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আনুমানিক ৭৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে গৌড়বঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতার যে পরিচয় আমরা বর্তমান অধ্যায়ের 'গৌড়-ভূমি' উপচ্ছেদে দেখতে পেয়েছি—তাতে এই ধরনের বহিরাক্রমণ ও গৌড়ে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অবসানের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কামরূপের এইরূপ রাজ্য-বিস্তৃতির ফলে সেই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির সাহায্য করে থাকতে পারে। কারণ—কামরূপরাজের গৌড়-বিজয়ে গৌড়রাজবংশের পতন এবং হর্ষবর্মণের এই বিজিত রাজ্যভোগ অত্যল্প সময়ে শেষ হওয়ায় গৌড়বঙ্গে ছোট ছোট রাজন্যের উদ্ভবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

নেপাল-রাজ দ্বিতীয় জয়দেবের উৎকীর্ণ শিলালিপির বক্তব্যকে কিছু কিছু ঐতিহাসিক অসত্য দাবী বলে মনে করলেও—নতুন কোন প্রামাণ্য তথ্য ছাড়া একে অস্বীকার করা মুশকিল। যাই হোক শিলালিপির বক্তব্য সত্য হলে আনুমানিক ৭৩৯ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হর্ষবর্মণের গৌড়-বিজয় হয়ে থাকতে পারে এবং কলিঙ্গ ও মগধ বিজয়ও ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হতে পারে। এই অনুমানের হেতু এই যে—হর্ষবর্মণ-প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল রাজ্য, যা তাঁর উত্তরাধিকারী পাননি, হঠাৎ করে ভেঙ্গে যাওয়ার একটিই নির্ভরযোগ্য কারণ হতে পারে কনৌজরাজ যশোবর্মার গৌড়াক্রমণ এবং তিনি ৭৩৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দিগ্বিজয়ে বের হন। মগধ ও গৌড়ের সীমানায় আসতে তাঁর কিছুতেই পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সময় লাগার কথা নয়।

যাই হোক—৭৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হর্ষবর্মণ গৌড়-কলিঙ্গ-কোশল-

মগধের অধিপতি হয়ে শক্তি-বিস্তার করতে থাকলে—সাম্রাজ্যের স্বপ্নবিভোর যশোবর্মার সঙ্গে হর্ষবর্মণের যুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক এবং যশোবর্মার সভাকবি সে যুদ্ধকে গুরুত্ব দিতে একটি কাব্য-রচনা করে ফেলা বিচিত্র নয়। হর্ষবর্মণ সম্ভবতঃ মগধে একজন সামন্তকে প্রতিষ্ঠিত করে—'গৌড়াধিপতি' নাম নিয়ে গৌড়ে অবস্থান করছিলেন। 'গৌড়বহ' কাব্যের বর্ণনা অনুসারে যশোবর্মার আক্রমণে মগধের রাজা পরাজিত ও নিহত হন এবং গৌড়ের অধিপতি পরাজিত ও বন্দী হলে তাঁর গ্রীবাচ্ছেদ করা হয়। এইভাবে দু' বছরের মধ্যে গৌড়ে কামরূপের আধিপত্য শেষ হয়। কামরূপ-রাজ্যের পরবর্তী ইতিহাস—কালক্রম অনুসারে পালযুগে আলোচিত হবে।

সপ্তম অধ্যায়: ( ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী )

1. Dynastic History of Northern India—H. C. Roy
2. Political History of Ancient India—
H. C. Roychoudhury
3. Gaudva Rajmala—R. D. Chanda
4. Inscription of Bengal—N. G. Mazumdar
5. History of North Eastern India—R. G. Basak
6. The Early History of Bengal—P. L. Paul
7. History of Ancient Bengal—R. C. Mazumdar
8. Harsa Charita—Bana Bhatta ( Cowell's trans. )
9. Kamrupa Sasanavali—P. N. Bhattacharya
10. Early History of Kamrupa—K. L. Barua

# অষ্টম অধ্যায়

# পালযুগে উত্তরবঙ্গ

( আ. ৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ )

## ক. গৌড়-বরেন্দ্রে পালশাসন

### ১. পাল-সাম্রাজ্য প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের গৌরব

বাঙালীর সর্বকালের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য পালগণ গড়ে তুলেছিলেন—এটি সারা বাংলার গর্বের বস্তু। কিন্তু এতে উত্তরবাংলার গর্বের বা গৌরবের হেতু অধিক। বহুখ্যাত এই পাল-সাম্রাজ্য উত্তরবঙ্গের মাটিতেই প্রথম জন্ম নেয়। বঙ্গসন্তান এই পালগণ উত্তরবঙ্গেরই বাসিন্দা ছিলেন। উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রই ছিল পালরাজাদের পিতৃভূমি। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগের পটভূমিতে বঙ্গের তথা উত্তরবঙ্গের সামন্তগণের দূরদৃষ্টি, ত্যাগ ও গণতান্ত্রিক মানসিকতা যেভাবে প্রস্ফুট হয়েছে—গোপালের রাজপদে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, সে ঐতিহাসিক ঘটনার অকুস্থল বরেন্দ্রভূমি নিশ্চয়ই সেজন্যে গর্ব করতে পারে। পাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগে মগধে রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও—এই রাজবংশের উদ্ভবের যুগে গৌড় আর পতনের যুগে রামাবতী, দুই-ই উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল। পালযুগে যত জনকল্যাণমূলক কাজ বা প্রতিষ্ঠানাদির প্রতিষ্ঠা বঙ্গভূমিতে হয়েছিল, তার অধিকাংশই বোধহয় উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ বরেন্দ্র-ভূমিতে হয়েছিল। এযাবৎ প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংখ্যাধিক্যে তাই মনে হয়। যাই হোক—পালযুগ বাঙালীর গৌরবের যুগ হলেও—সে গৌরব এবং গর্বের প্রধান ভাগীদার উত্তরবঙ্গ।

### ২. পাল-শাসনের সূত্রপাত ঃ গোপাল ( আ. ৭৫০-৭৭০ )

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দেশের বীভৎস মাৎস্যন্যায় দূর করবার জন্য 'প্রকৃতিপুঞ্জ' গোপালকে রাজা নির্বাচিত করে। 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বলতে নিশ্চয়ই দেশের সমগ্র

জনসাধারণকে বোঝাতে পারে না, তবে জনগণের স্থানীয় প্রতিনিধি বা শাসক-বৃন্দকে বোঝানো সম্ভব। তিব্বতী লেখক তারানাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, তখন বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যে যেখানে পারে নিজেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজা বলে ঘোষণা করেছিল। এমত অবস্থায় স্থানীয় শ্রেণীবর্ণ-নির্বিশেষে, সকল ভূস্বামী বা সামন্তগণ—কোথাও সম্মিলিত হয়ে গোপালকে স্বেচ্ছায় দেশেব সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তারানাথের মতে গোপাল পুণ্ড্রবর্ধন-নিবাসী এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বপ্যট যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং পিতামহ দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ' পণ্ডিত ছিলেন। গোপাল ও তাঁর বংশধরগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রথমেই সমগ্র বঙ্গদেশের সামন্তগণ একসঙ্গে গোপালকে নিজেদের অধীশ্বর বলে মেনে নিয়েছিল—এমন কল্পনা অবাস্তব। সম্ভবতঃ মূল ভূখণ্ডে কিছু সংখ্যক সামন্তের স্বেচ্ছাবরিত সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে গোপালকে ধীরে ধীরে সারা বঙ্গে ক্ষমতা বিস্তৃত করতে হয়—কখনো কূটনীতিতে কখনো হয়তো সামরিক শক্তিতে। কিন্তু গোপালের বিশাল বঙ্গরাজ্যে স্বপ্রতিষ্ঠার সেই দীর্ঘ কাহিনী আজ অজ্ঞাত। আনুমানিক ৭৭০ খৃষ্টাব্দে—সম্পূর্ণ বঙ্গভূমিকে এক শাসনে এনে, দেশে শান্তি, শৃংখলা, শক্তি ও প্রাচুর্য এনে দিয়ে—এবং তাকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় রকমভাবে শক্তিশালী করে গোপালের কৃতিত্বপূর্ণ রাজত্বকাল শেষ হয়।

## ৩. পাল-সাম্রাজ্যের বিস্তার: ধর্মপাল ও দেবপাল

গোপালের মৃত্যুতে তাঁর পুত্র ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সমরকুশল ও কূটনীতি-বিশারদ রাজা ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে চলেন। পশ্চিম ভারতে রাজপুতনা ও মালবাধিপতি বৎসরাজও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে পুর্ব দিকে এগিয়ে আসতে থাকেন। ঠিক কোথায় দুই পক্ষের যুদ্ধ হয়েছিল বলা যায় না। তবে এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। ঘটনার চারশ' বছর পরে লেখা "পৃথ্বীরাজ বিজয়" নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বৎসরাজ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান সেরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ধর্মপালের এই পরাজয় তাঁর ভাগ্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। কারণ—এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবও উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য-বিস্তারের আশায় অভিযান করেন এবং যুদ্ধে বৎসরাজকে

পরাজিত করেন। ধ্রুব যখন বৎসরাজের সংগে সংঘর্ষে ব্যস্ত—ধর্মপাল তখন মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে উপনীত। এইখানে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজের খোদিত প্রশস্তিতে ধর্মপালের পরাজয় বর্ণিত হলেও—এ যুদ্ধে ধর্মপাল কোন রাজ্য হারাননি। তাতে মনে হয়—এ যুদ্ধে জয়পরাজয় চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি। এমতাবস্থায় ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল আরো দেশ জয় করে—পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত উপনীত হন। কান্যকুব্জ অধিকার করে একদিকে সিন্ধুনদ, অন্যদিকে পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। কান্যকুব্জে তিনি অধীনত রাজন্যবর্গের সামনে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিরাট ভূখণ্ডে অবশ্য ধর্মপাল কেবল বঙ্গ ও বিহার নিজ শাসনাধীনে রাখেন, কান্যকুব্জ চক্রায়ুধ নামক এক রাজ-প্রতিনিধিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বাদ বাকী ভূখণ্ডে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজাদের করদ-আনুগত্য নিয়েই ছেড়ে দেন।

কিন্তু এই সাম্রাজ্য তখনো বিপদমুক্ত হয়নি। কারণ এই সময় বৎসরাজের পুত্র নাগভট্ট নবজাগ্রত শক্তিরূপে পশ্চিম ভারতে আবির্ভূত হন এবং চক্রায়ুধকে পরাস্ত করে কনৌজ পর্যন্ত দখল করে নেন। খবর পেয়ে পাল-সম্রাটের সৈন্যগণ নাগভট্টের আগ্রাসনকে বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত হয়। কিন্তু ধর্মপালের ভাগ্য পুনরায় সুপ্রসন্ন; কারণ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করেন। এই যুদ্ধের পরে তৃতীয় গোবিন্দও দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান—এবং উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল, তার সুযোগ নিয়ে ধর্মপাল আপন বিজিত রাজ্যগুলিতে ক্ষমতা সংহত করেন।

ধর্মপালের পরে তাঁর পুত্র দেবপাল (আ. ৮১০-৮৫০ খৃষ্টাব্দ)—পিতৃ-সাম্রাজ্য শুধু রক্ষাই করেননি। নতুন নতুন রাজ্যজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্যের পরিধি ও শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। দেবপাল-প্রচারিত তাম্রশাসনে জানা যায় যে, তিনি কাশ্মীর পর্যন্ত রাজ্য জয় করেন। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, কামরূপরাজও দেবপালের বশ্যতা স্বীকার ক'রে কর-প্রদানে বাধিত হন। বিগ্রহপালের প্রধানমন্ত্রী গুরবমিশ্রের লিপিতে পাওয়া যাচ্ছে যে, দেবপাল উৎকল-কুল ধ্বংস, হূণ-গর্ব খর্ব এবং দ্রাবিড়-গুর্জর রাজ্য-শক্তিকে বিধ্বস্ত করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের মালিক হতে পেরেছিলেন। ভঞ্জবংশীয় কোন রাজাকে পরাস্ত করেই সম্ভবতঃ তিনি ওড়িষ্যায়, অন্ততঃ তার অধিকাংশের অধিপতি হন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক হর্ষবর্ধন-কৃত সাম্রাজ্যকেই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্য বলে বর্ণিত করেছেন; কিন্তু সে গৌরব যথার্থভাবে পাল-সাম্রাজ্যের প্রাপ্য। হর্ষের সাম্রাজ্যের চেয়ে এই সাম্রাজ্য অধিকতর বিস্তৃত এবং স্থায়ী হয়েছিল।

## ৪. পাল-সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি

দেবপালের পরে—আভ্যন্তরীণ কলহ বা অন্য কারণে ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকাল রাজত্ব করেই তিনি পুত্র নারায়ণ-পালের হাতে রাজ্য অর্পণ করে বাণপ্রস্থে যান। নারায়ণপাল অন্ততঃ দীর্ঘ ৫৪ বছর রাজত্ব করেন ( আ. ৮৫৪-৯০৮ খৃষ্টাব্দ )—কারণ ৫৪ রাজ্য সংবৎসরে নারায়ণপালের উৎকীর্ণ একটি লিপি পাওয়া গেছে। যাই হোক উচ্চাভিলাষ-হীন, শান্তিপ্রিয় নারায়ণপালের দীর্ঘ রাজ্যভোগ ঐতিহাসিক দিক থেকে তৎপর্যহীন। নারায়ণপালের রাজত্বের ষোড়শবর্ষে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ আক্রমণ করে তার অধিপতিদের আনুগত্য আদায় করেন। সম্ভবতঃ এই সময় ওড়িষ্যার রাজা রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিয়দংশ দখল করে নেন। এই বিপদের দিনে আবার প্রতীহার-রাজ ভোজ পালরাজ্য আক্রমণ করে বসেন। নারায়ণপাল ভীষণভাবে পরাজিত হন। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল, দ্বিতীয়বার পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করে বিহার প্রদেশ দখল করেন। শুধু তাই নয়-তিনি সমগ্র উত্তরবাংলায় স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেন। বাংলা ও বিহারে মহেন্দ্রপালের যে সব শাসন-লিপি পাওয়া গেছে তার তারিখ ৮৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এ ছাড়া কলচুরি-রাজ কোক্কলও এ সময় পশ্চিমবঙ্গে হানা দেন। এদিকে পূর্ববঙ্গে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ ( আ. ৮৮০-৯১৪ )-ও পালরাজ্য আক্রমণ করেন। সুযোগ বুঝে কামরূপ ও উৎকলরাজগণ আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকার করেন। এইভাবে চারিদিক থেকে বহিরাক্রমণ ও বিদ্রোহের ফলে—পালসাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সমস্যা দেখা দেয়। নারায়ণপাল নিজ পুত্র রাজ্যপালের সঙ্গে দ্বিতীয় কৃষ্ণের দৌহিত্রী ভাগ্যদেবীর বিবাহের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রকূটগণকে নিজ পক্ষে আনয়ন করেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রতীহারদিগকে পরাজিত ও বিদূরিত করে পুনরায় বিহার ও বাংলায় নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল ও পৌত্র দ্বিতীয় গোপাল রাজত্ব করেন। রাজশাহীর অন্তর্গত ভাতুরিয়া শিলালিপি থেকে জানা যায়—রাজ্যপাল বহু শত্রু জয় করেন এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, পাণ্ড্য, কর্ণাট, লাট, সুহ্ম, গুর্জর, কিরাত ও চীনদেশীয়গণ তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করতো। সম্ভবতঃ রাজ্যপাল ওড়িষ্যা ও মিথিলা অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজ্য বলশালী হয়ে উঠলেও উত্তরবঙ্গ, উত্তর-পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা পর্যন্ত পালরাজ্যের সীমানা ছিল। [ দ্র. বাংলাদেশের ইতিহাস, ( ১ম খণ্ড ), মজুমদার—পৃ. ৮১ ]। দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ( আ. ৯৬০-৯৮৮ খৃষ্টাব্দ ) দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁর সময়ে পালদের মূল পিতৃভূমি গৌড় হাতছাড়া হয়ে যায়, সেখানে কম্বোজবংশজাত এক ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন রাজত্ব শুরু করেন। কম্বোজবংশীয় এই রাজা কে ছিলেন জানা যায় না। সম্ভবতঃ পালরাজগণের কম্বোজবংশীয় কোনো সেনাপতি তাঁর স্বজাতীয় লোকজন নিয়ে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করেন ও এই গৌড়রাজ্যের জন্ম দেন। চন্দেলরাজ যশোবর্মণের আক্রমণে পালগণ পরাজিত হন এবং তাঁর পুত্র ধঙ্গ ( আ. ৯৫৪-৯৯০ খৃ. ) সসৈন্যে রাঢ় পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কলচুরিরাজ লক্ষ্মণ গৌড় ও বঙ্গাল দেশ দখল করেন বলে তাঁর সভাকবি দাবী করেছেন। মোট কথা—দশম শতাব্দীর শেষভাগে পাল-রাজত্ব বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল।

## ৫. পাল-সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন ও মহীপাল

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল ( আ. ৯৮৮ খৃষ্টাব্দ ) যখন সিংহাসন আরোহণ করেন—তখন পাল-সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা, কিন্তু মহীপালের অর্ধ শতাব্দী কাল রাজত্বে পালরাজ্য আবার সাম্রাজ্যের আকার প্রাপ্ত হয়। তিনি প্রথমে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ দখল করে, রাজত্বের চতুর্থ বর্ষের মধ্যে পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন। কুমিল্লা জেলায় প্রাপ্ত দু'খানি মূর্তির পাদপীঠে মহীপালের উৎকীর্ণ-লিপি থেকে সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। উত্তরবঙ্গে তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রমাণ, রাজত্বের নবম-বর্ষে উৎকীর্ণ তাঁর বাণগড়লিপি। তাছাড়া বেলার তাম্রশাসনও ( রাজত্বের ৫ম বর্ষে উৎকীর্ণ ) তাঁর উত্তরবঙ্গ অধিকারের প্রমাণ। কিন্তু এই সময় দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত ও বহির্ভারতে সাম্রাজ্য-শাসক চোল-রাজ

রাজেন্দ্র মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করেন। মহীপাল পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। তাঁর পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে চোল-রাজার সৈন্য ফিরে যায়। চোল-রাজের এই আক্রমণের তাৎপর্য সঠিক জানা যায়নি, তবে প্রচলিত ধারণা যে, গঙ্গা-জল আহরণই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল।

যাই হোক—চোল আক্রমণের বিভীষিকা দূর হলে মহীপাল আবার সাম্রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। মগধ ও মিথিলা তিনি পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারেই লাভ করেছিলেন। ১০২৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তিনি বারাণসী দখল করেন। ঐ সালে উৎকীর্ণ মহীপালের লিপি সারনাথে পাওয়া গিয়েছে। আনুমানিক ১০৩১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব পালদের হাত থেকে বারাণসী ছিনিয়ে নেন।

কলচুরিরাজের সঙ্গে মহীপালের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। বারাণসীর অধিকার নিয়ে উক্ত অঞ্চলেই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয় তা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই সব যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়-পরাজয় হয়নি এবং মহীপালও তাঁর কুমিল্লা থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহীপাল ধর্ম-সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানাদির রক্ষণাবেক্ষণে এবং জনহিতকর কাজ-কর্মে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারনাথে, কাশীতে, নালন্দায়। বুদ্ধগয়ায়—হিন্দু বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল মন্দির ও সংঘগৃহ সংস্কার ও নির্মাণ তাঁরই কীর্তি। কাশীধামে নবদুর্গার মন্দির যেমন তিনি তৈরী করেন, সারনাথে "সাঙ্গ ধর্মচক্র" সংঘ-প্রাসাদ এবং নালন্দার অগ্নিদগ্ধ বিদ্যাগৃহের সংস্কারও তিনি করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে মহীপালের স্মৃতি-জড়িত অজস্র কীর্তি ছড়িয়ে আছে; যথা—দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুরের মহীসন্তোষ, রংপুর জেলার মহীগঞ্জ মহীপালের স্মৃতিবাহী। চৈতন্যভাগবতে মহীপাল-গাথায় প্রচলনের কথা জানতে পারা যায়। দেবপাল ধর্মপালকে লোকে ভুলে গেলেও, সম্ভবতঃ জনহিতকর কার্যে একদা প্রবল জনপ্রিয় মহীপাল বাংলার ঘরে ঘরে আলোচিত হয়েছেন এবং এখনো বিস্মৃত হননি। "ধান ভানতে মহীপালের গীত"—সেই জনপ্রিয়তা-মথিত প্রবাদ মাত্র।

## ৬. বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিরোধে অবক্ষয়

মহীপালের পুত্র নয়পালের ( আ. ১০৩৮-৫৪ খৃ. ) সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই আবার বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তর্বিরোধে পালরাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষীকর্ণের আক্রমণই নয়পালের রাজত্বকাল কণ্টকিত করে রাখে। দীর্ঘকাল ব্যাপী এই যুদ্ধ চলতে থাকে। বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি হলেও নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের ( ১০৫৪-৭২ খৃ. ) সময় লক্ষীকর্ণ আবার পাল-রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং নিজ কন্যা যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের হাতে সমর্পণ করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

কিন্তু কলচুরিগণের হাত থেকে নিস্তার পেলেও পাল-রাজ্যের বিপদ দূর হ'ল না। কলচুরিদের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে ঈশ্বর ঘোষ নতুন ঢেক্করী রাজ্য স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গেও এই সময় বিক্রমপুরে বর্মবংশ এবং কুমিল্লাতে পট্টিকেরা স্বাধীন রাজ্য তৈরী করেন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের এই বিপদের মধ্যেই চালুক্যরাজগণ বাংলা আক্রমণ করেন। সভাকবি বিহ্লনের মতে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য গৌড় এবং কামরূপও জয় করেন। সুযোগ বুঝে উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। এদিকে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কামরূপরাজ রত্নপালের গৌড় অভিযানের তথ্য পাওয়া গেছে 'বড়গাও' লিপিতে।

তৃতীয় বিগ্রহপাল চতুর্দিকে এই সব বিদ্রোহ ও অশান্তির আগুনকে নেভাতে পারেননি। সমস্যা-কণ্টকিত এই রাজ্যই তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহীপালকে। দ্বিতীয় মহীপালের সময় আভ্যন্তরীণ কলহ ও ষড়যন্ত্র এমন একটা পর্যায়ে পৌছায় যাতে—তিনি নিজের দুই ভাই—দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপালকেও সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তাদের কারারুদ্ধ করেন। এতে বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং এই বিদ্রোহের প্লাবনে মহীপাল ভেসে গিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন এবং বিদ্রোহীদের নায়ক জেলে-বংশ-জাত দিব্বোক বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

## ৭. বরেন্দ্রভূমির স্বাধীন কৈবর্ত-রাজ্য ও দিব্বোক

তথাকথিত নিম্ন-জাতি কৈবর্তদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার ইতিহাসের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। মধ্যযুগে অক্ষত্রিয় অব্রাহ্মণদের রাজ-সিংহাসনে বসা দুর্লভ ঘটনা। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে তা ঘটেছে এবং হয়তো একাধিকবার নৃতাত্ত্বিক বিচারে মূলতঃ মঙ্গোলীয়-জাতি উদ্ভূত বৃহৎ 'বোডো' গোষ্ঠীর একটি ভারতীয় সংকর শ্রেণী মেচ ও কোচগণ উত্তরবঙ্গে সামন্ত-তন্ত্র ও রাজতন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে বারে বারে এবং শালস্তম্ভের বংশ থেকে কোচবংশের রাজ্য-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করেছে। স্থানীয় জন-জীবন থেকে উদ্গত এবং সগোষ্ঠীর লোকের স্থানীয় সংখ্যাধিক্যের আনুকূল্যে—উত্তরবঙ্গে তথাকথিত এই অনধিকারী রাজবংশাবলীর রাজনৈতিক অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল।

যাই হোক—সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্তজাতির এই অভ্যুত্থান ও তাঁর পরবর্তী কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনানুসারে মনে করা যায় যে—দ্বিতীয় মহীপালের হঠকারী ও নিষ্ঠুর শাসনে বরেন্দ্রভূমিতে এই প্রজা-বিদ্রোহ হয় এবং রাজপরিবারের মধ্যেই অশান্তি ও দৌর্বল্য থাকায়—এই বিদ্রোহ বহু সংখ্যক রাজকর্মচারী কর্তৃক নৈতিকভাবে সমর্থিতও হয়। বোধ হয় এই কারণেও অমাত্যগণ বিদ্রোহ-দমনে বলপ্রয়োগে আপত্তি তোলেন। নিজের ভ্রাতাদের কারারুদ্ধ করে এবং কারাবন্দী ভ্রাতাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে এবং অবশেষে প্রজা-বিদ্রোহে সৈন্য-প্রয়োগের সিদ্ধান্তে সমর্থনহীন রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যান এবং দিব্বোকের নেতৃত্বে পরিচালিত বিদ্রোহী প্রজা ও সৈন্যদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দিব্বোক সমগ্র বরেন্দ্রভূমি দখল করে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন [ আনুমানিক ১০৭৫ খৃষ্টাব্দ ]।

প্রজা-বিদ্রোহের আকস্মিক ঘটনাক্রমে রাজ্যদখল দিয়ে দিব্বোকের কৃতিত্ব পরিমাপ করলে ভুল হবে। তিনি কুশলী যোদ্ধা, সফল সংগঠক, সক্ষম দেশ-পালক ছিলেন। অনেকে কৈবর্ত-বিদ্রোহকে প্রজা-বিদ্রোহ না বলে—উত্তরবঙ্গের সামন্ত-বিদ্রোহ বলতে চান। সেটা মেনে নিলেও—দিব্বোকের সংগঠন ও পরিচালন-শক্তির পরিচয় পেতে কষ্ট হয় না। একজন নিম্নজাতীয় ব্যক্তি যদি পালদের পিতৃভূমিতে বহুতর সামন্তদের একত্রিত করে অত্যাচারী দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে সকল বিদ্রোহ পরিচালনায় মধ্যে তাঁর সংগঠনশক্তির যেমন

পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি যে আভ্যন্তরীণ কলহ ও ষড়যন্ত্রে দেশ পরিপূরিত হয়েছিল—তাকে প্রশমিত বা দমন করে, দেশে সুশৃংখল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সাফল্যে তাঁকে সুশাসক ও সক্ষম দেশচালক না বলে পারা যায় না। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁর শাসন এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সর্বশ্রেণীর সামন্তদের ঐক্য ও সহযোগিতা এত দৃঢ় হয়েছিল যে, তিনি পূর্ব থেকে বর্মবংশের এবং পশ্চিম দিক থেকে পালবংশের আক্রমণ প্রতিহত করে বরেন্দ্রের কৈবর্ত রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন—আজীবন। কেউ কেউ মনে করেন—বর্মবংশীয় জাতবর্মার হাতে দিব্বোক পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রমাণিত হয়নি এবং এই যুদ্ধে দিব্বোকের কোনো রাজ্যহানিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। অপর দিকে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুতে দ্বিতীয় শূরপাল ও তাঁর পরে রামপাল—মগধে-রক্ষিত অবশিষ্ট পালরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে—দিব্বোককে আক্রমণ করে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হন নি। 'রামচরিত' থেকে জানা যায়—রামপাল বরেন্দ্র উদ্ধার করবার চেষ্টা করেও সফল হননি ; উপরন্তু দিব্বোক বারে বারে মগধ আক্রমণ দ্বারা রামপালকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

দিব্বোক কতদিন রাজত্ব করেছিলেন জানা যায় না। তবে তাঁর রাজত্বকালে তাঁব অধিকৃত ভূখণ্ড তো অখণ্ড ছিলই—কৈবর্তরাজ্য তাঁর পুত্র ও পৌত্র পর্যন্ত টিকে ছিল। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রুদোক রাজা হন। রুদোকের পরে তৎপুত্র ভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'রামচরিত'-কাব্যের মতে এই সময় পালবাজ্যের পক্ষে বিষম বিপদ উপস্থিত হওয়ায়—রামপাল বরেন্দ্রভূমিকে আক্রমণে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হন। এই বিষম বিপদ কী—লেখক বলেননি। সম্ভবতঃ রাজ্যের পশ্চিমাংশে কর্ণাটকের বিজয়ী বীর নান্যদেবের আবির্ভাব, রামপালের পরাজয় ও নান্যদেবের মিথিলা দখল ইত্যাদি ঘটনাকে 'বিষম বিপদের' সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে প্রকাশ করেছিলেন—সন্ধ্যাকর নন্দী। রামপালের পরাজয়কে সভাকবি ব্যাখ্যা করে বলতে চাননি। অতএব পশ্চিম ভাগের মহাশক্তিশালী নান্যদেবকে যখন কিছু করা যাবে না—তখন রাজ্যের অস্তিত্বরক্ষায় পূর্ব দিকে রাজ্যাধিকার বিস্তার রামপালের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। অথচ পূর্বদিকে ভীমও শক্তিশালী রাজা। তাই যুদ্ধের ফলাফল সুনিশ্চিত করতেই রামপালকে সামন্তদের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করতে বের হতে হয়। যাই হোক—কূটনীতি, প্রলোভন ও বৈবাহিক সম্বন্ধ-সূত্রে বাঙ্‌লা-

বিহার-মিথিলা-ওড়িষ্যার সামন্তবর্গকে সামরিক আঁতাতে যুক্ত করে এবং তাঁদের সৈন্যদের পাল-সৈন্য সঙ্গে একত্রিত করে, উপরন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ মথনদেবের সামরিক সাহায্য নিয়ে, রামপাল ভীমকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এই বিশাল বাহিনীও কিন্তু ভীমের বাহিনীকে প্রথম দিকে এঁটে উঠতে পারেনি। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় আকস্মিকভাবে হস্তীপৃষ্ঠ হতে পতিত হয়ে ভীম বন্দী হয়ে পড়লে তাঁর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। রামপাল বরেন্দ্র দখল করেন এবং ইতিহাসের জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে ভীমকে ও তাঁর পরিবারবর্গের সকলকে হত্যা করেন। বধ্যভূমিতে নিয়ে ভীমেরই সম্মুখে তাঁর পুত্র কন্যা স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে একে একে বহু অত্যাচারপূর্বক হত্যা করা হয়; এক ঘায়ে না মেরে ভীমকে তীরবিদ্ধ করতে করতে হত্যা করা হয়। এই যুদ্ধের ফলে স্বাধীন কৈবর্তরাজ্যের অবসান হলো। আরেকটি বড় কাজ হলো—গৌড়ের সন্নিকটে রামাবতীতে পালদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা। পালরাজ্যের অবশিষ্ট ইতিহাসে এটাই হলো তাদের মূল রাজধানী। শুধু তাই নয়—এখানেই বিবর্তিত হতে শুরু করে সেন-শাসন ও পরবর্তী বাংলার মুসলিম শাসনের বৃহত্তর অংশ।

## ৮. রামপালের রাজ্য-বিস্তার

রামপালের (আঃ ১০৭৭ খৃ.—১১৩০ খৃ.) আমলে পাল-রাজ্য আবার শক্তিমান্ ও আত্মপ্রসারী হয়ে ওঠে। আনুমানিক ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বরেন্দ্র-ভূমি দখল করতে পারলে—তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্যের দ্বার খুলে যায়। সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে তিনি পূর্ববঙ্গে অভিযান করেন এবং বর্মবংশের আনুগত্য আদায় করেন। রামপালের সেনাপতি ও সামন্তগণ কামরূপও বিজয় করে করদরাজ্যে পরিণত করে। রাঢ়ের সামন্তগণ সম্ভবতঃ বিনাযুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করে। রামচরিতের সাক্ষ্যে জানা যায়—রামপাল উৎকল জয় করে কলিঙ্গ পর্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। অঙ্গ ও মগধ রামপালের দখলেই ছিল শিলালিপিতে তার প্রমাণ মিলেছে। মিথিলা প্রথম মহীপালের সময় থেকে পালরাজ্যভুক্ত ছিল কিন্তু আনুমানিক ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে কর্নাটকরাজ নান্যদেব মিথিলা ছিনিয়ে নেন রামপালের নিকট থেকে। যাই হোক, পশ্চিমে নান্যদেবের এবং দক্ষিণে সেন-বংশীয় সামন্তরাজ বিজয় সেনের লোলুপ দৃষ্টি থেকে অবশিষ্ট পালরাজ্যকে রক্ষা করাই রামপালের বড় কীর্তি।

## ৯. পাল-শাসনের শেষ দিনগুলি

রামপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারপাল রাজা হলেন। তাঁর রাজত্বকালে ( আ. ১১৩০-১১৪০ ) বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে সামন্ত-বিদ্রোহ হলে প্রধান অমাত্য ও রাজসখা বৈদ্যদেব তা দমন করেন। কিছুদিন পর কামরূপে তিমগ্যদেব বিদ্রোহী হন। বৈদ্যদেব সে বিদ্রোহ দমন করেন ও সেখানে রাজপ্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতে থাকেন। সম্ভবতঃ কুমারপালের মৃত্যুর পর তিনি সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজস্ব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কুমারপালের পরে তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল ( ১১৪০-১১৪৪ ) এবং তার পরে মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১১৪৪ খৃ. )। মদনপালের সময়েই পালরাজ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। একদিকে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের আক্রমণ, অন্যদিকে গাড়হবালগণের মুঙ্গের পর্যন্ত দখল—পালরাজ্যের ভিত দুর্বল করে দেয়। সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গের রাজা গোবর্ধনও রামাবতীর উপকণ্ঠে হাজির হলে মদনপাল কোনক্রমে তাকে কালিন্দী নদীর ওপারে প্রতিহত করেন। মদনপালের মৃত্যুর সময় দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গও হাতছাড়া হয়েছিল এবং পালরাজ্য মগধের মধ্য ও পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মদনপালই হয়তো পালবংশের শেষ রাজা। তবু এই সময় গয়াতে গোবিন্দপাল নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করতেন এবং তাঁর গৌড়েশ্বর উপাধিও ছিল। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য বিনষ্ট হয়। একে যদি পালবংশীয় ধরা হয় তবে ঐতিহ্যময় পাল-সাম্রাজ্যের যবনিকাপতনের তারিখ ১১৬২ সনই ধার্য করা যেতে পারে।

## খ. পালযুগে প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ

### ১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে—অধিকাংশ বঙ্গভূমিতে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা তথাকথিত 'মাৎস্যন্যায়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের জীবন তখন স্বাভাবিকভাবে বয়ে চলেছিল শালস্তম্ভপ্রতিষ্ঠিত রাজ-বংশের শাসন-ছায়ায়। সেই শাসন-প্রবাহই শতবর্ষ প্রবাহিত ( ৬৫০ খৃ-৭৫০ খৃ ) হয়ে পালযুগে প্রবেশ করে। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, এই বংশের

হর্ষবর্মণ (আ ৭৩০-৭৫০ খৃ.) তাঁর রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গ তাঁর শাসনাধীনে আনলেও, তিনি কনৌজ-রাজ যশোবর্মার হাতে পরাজিত ও নিহত হলে, উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ এই বংশের হাত ছাড়া হয়ে যায়। যশোবর্মা-বিধ্বস্ত বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত-শাসনকে উচ্ছেদ করে পালরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সে রাজ্য ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের শক্তিতে রূপান্তরিত হলে কামরূপীয় শাসনের পশ্চিম দিকে বিস্তারের সম্ভাবনা বেশ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তথাপি পশ্চিম প্রান্তে এই রাজ্য-সংকোচনের ফলেও প্রায় চিরদিনের মতই, এবাবেও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গেব করোতোয়া পূর্ব ভূখণ্ড এই বংশের শাসনাধীনে রয়ে যায়। বঙ্গে যখন গোপালদেবের আবির্ভাব (আ. ৭৫০ খৃ.) প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে তখন শালস্তম্ভেব বংশধর দ্বিতীয় বলবর্মণ রাজত্ব করছিলেন।

## ২. মহারাজ বলবর্মণ ও তাঁর বংশধরগণ

মহারাজ হর্ষবর্মণের মৃত্যুতে তৎপুত্র বলবর্মণ—আ. ৭৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং আ. ৭৬৫ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পরবর্তী দু'জন রাজা নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ কেউ মনে করেন মহারাজ জল্লবর্মণ বলবর্মণের পরে সিংহাসনে বসেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলে তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিরোধ বাধে এবং শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠ পুত্র বিক্রান্ত সকলকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। স্কন্দপুরাণে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। ঐতিহাসিক কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণে এটি সমর্থিত হয়নি। যাই হোক, ঘটনাচক্রে বিক্রান্ত পারিবারিক কলহ ও ষড়যন্ত্রে নিহত হলে এই বংশেরই আরথিবর্মণ বাজা হন। কারো কারো মতে আরথি বর্মণ কখনো রাজ্য শাসন করেননি। সে যাই হোক, আ. ৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার এই রাজবংশের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আরথির পুত্র প্রলম্ভ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বনমাল শিলালিপিতে আরথির পুত্র এই প্রলম্ভবর্মণের সম্বন্ধে লেখা আছে যে, তিনি শালস্তম্ভ থেকে হর্ষবর্মণ পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের সকল শত্রুদের বিনাশকারী। গেইট তাই মনে করেছিলেন—যে তিনি পূর্ববর্তী সব রাজবংশের বংশধরগণের হত্যা অথবা নির্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন [ Gaits History of Assam, p-29 ]. কিন্তু একথা সত্য হতে পারে না। কারণ শিলালিপিতে বর্ণিত শালস্তম্ভ থেকে হর্ষবর্মণ পর্যন্ত সময়ে

এই বংশের শত্রুতা করতে আর কোনো রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং তেমন কোন রাজবংশের বিনাশ সাধন প্রয়োজন ছিল না। বিনাশপ্রাপ্ত যদি কেউ হয়েই থাকে তবে তা স্ববংশীয় জল্লবর্মণের পুত্রগণ এবং প্রলম্ভের হাতে হাত থাকা বিচিত্র নয়।

## ৩. মহারাজ হর্জরবর্মণ ও তাঁর উত্তরসূরীগণ

যাই হোক, প্রলম্ভের পরে তৎপুত্র হর্জরবর্মণ আনুমানিক ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৫১০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৮২৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হর্জরবর্মণের একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়েছে তেজপুর জেলায়। হর্জরবর্মণ ছাড়া নওগাঁ শিলালিপিতে, যা তৃতীয় বলবর্মণ কর্তৃক উৎকীর্ণ, দেখা যায় যে, পরম পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম মহেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ইনি খ্যাতিমান রাজা ছিলেন সন্দেহ নেই। তাঁর শাসনকালে আসামে রাজনৈতিক সংহতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর রাজধানী হারূপেশ্বর সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়েছিল।

তাঁর পুত্র বনমালবর্মণ আনুমানিক ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বনমালবর্মণের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তা হতে জানা যায়, তিনি শ্রীহট্ট ও ময়মনসিং-এ রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। উক্ত তাম্রশাসন তাঁর রাজত্বের ঊনবিংশতি বর্ষে প্রচারিত হয়েছিল এবং এতে তিনি ত্রিস্রোতা ( তিস্তা ) নদীর পশ্চিমে চন্দ্রপুরী বিষয়ে অভিস্থূরা ভটক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে—এই রাজার রাজত্বকাল যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল এবং উত্তরবঙ্গের বিরাট অংশে অর্থাৎ তিস্তার পশ্চিমেও তাঁর রাজ্য প্রসারিত ছিল। তৃতীয় বলবর্মণের নওগাঁও লিপিতে আরো জানা যায় যে—বনমালবর্মণ তাঁর রাজ্য জুড়ে অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করেন যার বিশালত্ব, জাঁকজমক ও কারুকার্য বিশ্বে অতুলনীয়।

বনমালবর্মণের পরে তাঁর পুত্র জয়মাল ( বা বীরবাহু ) আনুমানিক ৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃ ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকেন। জয়মাল যখন ক্ষমতাসীন তখন পাল-সাম্রাজ্যের হ্রাদন চলছিল। এই সময় সুযোগ বুঝে ওড়িষ্যারাজ পালরাজ্যকে আক্রমণ করেন। পালরাজ নারায়ণ পাল তখন জয়পালের সাহায্য ও বন্ধুত্ব প্রার্থনা করেন। তদনুসারে জয়মাল

বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ওড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে জানা যায়, জয়মালের অভিযানের সংবাদেই ওড়িষ্যা-রাজ পলায়ন করেন। নওগাঁ লিপিতে জানা যায় যে, পরিণত বয়সে অসুস্থতা-জনিত কারণে জয়মাল তৎপুত্র তৃতীয় বলবর্মণের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৮৭৫ থেকে ৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। রাজত্বের অষ্টম বর্ষে প্রচারিত তাঁর শিলালিপিতে ভূমিদানের বিবরণ পাওয়া যায়। তৃতীয় বলবর্মণের পরবর্তী ৬ জন রাজার নাম এখনো জানা যায়নি। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন ত্যাগসিংহবর্মণ। পরবর্তী রাজবংশের রাজা রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসন থেকে ত্যাগসিংহ সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। ত্যাগসিংহের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়—রাজকর্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক মনোনীত হয়ে ব্রহ্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কামরূপ তথা প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের নতুন রাজবংশের শাসন শুরু হয়। যে ঘটনা বরেন্দ্রের মাটিতে একবার হয়েছিল 'গোপাল'কে সর্বসম্মতিক্রমে রাজা নির্বাচনে, সেই ঘটনাই আবার পুনরাবৃত্ত হলো উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের অরাজকতা-রোধে ব্রহ্মপালের নির্বাচনে।

## ৪. ব্রহ্মপাল ও তাঁর বংশের রাজত্বের ইতিহাস

(৯৮৫ খৃ.—১১২৫ খৃ.)

ব্রহ্মপালের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালের মৃত্যু হলে পালসাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ কলহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় অর্থাৎ নয়পাল ও তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় ব্রহ্মপাল সম্ভবতঃ তাঁর রাজ্যসীমা পশ্চিম ভাগে বাড়াতে সচেষ্ট হন। পাল-রাজ্যের উত্তরভাগে রাজ্য দখলকে দুর্বল পালরাজগণ প্রতিহত করতে না পারলেও—পশ্চিম দিক থেকে মিথিলার রাজা জাতবর্মা কামরূপরাজের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চয়ই সুনজরে দেখেননি। ভোজবর্মাদেবের বেলভা-তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, জাতবর্মা কামরূপরাজ্যের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন। তা থেকে অনুমিত হয় যে, জাতবর্মা হয়তো কামরূপ-সৈন্যকে পরাজিত করে কিছু পশ্চিমা ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তথাপি উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডই যে ব্রহ্মপালের শাসনে ছিল—তার একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি

পশ্চিমে প্রসারিত রাজ্যের অধিকার ও শাসন দৃঢ়তর করতে রাজধানী হারূপেশ্বর থেকে সরিয়ে গৌহাটির নিকটে নিয়ে আসেন।

ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপাল এই বংশের অন্যতম বিশিষ্ট রাজা। তিনি পিতৃদেবের তৈরী রাজধানীকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে নাম দেন—"শ্রীদুর্জয়"। তাঁর রাজত্বকালে বরেন্দ্রে কৈবর্তরাজতন্ত্র স্থাপিত হলে—উত্তরবঙ্গে পালদের শাসন ভেঙ্গে পড়ে। এই সুযোগে রত্নপাল সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের আরো অভ্যন্তর প্রদেশে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেন। রত্নপালের দু'খানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে—দু'টিই ভূমিদান-সংক্রান্ত; একটি বড়গাঁও অন্যটি শালকুচিতে, এই ভূমি প্রদত্ত হয়েছিল। প্রথম তাম্রশাসনটি রত্নপালের রাজত্বের ২৫তম বর্ষে এবং দ্বিতীয়টি ২৬ বর্ষে প্রচারিত হয়। শালকুচি গ্রাম বা তহশিল কোথায় অবস্থিত ছিল তা জানা যায়নি। তবে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র স্থান ও নামের শেষে কুচি শব্দের প্রাদুর্ভাব থেকে মনে হয়—শালকুচি সম্ভবতঃ পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্তর্গত কোন ভূখণ্ড ছিল। রত্নপাল আনুমানিক ৪০ বছর রাজ্য শাসন করেন, ফলে তাঁর জীবৎকালেই যুবরাজরূপেই তাঁর পুত্র পুরন্দরপালের মৃত্যু হয় এবং তিনি আপন পৌত্র ইন্দ্রপালকে সিংহাসনে বসান। ইন্দ্রপালেরও দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে—একটি তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে অন্যটি ২১তম বর্ষে প্রচারিত। ইনিও দীর্ঘ পঁচিশ বছর রাজত্ব করে নিজ পুত্র গোপালকে রাজ্য দান করেন। বিল্‌হনের "বিক্রমাঙ্ক দেবচরিত" গ্রন্থে জানা যায় যে, হর্ষপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭৫ থেকে আ. ১০৯০ খৃ.) চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কদেব কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের ফলাফল জানা যায়নি। তবে এতে কামরূপ রাজ্য যে সংকুচিত হয়নি তার প্রমাণ আছে। কারণ হর্ষপালের পুত্র ধর্মপালের (আ. ১০৯০-১১১৫ খৃ.) যে দু'টি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে—তাতে শ্রাবস্তী অঞ্চলে 'ক্রোশাঞ্জা' প্রভৃতি গ্রামে ভূমি-দানের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক শ্রাবস্তীর অবস্থিতি উত্তরবঙ্গে বলে প্রমাণ করেছেন [দ্র. কামরূপ শাসনাবলী, পৃ. ১৫০-১৫৮]।

## ৫. কামরূপ-সিংহাসনে বঙ্গজ-রাজন্যদের প্রতিষ্ঠা

ব্রহ্মপাল-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজা ধর্মপালের পুত্র জয়পাল আ. ১১১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় গৌড়েশ্বর রামপালের

সামন্ত ও প্রতিনিধি তিঙ্গ্যদেব জয়পালকে পরাজিত করে ( ১১২৫ খৃ. ) কামরূপ দখল করেন এবং পালরাজ্যের অধীনস্থ সামন্তরূপে কামরূপ শাসন করতে থাকেন। এই সময় দক্ষিণবঙ্গের বিদ্রোহ দমনে পাল-সৈন্য নিযুক্ত থাকায়—সুযোগ বুঝে তিঙ্গ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নতুন রাজবংশের শাসন-প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্ন তাঁর অল্পদিনের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। কারণ রামপালের আদেশে আ. ১১২৭ খৃষ্টাব্দে রামপালের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেব কামরূপ অভিযান করেন। তিঙ্গ্যদেব প্রচণ্ড প্রতিরোধ তৈরী করে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করলেও—যুদ্ধে পরাজিত ও পরে নিহত হন। বৈদ্যদেব কামরূপ দখল ( ১১২৭ খৃ. ) করে আনুমানিক তিন বছর সামন্তরাজারূপে শাসনকার্য চালাতে থাকেন। ইতিমধ্যে রামপালের মৃত্যু হলে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ দুর্বল হওয়ায়—বৈদ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করে নিজস্ব রাজবংশের শাসনের সূত্রপাত করেন ( আ. ১১৩০ খৃ. )। বৈদ্যদেব তাঁর রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে ( অর্থাৎ ১১৪২ খৃ. ) কামৌলি তাম্রশাসনে কামরূপজয় বর্ণনা করে গেছেন।

## ৬. বৈদ্যদেবের শাসনকালে পালযুগের অবসান

বৈদ্যদেব আনুমানিক ১১৩০ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক" উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কামৌলি শাসন-লিপিতে তিনি যে ভূমি দান করেছেন—তার প্রাপক শ্রীধর নামক এক ব্রাহ্মণ এবং এই ভূমি ছিল প্রাক্জ্যোতিষভুক্তির অন্তর্গত কামরূপ-মণ্ডলের 'বারা' বিষয়ে এবং শান্তিবারা ও মান্দারা গ্রামে [ Epigraphia Indica—Vol-II, p-347 ]. এই 'বারা' গ্রাম সম্ভবতঃ আধুনিক 'বারপেটিয়া', যা জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। অদূরেই ইতিহাসখ্যাত ভিতরগড় যার প্রতিষ্ঠাতা এই বংশেরই রাজা পৃথু ( Early History of Assam—K. L. Barua—p-130 )। এই অঞ্চলটি করতোয়ার পূর্বতীরে এবং এই পর্যন্ত ভূ-ভাগ—কামরূপ-কামতাপুর-কোচবিহার রাজতন্ত্রের ছত্রছায়াতেই ছিল প্রায় সর্বযুগে।

বঙ্গকুলজ এই রাজন্য কামরূপ বিজয়ের পর কোথায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন—তা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কেউ বলেন কামরূপ, কেউ বলেন হংসকুচি, কেউ বলেন কামতাপুর। হংসকুচিতে থেকেই রাজ্যের চতুর্থ বছরে ভূমিদান করায় অনেকে মনে করেন এখানেই ছিল তাঁর রাজধানী৮

কিন্তু প্রায় সমগ্র কামরূপ রাজ্য নিজ দখলে থাকায় কেন্দ্রভূমি কামরূপে থাকাই স্বাভাবিক বলে অনেকে দাবী করেছেন। কিন্তু পূর্ব দিকে সেন-রাজশক্তির উদ্ভব ও বিস্তারে কামরূপ থেকে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার অসুবিধার জন্য—আরো দক্ষিণে সৈন্য-ঘাঁটি বা শাসকীয় উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। সে কারণে কেউ কেউ মনে করেন—বৈদ্যদেব কামতাপুরেই তাঁর বাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ; অর্থাৎ কামতাপুব নগরীর প্রথম স্থপতি তিনিই [ Back ground of Assamese Culture—Raj Mohan Nath—p-148 ; Dynastic History os India—H. C. Roy—Vol-I, p-241 ].

বৈদ্যদেবের বাজত্বকালের শেষভাগে গৌড-বাজ বিজয় সেন কামরূপ আক্রমণ করেন। বিজয় সেনেব দেওপাডা লিপিতে লেখা আছে—'গৌড়েন্দ্র-মদ্রবৎ অপাকৃত-কামরূপ-ভূপম্'। এই উক্তির অর্থ নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিজয় সেন যে কামরূপরাজকে পরাজিত ও গৌড়-রাজ্যেব দখলীকৃত ভূমি থেকে বিতাডিত করেছিলেন—কমপক্ষে এই দাবীটুকু সবাই মেনে নিয়েছেন। পরাজিত হয়েই হোক বা স্বাভাবিক মৃত্যুর ফলেই হোক ১১৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বৈদ্যদেবের রাজত্ব-কাল শেষ হয়। তখন সেনযুগ শুরু হয়ে গিয়েছে। বৈদ্যদেবের রাজবংশেব পরবর্তী ইতিহাস তাই সেন আমলের অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হবে।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( অষ্টম অধ্যায় )

1. বাঙ্গালার ইতিহাস-( ১ম খণ্ড )—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
2. বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব )—নীহাররঞ্জন রায়
3. বাংলাদেশের ইতিহাস ( প্রাচীন যুগ )—রমেশচন্দ্র মজুমদার
4. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
5. গৌড়রাজমালা—রামপ্রসাদ চন্দ
6. The Palas of Bengal—R. D. Banerjee
7. A Chronogy of the Pala Dynasty of Bengal
8. History of Ancient Bengal—R. C. Mazumdar
9. Kamarupa Sasanavali—P. N. Bhattacharya
10. Early History of Assam—K. L. Barua
11. History of Assam—Gait
12. Gazetteer of Bengal & North East India—Allen, Gait, & Howard
13. Rama Charit—Sandhya Karnandi

# নবম অধ্যায়

# সেন আমলে উত্তরবঙ্গ

( খৃ. ১১৫০ থেকে ১২০৩ খৃষ্টাব্দ )

## ক. গৌড়-কেন্দ্রিক শাসন

### ১. সেনরাজবংশের উদ্ভব কাহিনী

সেনরাজাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের কর্নাটপ্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। কোন্ সময়ে তাঁরা প্রথম বাংলাদেশে আসেন তা বলা কঠিন। তবে পাল-সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তির যুগে খশ, হুন, মালব, কর্নাট প্রভৃতি প্রদেশ থেকে পালসৈন্য সংগৃহীত হতো পালদের তাম্রশাসনে তার উল্লেখ আছে। কর্নাট প্রদেশীয় কোন যুদ্ধব্যবসায়ী এইভাবেই হয়তো বাঙ্‌লায়—ধীরে ধীরে স্থানীয় সামন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই আদি পুরুষের পরিচয় পাওয়া না গেলেও এই বংশের সামন্ত সেন সম্বন্ধে জানা যায় যে, কর্নাট প্রদেশে অনেক যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ জীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে তিনি রাঢ় দেশে গঙ্গাতীরে বসতি স্থাপন করেন। এই সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেও—মূলতঃ তিনি রামপালের অধীনে রাঢ়ের একজন সামন্তমাত্র ছিলেন। তাঁর পুত্র বিজয় সেনই সেন-বংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা।

### ২. বিজয় সেন

বিজয় সেনের একটি তাম্রশাসন ও তিনখানি শিলালিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তাঁর তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তিনি—আনুমানিক ১১২৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। রামপালের মৃত্যুর পর এই অধীনস্থ সামন্ত শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি বর্মরাজকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন। দেওপাড়া শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি নান্য, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামক রাজাদের পরাজিত করেন; তিনি কামরূপরাজকে দূরীভূত, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত এবং গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়নে বাধ্য করেন। পাল-

রাজ্যের পতনের যুগে সম্ভবতঃ মিথিলা থেকে নান্যদেব, আসাম থেকে বৈদ্যদেব এবং উড়িষ্যা থেকে অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র রাঘব বাংলা দখল করতে তিন দিক থেকে এগিয়ে আসেন। শিলালিপির বক্তব্য অনুসারে, তিনি এদের পরাভূত বা প্রতিহত করে বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। বৈদ্যদেবের সঙ্গে বিজয় সেনের কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল বলা কঠিন। তবে মনে হয় বরেন্দ্র-ভূমির অভ্যন্তরে, অর্থাৎ অগ্রসরমান কামরূপ-সৈন্যের সঙ্গে। কারণ—পুরোপুরি উত্তরবঙ্গ বিজয় সেনের রাজ্যান্তর্গত হয়নি। রাজশাহী জেলার দেওপাড়াতে বিজয় সেনের শিলালিপিতে প্রকাশ যে—ওখানে তিনি প্রদ্যুম্নেশ্বরের একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করেন। অতএব, আংশিক বরেন্দ্র তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল একথা নিশ্চিত। পরাজিত ও পলায়িত গৌড়রাজ যে মদনপাল তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, এ অভিযানের মোট ফল—বাংলার মাটিতে পালরাজ্যের বিলোপ ( তবে মগধ ও গয়া অঞ্চলে সম্ভবতঃ আরো কিছুদিন এই বংশের ছোট রাজ্য টিকে ছিল )। যাই হোক আনুমানিক ১১৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বাংলা থেকে মুছে যায় বলে, কিছু পূর্বেই বিজয় সেন স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করা সত্ত্বেও,—১১৫০কেই আমরা পালযুগের শেষ ও সেনযুগের আরম্ভ বলে ধরে নিয়েছি।

## ২. বল্লাল সেন

পিতা বিজয় সেনের মৃত্যুতে আনুমানিক ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন সিংহাসনে বসেন। বল্লাল সেন পিতৃরাজ্য রক্ষাই শুধু করেননি ; রাজ্য বিস্তারও করেছেন। তিনি প্রথমেই মগধ ও গয়া অঞ্চলে পালরাজত্বের শেষ চিহ্ন মুছে দিতে, সেখানকার পালরাজা যিনি তখনো নিজেকে 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করতেন, সেই গোবিন্দপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১১৬২ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ বল্লাল সেনের হাতেই পরাজিত হয়ে তিনি রাজ্যচ্যুত হন এবং পাল-রাজবংশের চিহ্ন অবলুপ্ত হয়। তিনি নান্যদেবের যোগ্য উত্তরসূরী-হীন শাসনের সুযোগে মিথিলাও দখল করেন। আজ পর্যন্ত মিথিলাতে লক্ষণাব্দ চালু আছে। বল্লাল সেনের রাজত্বের নবম বছরে অষ্টধাতুর সূর্যমূর্তিতে খোদিত বল্লাল সেনের একটি লিপি ভাগলপুর জেলার সনোখা গ্রামে পাওয়া গেছে। বিহারে বল্লাল সেনের অধিকারের এটি নিশ্চিত প্রমাণ। যাই হোক

মগধ ও মিথিলায় রাজ্য বিস্তার করে তিনি, জনপ্রবাদ অনুসারে রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচটি প্রাদেশিক শাসন চালু করেন। তিনি প্রচলিত সম্রাটসূচক পদবী ছাড়াও 'অরিরাজ-মিঃ শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেন।

কিন্তু একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে—রাজ্য বিস্তারের চেয়ে শাস্ত্রচর্চা, যাগযজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারেই তাঁর নাম বেশি স্মরণীয়। তিনি গ্রন্থকারও ছিলেন—তাঁর রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামক দু'টি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রাজসভাও বহু বিদ্বজ্জন-আলোকিত ছিল। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করে, ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি সস্ত্রীক বানপ্রস্থ গ্রহণ করে গঙ্গাতীরে বসবাসের জন্য চলে যান।

## ৩. লক্ষ্মণ সেন

লক্ষ্মণ সেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১১৭৯ খৃ. ) তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট; তথাপি এই প্রায় বৃদ্ধ রাজা রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গে ও পশ্চিম ভারতে রাজত্ব বিস্তারে-উদ্যম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই সম্পূর্ণ গৌড় বিজয় শেষ করেন এবং গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন, তাঁর পিতা বা পিতামহের এই উপাধি ছিল না। তিনিই গৌড় সংলগ্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর রাজধানী নিজ নামে লক্ষ্মণাবতী করেন। কলিঙ্গ, কামরূপ, মগধ ও মিথিলা অভিযানগুলি তিনি পিতার আমলেই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে মধ্যভারতে গাড়হবাল-রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সেনরাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তিনি গাড়হবালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং গাড়হবালদের পরাজিত করে অন্ততঃ কাশী ও প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। উক্ত দুই স্থানে স্থাপিত তাঁর জয়স্তম্ভই তার প্রমাণ।

একথা ঠিক—লক্ষ্মণ সেনের আমলে সেনরাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার ঘটে, তবে উত্তরবঙ্গে তার বিস্তৃতির সীমারেখা সম্ভবতঃ উত্তরে দিনাজপুর ও রংপুরকে অতিক্রম করেনি। কারণ তার উত্তরে তখন কামরূপীয় রাজ্যের সীমারেখা এবং সে সীমারেখার উত্তরে কামরূপরাজ পৃথুর শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজ্য বর্তমান ছিল।

পিতা ও পিতামহ শৈব হলেও লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সম্ভবতঃ শেষ জীবনে এই পরাক্রান্ত যোদ্ধা বৈষ্ণববাদের প্রভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের

অধিকারী হন। লক্ষণ সেন সুকবি ছিলেন—তাঁর রচিত দু' একটি কবিতা পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রাজসভাও ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতি ধর প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণ কর্তৃক অলংকৃত হয়েছে। লক্ষণ সেন পিতৃআজ্ঞায় 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করেন। তিনি আশী বছর বয়ঃক্রমেও রাজ্যভার নিজ হস্তেই রেখেছিলেন। এতে বোধহয় প্রশাসনিক দুর্বলতা ঘটেছিল। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে সুন্দরবনের 'খাড়ি'-পরগণায় ডোম্মনপাল নামক জনৈক সামন্ত বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্যভারতে এমন কি মগধে তখন মুসলিম ক্ষমতার দ্রুত প্রসার ঘটছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে যখন বিপদ ও সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছিল তখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজধানী লক্ষণাবতী ছেড়ে গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন। তখন এক আকস্মিক আক্রমণে বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ দখল করে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের সূত্রপাত ঘটান।

## খ. উত্তরবঙ্গে কামরূপ-কামতাপুরের শাসন

### ১. বৈদ্যদেবের বংশধরদের রাজত্ব

আনুমানিক ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যদেবের রাজত্বকাল শেষ হলেও তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা রয়েছে। সম্ভবতঃ এর পরে ভাস্করদেব, রায়ারি-দেব ও উদয়কর্ণদেব রাজত্ব করেন।

মাধাইনগর লিপি থেকে জানা যায়—বিজয় সেনের পরে তাঁর পৌত্র লক্ষণ সেনও একবার কামরূপ আক্রমণ করেন। এইভাবে বারে বারে আক্রান্ত হওয়ায় সম্ভবতঃ কামরূপরাজ্য বিশৃংখল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং শাসক-পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ১১৫০ থেকে ১১৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত তিনজন রাজাকে রাজত্ব করতে হয়।

### ২. রায়ারিদেব

তেজপুরে আবিষ্কৃত বল্লভদেবের তাম্রশাসন, যা ১১০৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, বল্লভদেবের পূর্বে

তাঁর পূর্বোক্ত বংশধরগণ রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসনে 'রায়ারিদেব'কে বীর যোদ্ধা বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তিনি শত্রুকে যুদ্ধভূমি থেকে পলায়নে বাধ্য করেছেন, সেই যুদ্ধে প্রতাপশালী বঙ্গীয় গজযূথ থাকা সত্ত্বেও। এর থেকে মনে করা হয় গৌড়ের সৈন্যের সঙ্গে এ যুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নয়।

## ৩. বল্লভদেব

যাই হোক, বল্লভদেব সম্ভবতঃ কামরূপের শক্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আনুমানিক ১১৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বৈদ্যদেবের পরে আনুমানিক ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ পৃথু ক্ষমতায় আসেন (১১৯৫-১২২৮ খৃ.) এবং তাঁর পুত্র সন্ধ্যা ও পৌত্র সিন্ধু রাজত্ব করেন। যেহেতু ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ইতিহাসে নতুন যুগের (মুসলিম যুগের) সূত্রপাত— পৃথু, সন্ধ্যা ও সিন্ধুর রাজত্বকাল ও কৃতিত্বের বর্ণনা আমরা যথাস্থানে করবো।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী (নবম অধ্যায়)


1. Cronology of Sena Kings of Bengal— P. C. Barat (IRAS-1930)
2. Origin of the Senas—R. C. Mazumdar
3. Early History of Bengal—G. M. Sarkar
4. Early History of Bengal—Girindra Mohan Sarkar
5. Palas of Bengal—R. D. Banerjee
6. Early History of Assam—K. L. Barua
7. History of North Eastern India—R. Basak
8. History of Assam—Gait.
9. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—নীহাররঞ্জন রায়
10. বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার
11. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন

# দশম অধ্যায়

# বঙ্গে মুসলিম অভিযান ঃ প্রথম পর্ব ( ১২০৩-১২২৭ )

# ও

# প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে মহারাজ পৃথুর প্রতিরোধ

## ১. ভারতে মুসলিম শাসনের পটভূমিকা

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশটি বছরে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পট-পরিবর্তন ঘটে। মাত্র দশটি বছরে আকস্মিক প্লাবনের মত মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ ভারতের বৃহত্তম ভূ-ভাগকে অধিকার করে নেয়। জম্মুর হিন্দুরাজার আমন্ত্রণে ১১৯০ খৃষ্টাব্দে গজনীর অধিপতি মহম্মদ বিন সাম্ ভারত অভিযানে আসেন। এই সময় উত্তর ভাবতের রাজশক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপ—পৃথ্বীরাজের অধীনে দিল্লী ও আজমীঢ়, চালুক্যরাজ ভীমের অধীনে গুজরাট, বুন্দেলখণ্ডের শাসনকর্তা পবমার্দিদেব এবং কনৌজের রাজা জয়চাঁদ। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম আঘাত এসে পড়লো পৃথ্বীরাজের উপর। মহম্মদ প্রথমেই ভাতিন্দা দখল করে নেন এবং কাজী জিয়াউদ্দীনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খবর পেয়ে পৃথ্বীরাজ সসৈন্যে ছুটে যান। পথে তরাইয়ের ( Torouri ) মাঠে দুই পক্ষে যুদ্ধ হয়। মহম্মদ পরাজিত ও আহত হয়ে পলায়ন করেন। পৃথ্বীরাজ জিয়াউদ্দীনকেও পরাজিত ও বিতাড়িত করে ভাতিন্দা উদ্ধার করেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আবার পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করেন এবং পৃথ্বীরাজ আবার তরাইয়ের মাঠে যুদ্ধের জন্যে উপস্থিত হন। শস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে চাতুর্যের যোগে মহম্মদ এবার পৃথ্বীরাজকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে মহম্মদ দিল্লী পর্যন্ত ব্যাপ্ত বিশাল ভূখণ্ড করায়ত্ত করেন।

পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের দৃশ্য দেখেও উত্তর ভারতের রাজন্যদের দূরদৃষ্টি জাগে নি বা তাঁরা যৌথভাবে আত্মরক্ষায় সম্মিলিত হননি। মহম্মদ দিল্লী দখল করে কুতুবুদ্দীন আইবককে এবং আজমীঢ় দখল করে পৃথ্বীরাজের পুত্রকে শাসনক্ষমতায় বসান। ইতিমধ্যে আইবকের অধীনস্থ সৈনিক মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার বিহার ও তিরহুত আক্রমণ করে লুঠপাট শুরু করেন। তিনি ওদন্তপুর বৌদ্ধসংঘ ও

বিদ্যালয়কে একটি রাজধানী ভেবে আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠনাদি ও ধ্বংসকার্য সমাধা করে পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। মুসলিম শক্তি যখন দ্রুততম গতিতে বিহার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে—কনৌজের রাজা জয়চাঁদ তখন নিশ্চিন্তে কাল কাটাচ্ছিলেন। এই সুযোগে দিল্লীতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মহম্মদ বিন সাম্ এবং আইবক একযোগে জয়চাঁদকে আক্রমণ করলেন। যমুনার তীরে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলিমগণ যখন আশাহত হয়ে রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত—তখন আকস্মিকভাবে একটি তীর জয়চাঁদের চোখে বিদ্ধ হলে—তিনি নিজের হাতীর পিঠেই মারা যান। বলা-বাহুল্য—পলায়নপর হিন্দু-সৈন্যদের ব্যাপক হত্যার মধ্য দিয়ে বিজয়লক্ষ্মী মহম্মদের করায়ত্ত হয়। মহম্মদ তখন বারাণসী আক্রমণ করে কিছু হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করে গজনীতে ফিরে যান। ভারতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেখে যান কুতুবুদ্দীন আইবককে।

১১৯৫ খৃষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন গুজরাট আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ ভীমের সেনাপতি কানওয়ার পাল পরাজিত ও নিহত হলে—ভীম পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ভীম নিজেই এসে আজমীরের কাছে আইবককে আক্রমণ করেন এবং আইবক পরাজিত হন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই গজনী থেকে সৈন্য ও সাহায্য এসে পৌছলে—আইবক ভীমকে পুনরায় আক্রমণ করেন। ভীম সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। তাঁর ১৫০০০ সৈন্য নিহত, ২০,০০০ সৈন্য বন্দী হয় ও বাকী পলায়ন করে। এইভাবে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শতদ্রু থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত মুসলিম-শাসনের পদমূলে লুটিয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর বাকী দুই বছরে মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার, অযোধ্যায় নতুন জায়গীরদার মালিক ইসাম-উদ্দীনের সৈন্যদলে যোগ দেন এবং মীর্জাপুর জেলায় জায়গীর প্রাপ্ত হন। মীর্জাপুরে দলবল সংগ্রহ করে তিনি ১২০১ সালে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল নিজ দখলে নিয়ে আসেন এবং গৌড় আক্রমণে উদ্যোগী হন।

## ২. বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত

বিহার যখন দু'টি বছর ধরে মুসলিম আক্রমণে বিপন্ন, বাংলার রাজা লক্ষণ সেন তখন রাজধানী লক্ষণাবতী ছেড়ে নদীয়ায় গঙ্গাতীরে পুণ্যার্জনে ব্যস্ত। একদিন যে লক্ষণ সেন বিজয়ী সেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে, কাশীতে ও

প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, মুসলিম আক্রমণের সময় তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ এবং পরম বৈষ্ণবরূপে শাস্ত্রজ্ঞদের নিয়ে নদীয়ায় জীবনাতিবাহিত করছিলেন। আবার যে রাজ্যের সেনাপতি ও রাজকর্মচারী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাহিনী বিশ্বাস করে নগর পরিত্যাগ করে যান এবং বিদেশী বাহিনী শহর, রাজবাড়ী এমন কি মহিলা-মহলে প্রবেশ করলেও বাধা দেওয়ার কিম্বা টুঁ-শব্দটি করবার কেউ থাকে না—এবং মীনহাজুদ্দীনের কাহিনী যদি সত্য হয়—যে আহাররত রাজা পার্শ্ববর্তী কক্ষে বিদেশী সৈন্য প্রবেশ না করা পর্যন্ত খবর পাওয়ার সুযোগ পায় না—সে রাজ্য সপ্তদশ অশ্বারোহী না নিয়ে এলেও দখল করা কঠিন নয়। তবু যে মীনহাজুদ্দীন বলেছেন—পিছনে 'দিগর সক্কর' ছিল, তার সংখ্যা প্রমাণে বাংলার ইতিহাস ও শাসকীয় রাজন্যের মুখ রক্ষা হবে না এবং সে সংখ্যার ইতর বিশেষে দায়িত্বশীল-শাসন-শূন্য বাংলার ভাগ্য কিছুমাত্র পাল্টাতো না। অতএব এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো—মীর্জাপুরের জায়গীরদার ও বিহার লুণ্ঠনকারী বখতিয়ার অন্তঃসারশূন্য বাংলার অরক্ষিত রাজাকে নদীয়ার রাজবাড়ীতে আকস্মিক আক্রমণে পলায়নে বাধ্য করে নদীয়া দখল করেন। এবং 'রায় লছমনিয়ার' সকল মুলুক জব্দ করে —রাজধানী লক্ষণাবতীতেই শাসনপীঠ ( দার-উল্-মুল্‌ক্ ) স্থাপন করলেন [১২০২]। কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ বা প্রতিরোধ ছাড়াই বাংলা মুসলিম-শাসনে চলে গেল এবং পরম বৈষ্ণব লক্ষণ সেন রাজ্য উদ্ধারের জন্যও কোনো চেষ্টা করেননি। তিনি শান্তিতে পূর্ববঙ্গের অবশিষ্ট ভূখণ্ডে বাকী জীবন কাটিয়ে দিলেন। সংক্ষেপে এই হ'ল—গৌড়রাজ্য অর্থাৎ বিশাল বঙ্গভূমি মুসলিম শাসনভুক্ত হওয়ার কাহিনী, যা তৎকালীন ও পরবর্তী গ্রন্থাদির সাক্ষ্যে জানা যায়।

## ৩. উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রথম মুসলিম অভিযান ( ১২০৬ খৃঃ )

আনুমানিক ১২০২ খৃষ্টাব্দে রাজধানী লক্ষণাবতীতে ( মতান্তরে দেবকোটে ) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে—মীর্জাপুরের জায়গীরদার থেকে বাংলার সুলতানে রূপান্তরিত বখতিয়ার—পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ দখলের চেষ্টা করলেন না, রাজধানীর একশ' মাইল উত্তরে যে কামরূপের সীমানা সে কামরূপ জয়ের প্রেরণা পেলেন না—তিনি চীন ও তিব্বত আক্রমণের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন এবং দূত মারফত সেই

সংবাদ পাঠিয়ে সাহায্য চাইলেন কামরূপ-রাজের। অন্ততঃ মীনহাজুদ্দীনের গল্প তাই এবং সে গল্প তিনি ঘটনার ৩৭ বছর পরে লক্ষণাবতীর এক বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। অথচ সমসাময়িক রচনা, মীনহাজুদ্দীনের 'তবাকত-ই-নাসিরী' গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া বিশদ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ কম। অতএব—মীনহাজুদ্দীনের কাহিনীকে একটু বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যাই হোক—মীনহাজুদ্দীনের তথ্যগুলি হলো এই—কামরূপরাজ দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন যে, তিব্বত অভিযানের এটা ভুল সময় এবং তিনি এ সময় অভিযানে অংশ গ্রহণ ও সাহায্য করতে পারবেন না। তিনি বখতিয়ারকে তিব্বত অভিযানে বিরত হতেই অনুরোধ জানালেন। অথচ বখতিয়ার 'তথাকথিত' তিব্বত অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন—কামরূপরাজের উপদেশ অবজ্ঞা করে। শুধু বেরিয়ে পড়লেন, তাই নয়—নানা অজুহাতে কামরূপরাজের রাজধানীর ঠিক পিছনটাতে গিয়ে পৌছলেন—যেখান থেকে না ভূটানের রাজধানী, না তিব্বতের রাজধানী, না চীনদেশে যাবার রাস্তা পাওয়া যায়। অপর রাজ্যে বখতিয়ার সসৈন্যে প্রবেশ করলেন—তখন, যখন সেখানকার রাজার তীব্র আপত্তি ও অসহযোগিতা রয়েছে। এবং চীন-তিব্বত দখলের জন্য মাত্র দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে রওনা হয়েছিলেন।

ঘটনার অসঙ্গতিগুলি বিশ্লেষণ করলে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করলে—এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ারের আসল উদ্দেশ্য ছিল—ফাঁকি দিয়ে কামরূপ দখল করা। এই পুরাতন রাজবংশটির বিপুল সেনাবাহিনীকে প্রকাশ্য যুদ্ধের মুখোমুখি না এনে—কোন প্রকারে এর রাজধানীতে প্রবেশ করে হঠকারী পথে সিংহাসন দখল করা। অপ্রস্তুত এবং অবিশ্বাস্য আকস্মিকতায় রাজার অস্থায়ী নিবাস নদীয়া দখল করে তিনি যে ভাবে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন, মতলব ছিল ঠিক তাই। এ ব্যাপারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ছিল—স্থানীয় এক মেচ-উপজাতীয় ব্যক্তির—যিনি পথ-ঘাটের বিশেষজ্ঞ হলেও বারে বারে গতিপথ পাল্টে ঠিক কামরূপ-রাজধানীর ৭ মাইল উত্তরে নিয়ে বখতিয়ারকে হাজির করলেন।

মীনহাজুদ্দীনের বর্ণনার সূত্র ধরেই বলা যায়—যাত্রার শুরুতে পথপ্রদর্শক আলি মেচ তাদের বর্ধনকোটে নিয়ে আসে, যার পাশ দিয়ে বেগমতী নদী প্রবাহিত ছিল। বর্ধনকোট বা মহাস্থানগড়ের সামনে কেবলমাত্র করতোয়া নদীই হতে পারে। মীনহাজ-এর বর্ণনা অনুসারে এই নদী মুসলিম-বাহিনী পার

হয়নি ; এর পশ্চিম পাড় বেয়ে দশদিন হেঁটে—এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে পৌঁছতে গেলে পাহাড় ও জঙ্গল পেরোতে হয়। দিনে আন্দাজ ২৫।৩০ কিলোমিটার করে অশ্বারোহী বাহিনীর চলা উচিত। তাহলে দশদিনে তাঁদের প্রাচীন করোতোয়ার পাড বেয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা—বর্তমান শিলিগুড়ি মহকুমার তিস্তা-সাঁকো ( করোনেসন ব্রীজ )-এর স্থানে। কিন্তু এই স্থানের আশে পাশে স্বর্ণমন্দির বা শিলা-সাঁকো পাওয়া যায় না। এই স্থানে হেঁটেই তিস্তা-করোতোয়ার ( তৎকালীন ) মুক্ত স্রোত পার হওয়া সম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ এখান থেকে আলি মেচ পূর্ব মুখে পাহাড়ী ও জঙ্গলময় পথে পনের দিন চলে অকুস্থলে পৌঁছান। পনের দিন উত্তর মুখে হাঁটলে তাঁরা তিব্বত ছাড়িয়ে যেতো। কিন্তু পনের দিন হেঁটে মুসলিম-সৈন্য একটি রাজ্যের সীমানাস্থিত প্রান্তিক দুর্গে পৌঁছতে পারেন। সম্ভবতঃ ইষ্টার্ণ ডুয়ার্সের কোন পথে আলি মেচ ভূটানে প্রবেশের একটি দুর্গকে দেখিয়ে দেন। 'তাবাকত-ই-নাসিরী'তে যে ধরনের "শিলা-সাঁকো" পেরিয়ে—মুঘল-সৈন্যের তিব্বতাভিযানের কথা বলা হয়েছে—সে ধরনের সাঁকো কেবলমাত্র একটিই ছিল, গৌহাটির ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পুষ্পভদ্রার তীরে। মনে হয়, এই সাঁকো পেরিয়ে উত্তর দিকে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল—সাময়িকভাবে কামরূপরাজকে বোকা বানাতে। লক্ষ্য করার বিষয়—যারা চীন ও তিব্বত জয়ে বেরিয়েছে, তারা একটি পাহাড়ী রাজ্যের প্রান্তিক দুর্গকে জয় করতে পারে না এবং দ্বিতীয় বার আক্রমণের চেষ্টাও করেন না ; উল্টে কামরূপ নগরীর দিকে ধেয়ে আসে। উত্তরবঙ্গ-আসামের বিপুল ভূখণ্ডের অধীশ্বর মহারাজ পৃথু কিন্তু এসবে ভোলেননি। বখতিয়ারের গতিবিধিকে তিনি প্রথম থেকেই নজর রাখছিলেন। বখতিয়ারের বাহিনী দক্ষিণ মুখে গতিপথ পরিবর্তন করতেই—মহারাজ পৃথুর সৈন্য তাঁর গতিপথ আটকায় এবং 'শিলা-সাঁকো' ভেঙ্গে দিয়ে মুসলিম-সৈন্যকে বিপাকে ফেলে দেয়।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটি প্রায় সকল ঐতিহাসিকই উপেক্ষা করে গেছেন। একজন বিপন্ন সেনানায়ক, সত্যিই যিনি অন্য দেশ আক্রমণ করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছেন এবং শুধু গৃহ প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য-মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন—ঘটনা এমন হলে পৃথুর পক্ষে বখতিয়ারকে আক্রমণের প্রশ্নই উঠতো না। যে রাজা বিদেশী সৈন্যকে তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও নিজের দেশাভ্যন্তরে ঢুকালেও—তাকে আক্রমণ করেননি, দেশের মধ্যে অন্ততঃ ১৫ দিন যাবৎ পথ পরিক্রমা

করে রাজধানীর নিকট ভূমি দিয়ে চলে গেলেও কিছু বলেননি এবং পরবর্তী বছর এক যোগে তিব্বতাক্রমণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তিনি হঠাৎ প্রত্যাবর্তনশীল ও রাজ্য থেকে বহির্গমনশীল বিদেশী সৈন্যকে হটকারিতায় হত্যা করবেন কেন? যদি পার্শ্ববর্তী রাজাকে বিনষ্ট করে তাঁর রাজ্য দখলের অভিলাষই থাকবে তবে বিধ্বস্ত বখতিয়ারের পশ্চাদ্ধাবন করে পৃথু নতুন ভাবে রাজ্যবৃদ্ধি করলেন না কেন? পূর্বোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পৃথু বহিরাগত মুসলিম সৈন্যের এমন কিছু মতলব টের পেয়েছিলেন যে, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হন।

## ৪. যুদ্ধের বর্ণনা ও পরিণতি

যুদ্ধের বর্ণনায় মীনহাজুদ্দীন নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন। যে পথে বখতিয়ারের সৈন্য প্রত্যাবর্তন করছিল—সে পথের দু'ধারে বসতি জনশূন্য এবং মনুষ্য ও পশুর খাদ্যও নষ্ট করে চলে গেছে লোকেরা। বিদেশী সৈন্য, যাঁরা যাত্রাপথে এ রকম জনতার অসহযোগ পাননি, তাঁরা প্রত্যাবর্তনের পথে এমন অদ্ভুত জন-প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন কেন? যাই হোক, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বখতিয়ার "শিলা-সাঁকো" দিয়েই পালানো সাব্যস্ত করেন। কিন্তু শিলা-সাঁকোতে গিয়ে দেখতে পান তার মধ্যস্তরের কয়েকটি আবরণ-পট পৃথুর সৈন্য কর্তৃক অপসারিত এবং পৃথুর সৈন্যই সাঁকোটি দখল করে বসে আছে। নদী পার হওয়ার উপায় না পেয়ে বখতিয়ার সসৈন্যে নিকটবর্তী একটি বৃহৎ হিন্দু-মন্দিরে আশ্রয় নেয়। হিন্দু সৈন্যগণ মন্দির আক্রমণ করলো না ঠিকই; কিন্তু তাঁরা বাঁশ দিয়ে মন্দিরের চার পাশ ঘিরে বেড়া দিতে লাগলো। অন্নবস্ত্রহীন স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার ভয়ে, বখতিয়ারকে একদিকের বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয় এবং বাঁচবার শেষ অবলম্বন—সাঁতরে নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্তই তাঁরা গ্রহণ করেন। বখতিয়ারের সৈন্য নদীতে নামলে অপর পার থেকে পৃথুর সৈন্যগণ ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে সাঁতাররত সৈন্য ও ঘোড়াকে নদীতে ডুবিয়ে দিতে থাকে। এইভাবে পুষ্পভদ্রার জলে ১০ হাজার সৈন্যের প্রায় সবটাই বিসর্জন দিয়ে, নেহাৎ সৌভাগ্যক্রমে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন বখতিয়ার।

ভাগ্যসন্ধানী এবং উচ্চাভিলাষী বখতিয়ারের নদীয়ার অভিযান তাঁকে

সুলতান করে তুলেছিল , কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় অভিযান তাঁকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন মুসলিম অভিযান এমন ভয়ঙ্করভাবে বিধ্বস্ত আর কখনো হয়নি। মীনহাজুদ্দীন লিখেছেন—কম বেশি একশত লোকমাত্র বেঁচে ফিরেছিল বখতিয়ারের সঙ্গে। দেবকোটে এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি, পরাজয়ের গ্লানি, নিহতদের পরিবারবর্গের কান্না ও অভিশাপে অক্ষম বখতিয়ার ভগ্ন হৃদয়ে তিন মাসের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। স্যার উস্‌লী হেগ এই ঘটনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, এর মত মর্মান্তিক পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি চাক্ষুষ করতে বেঁচে না থেকে যুদ্ধভূমিতেই তাঁব মরা ভালো ছিল। "Armies had been defeated but Ikhtiaruddin's force has been all but anihilated, and it would have been well for him to have prished with it" [ Cambridge History of India—Vol III, p-50 ].

## ৫. দ্বিতীয় মুসলিম আক্রমণের অন্তর্বর্তীকাল

১২০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম মুসলিম অভিযান ব্যর্থ হলে আশাহত বখতিয়ারের মৃত্যুতে তাঁর অনুচর ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরাম্ খিলজী ( ১২০৬-১২০৮ খৃ. ) এবং আলি মর্দান ( ১২০৮-১১ খৃষ্টাব্দ ) রাজত্ব করেন। আমীরদের ষড়যন্ত্রে আলি মর্দান নিহত হলে, সকলের সমর্থনে গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি দেবকোট থেকে লক্ষণাবতীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দেব-কোট থেকে বীরভূমের রাজনগর পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩০ কিলোমিটার রাস্তাও তিনি তৈরী করান। ১২১৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজ তৃতীয় অনঙ্গ ভীমদেবের সামন্ত বিষ্ণুদেব পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করলে ইউয়াজ সে আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিছুকাল পরে তিনি 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন এবং নিজ নামে 'খুদবা' পাঠ করান। ১২২৬ সালে তিনি কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ অভিযানে বের হন।

ইতিমধ্যে মহারাজ পৃথুর সম্বন্ধে কিছু পরিচয় তুলে ধরা যাক। এই বঙ্গজ রাজন্য, বৈদ্যদেবের বংশোদ্ভূত মহারাজ পৃথু আ. ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের সিংহাসনে বসেন। সমগ্র কামরূপ উপত্যকা এবং করোতোয়া ভূখণ্ড পৃথুরাজার অধিকারে ছিল। ইনি প্রজাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রিয় ছিলেন ; মুসলিম অভিযানের প্রথম যুদ্ধে জনসাধারণ যেভাবে নিজেদের খাদ্য ও পশু-খাদ্য

পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলে—বখতিয়ারের আতঙ্ক ও পরাজয় ঘটিয়েছিল—তার মধ্য দিয়ে পৃথুর প্রতি জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাই প্রমাণিত হয়। মীনহাজের বক্তব্যকে সত্য ধরলে—প্রথম মুসলিম সফল প্রতিরোধের পিছনে জনসাধারণের দানই সর্বাধিক। সে অর্থে এ যুদ্ধ ছিল বিদেশীদের বিরুদ্ধে রাজার ডাকে গণযুদ্ধ। মীনহাজ বলছেন, কামরূপরাজ সেই দেশের (স্থানের) সকল হিন্দুদের প্রতি আদেশ জারী করলেন যে, তারা যেন মুসলিম-দখলিত স্বর্ণ-মন্দিরের চারপাশে দলে দলে সমবেত হয়ে জনস্রোতের মত ঢলে পড়ে এবং চারিদিকের ঝোপ-ঝাড়ে যত বাঁশ আছে তা নিয়ে জড়ো করে এবং তাই দিয়ে মন্দিরের চারপাশে অবরোধ প্রাচীর গড়ে তোলে। [ Tabaquat-I-Nasiri by Reverty, vol, I, p-570 ]. মন্দিরের চারপাশে অতি দ্রুতগতিতে এই অবরোধের দেওয়াল গড়ে তুলতে পারাতেই বখতিয়ার মৃত্যু-ফাঁদে আটকে পড়েন। যাই হোক, রাজতন্ত্রের লড়াইয়ে জনসাধারণের এই সহযোগিতা মধ্যযুগে বিস্ময়কর এবং সেই সাফল্যের ভাগীদার জনপ্রিয় শাসক পৃথু।

### ৬. উত্তরবঙ্গ ও আসামে দ্বিতীয় মুসলিম অভিযান (আ. ১২২৬)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ, রাজধানী লক্ষণাবতীতে আপন ক্ষমতা সংহত করেন। তাঁর রাজত্বের ১৩শ বছরে উত্তরবঙ্গ ও আসাম অভিযানে প্রস্তুত হতে থাকেন। মীনহাজুদ্দীনের মতে ইউয়াজের সৈন্যবাহিনী প্রথমেই উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের অভিমুখে ধাবিত হয়। মীনহাজের মতে এই অভিযান পূর্ণ হয়নি—; পশ্চিম দিক থেকে দিল্লীর সৈন্য অগ্রসর হওয়ার খবর পেয়ে ইউয়াজকে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে আসতে হয়। কিন্তু সকল সৈন্য নিয়েই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। Raverty-র মতে কিছু সৈন্য কামরূপ অভিযানে রেখে তিনি লক্ষণাবতীতে ফিরে আসেন।

মীনহাজ এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নীরব; যুদ্ধ আদৌ হয়েছে কিনা, এমন কি মুসলিম সৈন্য রাজধানীর কাছাকাছি গিয়েছিল কিনা সে বিষয়েও তাঁর রচনা নীরব। তবে "History of Assam"-এর লেখক Gait পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, ইউয়াজের সৈন্যগণ কামরূপের কাছে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়েছিল। কামরূপের সৈন্যদের আক্রমণে পশ্চাদপসারণরত মুসলিম-সৈন্যের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যায় এবং তারা এত দুর্বল হয়ে

পড়ে যে নাসিরুদ্দীনের আক্রমণ প্রতিহত করবার সামান্যতম যোগ্যতাও তখন তারা হারিয়ে ফেলেছিল। নাসিরুদ্দীন ইউয়াজকে সহজেই পরাজিত ও পরে হত্যা করেন।

ইউয়াজের কামরূপ আক্রমণের সময়ও মহারাজ পৃথুই সেখানকার রাজা। সুতরাং দ্বিতীয় মুসলিম অভিযানের সফল প্রতিরোধের কৃতিত্ব মহারাজ পৃথুরই প্রাপ্য।

## ৭. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ও তৃতীয় মুসলিম অভিযান ( ১২২৮ )

দিল্লীর সম্রাট ইলতুতমিসের পুত্র ও প্রতিনিধি নাসির, ইউয়াজকে পরাস্ত করে ( ১২২৭ ) লক্ষণাবতী দখল করলে গৌড়-বঙ্গ সরাসরি দিল্লী সুলতানের শাসনাধীনে আসে। দিল্লী সুলতানের সাহায্য সৈন্যবল ও প্রত্যক্ষ মদতে বলীয়ান নাসিরুদ্দীন সহজেই ইউয়জকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি ইউয়জের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে উদ্যত হলেন অর্থাৎ লক্ষণাবতীর দোরগোড়ায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গ ও আসামে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করলেন। হয়তো বা কাফের হিন্দুরাজার পূর্বতম দুই দুইবার মুসলিম বিপর্যয়ের পাপের শাস্তি প্রদান করতেই তিনি এই অভিযানে আগ্রহী হতে পারেন। কারণ ইতিমধ্যেই ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে অযোধ্যার শাসন-কর্তারূপে তিনি ধর্মযুদ্ধে কাফেরদের হত্যা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। [ তবাকাৎ-ই-নাসিরী অনু রিভার্টি ১ম খণ্ড পৃ. ৬২৮ ]। মহারাজ বৃতু<পৃথু ছিলেন এদিক থেকে ধর্মযুদ্ধে নামার মত যোগ্য প্রতিপক্ষ। কারণ—মীনহাজের মতে এই কাফের—পূর্ববর্তী দুই দুইটি মুসলিম অভিযান ব্যর্থ করতে ১,২০,০০০ মুসলমানের প্রাণ সংহার করেছেন। কাফের পৃথুর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশই যে নাসিরুদ্দীনের অভিযানের মৌল প্রেরণা ছিল—তা পরবর্তী ঘটনাতেও প্রকাশ পাবে।

নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শক্তিশালী সৈন্য ও ব্যাপক প্রস্তুতি অভিযানের যোগ্য মোকাবিলা করার জন্য ৩২ বছর রাজত্বের মেয়াদে বৃদ্ধ পৃথুবীর কিন্তু ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন গড়ে তুললেন। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ তাকে করতে হয়েছে কামরূপের উপকণ্ঠে। কিন্তু যুদ্ধ রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা রাজত্বের নিরাপত্তার দিক দিয়ে বেশি প্রয়োজন বলে তিনি তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা

জুড়ে ব্যাপকভাবে 'গড়' গড়ে তুলতে লাগলেন। Glazier-এর Report on the District of Rangapur ( p-8 ) পৃথুরাজা কর্তৃক তৈরী গড়গুলির পরিচিতি পাওয়া যাবে।

বৃদ্ধবয়সেও মহারাজ পৃথু অগ্রবর্তীতম গড়ে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজালেন এবং নিজেই তা তদারকী করতে রইলেন। রাজধানীর ভার পুত্র সন্ধ্যা রায়ের হাতে ছেড়ে তিনি বর্তমান জলপাইগুড়ি ও রংপুরের সীমানাস্থিত পঞ্চগড়ে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পঞ্চগড়ের বৈশিষ্ট্য হলো—একটি গড়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতর আরো চারটি গড়ের অস্তিত্ব। প্রতি দিকে প্রায় তিন মাইল নিয়ে পঞ্চগড়ের বাইরের প্রাচীর যা কৃষ্ণমৃত্তিকার, তারপরে জনশ্রুতি অনুসারে চতুষ্কোণ বালির প্রাচীর, তার মধ্যে বাঁশ দিয়ে তৈরী প্রাচীর। তার মধ্যে কাঠ দিয়ে তৈরী প্রাচীর এবং সর্বশেষে রাজপরিবারের আরক্ষার জন্য ইটের ও পাথরের তৈরী প্রাচীর। এই পর পর পাঁচটি প্রাচীরে আরক্ষিত পঞ্চগড়ের মধ্যেই ছিল—দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের জন্য রক্ষিত খাদ্য-ভাণ্ডার এবং জলের জন্য বিশাল পুষ্করিণী। ইট ও পাথরে গাঁথা প্রাচীরে আরক্ষিত অংশটিকে ভিতরগড় বলা হতো—সেই শব্দের ব্যাত্যার্থে এখন পুরো গড়টাকেই ভিতরগড় বলা হয়।

রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে দুর্গ তৈরী করেও এবং স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেও মহারাজ পৃথু—যিনি দুই দুইবার মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ করে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তিনি নাসিরুদ্দীনের হাতে পরাজিত হলেন। পঞ্চগড়ের প্রতিরক্ষা ব্যূহ যখন একে একে ভেঙ্গে পড়লো, সৈন্য-সামন্ত যখন আত্মরক্ষায় পলায়মান, তখন এই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাজা, যিনি কখনো কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি, 'অস্পৃশ্য যবন'দের হাতে বন্দী হবার অপমানকে এড়াবার জন্য গড়ের মধ্যবর্তী পুষ্করিণীতে ডুবে প্রাণ বিসর্জন দেন। স্বাধীনতা-প্রিয় এই রাজার আত্মবিসর্জনে নাসিরুদ্দীনের চিত্ত বোধকরি বিগলিত হ'ল। প্রাথমিক জয়কে অনুসরণ করে তিনি রাজধানী কামরূপের দিকেও ছুটে গেলেন না, বা উত্তরবঙ্গের বিপুল ভূখণ্ডের অংশবিশেষও দখল করলেন না—তিনি এই স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষা করলেন। তিনি সন্ধি করবার জন্য মহারাজ পৃথুর পুত্র সন্ধ্যাকে ডেকে পাঠালেন। পিতৃবিয়োগে শোকাহত, প্রাথমিক যুদ্ধে পরাজিত সন্ধ্যা নিয়মিত কর-দানের শর্তে তখনকার সন্ধি চুক্তি মেনে নিলেন। বিজয়ীর সামনে দাঁড়িয়ে তাছাড়া আর তিনি কী করতে পারতেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিস্থিতিকে সামলে নেবার জন্য তিনি বোধহয় সন্ধি করে সময়টুকু চাইছিলেন। কর তিনি এক বছরও দেননি। নাসিরুদ্দীন লক্ষণাবতীতে পৌছবার আগেই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পৃথুর পুত্র সন্ধ্যা রায় শুধু স্বাধীনতাই ঘোষণা করলেন না—তিনি নিজেই গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। অতএব দেখতে পাচ্ছি যে, কাফেরের শাস্তির জন্যে এই যুদ্ধোদ্যম—সে কাফের নিজেই আত্মহত্যা করে আপনার শাস্তিবিধান করায়—দেশটি মুসলিম দখলের ( annexation ) হাত থেকে বেঁচে গেল। নিজের মৃত্যু দিয়ে পৃথু তাঁর রাজ্যকে স্বাধীন রেখে গেলেন। সেই অর্থে মুসলিম যুগের প্রথম পর্বে তিন তিন আগ্রাসী অভিযানের হাত থেকে উত্তরবঙ্গ ও আসামের স্বাধীনতা রক্ষার কৃতিত্বে মহারাজ পৃথু স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( দশম অধ্যায় )

1. The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India—R. M. Martin.
2. History of Bengal—C. Stewart.
3. History of Bengal—Vol-II—I. N. Sankar (rd).
4. History of Bengal—R. C. Mazumdar (rd).
5. Tabazat-i-Nasiri— Minhaj-ud-din Siraj. ( Tr. H. G. Raverty )
6 Cambridge History of India—Vol-III—W. Haig.
7. History of Assam—E. Gait,
8. Easter India—Vol-V—Martin.
9. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—রমেশচন্দ্র মজুমদার (সং)
10. বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়

# একাদশ অধ্যায়

# প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ( ১২২৮-১৫১৫ )

## স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য কামতাপুর

### ক. মহারাজ পৃথুর বংশধরদের শাসন

#### ১. মহারাজ সন্ধ্যা ও কামতাপুরীয় শাসনের সূত্রপাত

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে—পঞ্চগড়ের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, তাৎক্ষণিক কৌশল হিসেবে পৃথু-পুত্র সন্ধ্যা রায় নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন, বার্ষিক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে। কিন্তু চিরকালের স্বাধীনতা-প্রেমী উত্তরবঙ্গ ও কামরূপীয় রাজন্যদের একজন হয়ে, বিশেষতঃ মহারাজ পৃথুর পুত্র হয়ে, সন্ধ্যা রায়ের পক্ষে এই চুক্তি মেনে চলার প্রশ্নই ছিল না। নাসিরুদ্দীন সসৈন্যে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি এর পরিণতিস্বরূপ পুনর্বার মুসলিম আক্রমণ অনিবার্য জেনে দ্রুতগতিতে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর পিতৃদেব উত্তরবঙ্গে মুসলিম-রাজ্যের সীমানা জুড়ে ব্যাপকভাবে দুর্গ গড়ে তুলছিলেন; কিন্তু সন্ধ্যা পাকাপাকিভাবে রাজধানী কামরূপ থেকে না সরালেও, মূল প্রশাসন ব্যবস্থাটি তুলে আনলেন আধুনিক কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় কামতাপুরে। কামতাপুরে শাসকীয় আবাস ও শাসনের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হলে—পূর্ব-দক্ষিণ, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব তিন দিকের যে দিক থেকেই মুসলিম আক্রমণ হোক না কেন, সে ব্যাপারে প্রত্যক্ষ, সুনিয়ন্ত্রিত ও তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। সেই কারণে সন্ধ্যার এই সমরনৈতিক সিদ্ধান্ত পরবর্তী দু'শ বছরের রাজন্যগণই উপকারমূলক বলে গণ্য করেছেন এবং প্রায় দীর্ঘ দু'শ বছর প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ ও আসামের শাসন কামতাপুর থেকেই পরিচালিত হয়েছে।

সন্ধ্যা যত তাড়াতাড়ি মুসলিম আক্রমণ আশা করেছিলেন তা হ'ল না। রাজধানী লক্ষ্ণণাবতীতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১২২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। রাজধানী গৌড়ে শাসকীয় ক্ষমতার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হলো। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

গিয়াসুদ্দীন খিলজীর দলভুক্ত ইক্তিয়ারুদ্দীন বলকা নামক একজন খিলজী মালিক লক্ষণাবতী দখল করে নেন এবং আঠারো মাস রাজত্ব করেন। ১২৩০ খৃ. নভেম্বরে সুলতান ইলতুতমিস তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে আলাউদ্দীন জানিকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ফিরে যান (১২৩১ খৃ.) দিল্লীতে। এক বছর পরেই তিনি আবার আলাউদ্দীন জানিকে সরিয়ে নিয়ে —সইফুদ্দীন আইবককে শাসনকর্তারূপে নিয়োগ করেন।

রাজধানী লক্ষণাবতীর এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যা রায় প্রথমেই কামতাপুর রাজ্য থেকে মুসলমান সৈন্য ও নাগরিকদের বিতাড়িত করে মুসলিম অধিকারের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দেন। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষী হিন্দুরাজা, পিতার পরাজয়ের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে নিজেই গৌড়রাজ্যের পূর্ব-সীমানা আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য লক্ষণাবতীর সৈন্যদের নিকট থেকে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ না পেয়ে তিনি করোতোয়া পূর্ব গৌড়রাজ্য দখল করে নেন এবং 'গৌড়েশ্বর' উপাধিও গ্রহণ করেন। [ History of Bengal—By Dacca University p.-143 ] তা সত্ত্বেও লক্ষণাবতী থেকে তাৎক্ষণিক কোন প্রতি-আক্রমণ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কারণ এই সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে নবজাগ্রত হিন্দুরাজ্য ( চন্দ্রদ্বীপের ) রাজা দশরথ দনুজ মাধবের নেতৃত্বে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ওড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ লক্ষণাবতীর রাজ্যাংশ ছিনিয়ে নিতে শুরু করেছে। তাছাড়া রয়েছে—শাসকশ্রেণীর মধ্যে কলহ ও বৈরিতা।

সন্ধ্যা রায় আনুমানিক ১২৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর বিস্তৃত রাজ্য নির্দ্বন্দ্বে ভোগ করে যাচ্ছিলেন। হয়তো এই সময়ে রাজা স্বয়ং প্রশাসনের প্রধানদের নিয়ে মূল রাজধানীতে ফিরে আসেন ; কামতাপুর প্রধান সৈন্যাবাসরূপে পড়ে থাকে। কিন্তু নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাঁর হলো না। জীবনের শেষভাগে তাঁকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলো।

## ২. চতুর্থ মুসলিম অভিযান ( ১২৫৭ খৃ. )

আগেই বলা হয়েছে—রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্যে লক্ষণাবতী ক্ষমতাবান মুসলিম শক্তি কামরূপের রাজ্য বিস্তারে বাধা দান করতে পারছিল না। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু থেকে ১২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২১ বছরে আট

জন 'গৌড়েশ্বর' পাল্টে গেলেন। তা থেকেই গৌড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সম্যক্ অনুধাবন করা যায়। কিন্তু ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মালিক ইক্তারুদ্দীন উজবেক-এর সিংহাসন আরোহণে লক্ষণাবতীতে বেশ কিছু সময়ের জন্য (১২৫৭ খৃ. পর্যন্ত) রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হয়। তিনি শক্তিশালী শাসক্ ছিলেন। তিনি রাঢ় দখল করেন। বিহার তাঁর শাসনাধীন ছিল। ইতিমধ্যে তিনি অযোধ্যাও দখল করে নেন। এইভাবে লক্ষণাবতীর শাসনাধীন এলাকা বিস্তৃত করে এবং নিজেকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি লক্ষণাবতীর দীর্ঘকালীন শত্রু কামরূপ-রাজ সন্ধ্যা রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে অদ্ভুত সামরিক প্রতিভায় সীমান্তপ্রদেশের দুর্গগুলিতে এগিয়ে গিয়ে তিনি সোজা রাজধানী কামরূপের দ্বারে হাজির হন। পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তনে এবং উজবেকের এই বিশাল বাহিনীকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরাস্ত করা একান্ত অসম্ভব জেনে, সন্ধ্যা রায় গভীরতর অভিসন্ধি ও সামরিক কৌশল অবলম্বন করে—পরিবারবর্গ, সৈন্যসামন্ত এবং বাজকর্মচারীদের নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন। পরিত্যক্ত নগরীতে উজবেক বিজয়ী বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করলেন; প্রবেশ করলেন মৃত্যুগুহায়।

সন্ধ্যা প্রথমে উজবেককে করদানের প্রতিশ্রুতিতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব পাঠান। উজবেক সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ তিনি জানতেন এটা সন্ধ্যা রায়ের কূটনৈতিক চাল, যে চাল চেলে তিনি ইতিপূর্বে নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে বোকা বানিয়েছিলেন। কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ হ'লো দেখে—এই স্বাধীনতাকামী ও সুযোদ্ধা রাজা সন্ধ্যার পক্ষে খোলা রইল, সামরিক শক্তিতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা। নিজের সৈন্য সংখ্যায় গৌণ জেনে, তিনি জনসাধারণকে যুক্ত করলেন—এই সংগ্রামে। ইতিপূর্বে মহারাজ পৃথুও তাই করেছিলেন—প্রথম মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধের সময়।

তিনি জনসাধারণকে রাজার পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করলেন; জনসাধারণের সব শস্য রাজভাণ্ডারে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হলো, যাতে বাজার থেকে কোনো শস্যের যোগান উজবেক না পান; গৃহস্থের উদ্বৃত্ত শস্য তিনি কিনে নেন বেশি দামে—যাতে লুণ্ঠন করেও গ্রামে গঞ্জে খাদ্য না পায় বিদেশী দখলদার। পশুখাদ্য যা ছিল—সব পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন সন্ধ্যা; যাতে বিজয়ীদের ঘোড়া, হাতী ও খচ্চর কোন পশুখাদ্য না পায়। ইতিহাস রচনাকারী

জনপ্রিয় রাজা পৃথুর পুত্র সন্ধ্যারায়কে জনসাধারণ দাবীর অনুরূপ সহযোগিতা দান করে। নিজের অন্নসংস্থান রাজার হাতে তুলে দিলেন তাঁরা; নিজেদের পশুখাদ্য পুড়িয়ে দিলেন—সিংহাসনচ্যুত রাজার কথায়। দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য জনসাধারণের এই আত্মস্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যাই হোক—একদিকে যখন শস্য-সংগ্রহ, পশুখাদ্য পুড়িয়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে, রাজ্যব্যাপী নদী-বাঁধ কেটে দিয়ে—গণযুদ্ধে জনসাধারণকে সামিল করে সন্ধ্যারায়—উজবেকের মৃত্যুব্যূহ তৈরী করেছিলেন—মালিক উজবেক তখন বিনা আয়াসে নতুন জয়ের আনন্দে, অসংখ্য ধনরত্ন লাভের সৌভাগ্যে এবং নিয়মিত খুৎবা পাঠের প্রশস্তিতে কামরূপ রাজধানীতে কালক্ষেপ করছিলেন। কিছুদিন পরে বর্ষাকাল শুরু হতেই সন্ধ্যারায়, তাঁর সৈন্যবাহিনী ও গ্রামীন মানুষদের নিয়ে চারিদিকের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দিয়ে, বাঁধা-কাটা বন্যার জলে পালাবার পথ রুদ্ধ করে এবং অন্নহীন অবস্থায় অবরুদ্ধ নগরীর সৈন্যদের—মৃত্যুদশা তৈরী করে—তীরন্দাজবাহিনী নিয়ে ঘিরে ধরলেন উজবেককে। প্রধানতঃ অনাহারে মৃত্যুর অনিবার্যতা এড়াতেই উজবেককে পলায়নে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু রাস্তা বন্ধ।

পূর্বোক্ত কাহিনী-সূত্র সবই সমসাময়িক লেখক মীনহাজুদ্দীনের তবাকৎ-ই-নাসিরী থেকে গ্রহণ করা হলেও এবার সরাসরি ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমেই মীনহাজুদ্দীনের বক্তব্য শোনা যাক—"The route through the plain was flooded with water, and occupied by the Hindus. The Musatmans oblained a guide to bring them out of that country by conducting them towards the shirts of mountains. After they have proceeded some few stages, they got entangled among passes and defiles, and narrow roads, and both their front and rear was seized by the Hindus. In a narrow place a fight took place in front of the leading rank between two elephants; the force fell into confusion, the Hindus come upon them from every side, and Musalman and Hindu mingled pell mell together. Suddenly an arrow struck Malik Yuz-Bak, who was mounted on an elephant, in the breast, and

he fell, and was made prisoner ; and all his children, family and he dependants, and the whole of his force, were made captive."

আহত মালিক উজবেগকে রাজা সন্ধ্যার সামনে আনা হলে—তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছারূপে নিজ পুত্রের মুখ দর্শন প্রার্থনা করলেন। তাঁর পুত্রকে সামনে আনা হলে পুত্রের মুখে মুখ রেখে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন। বখতিয়ার কামরূপ থেকে অন্ততঃ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিলেন—কিন্তু উজবেকের সবংশ নিধন তো হলোই, বাংলা-বিহার-অযোধ্যার শাসনকর্তার সমগ্র সৈন্য-বাহিনীও এই নিষ্ফল অভিযানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

## ৩. মহারাজ সিন্ধু ও তাঁর বংশধরগণ

পুরোপুরি ৩২ বছর রাজত্বের পর সন্ধ্যারায়ের মৃত্যুতে তৎপুত্র সিন্ধু কামতাপুর রাজ্যের রাজা হন [ ১২৬০ খৃ. ]। তাঁর আমলের সবচেয়ে বড় ঘটনা অহম-রাজ্যের শক্তিমান প্রতিষ্ঠাতা 'সুকফা'র কামরূপ আক্রমণ। প্রচণ্ড শক্তিতে বিকাশমান এই অহম-রাজশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে মহারাজ সিন্ধু সুবিধা করে উঠতে পারছিলেন না। বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে মুসলিম আক্রমণের সম্ভাবনা ও চাপ সর্বদাই কামতাপুর রাজশক্তিকে ব্যাপৃত করে রেখেছিল। অগত্যা সমধর্মীয় সুকফার সঙ্গে সামান্য করদানের চুক্তিতে সন্ধিবদ্ধ হয়ে, পূর্ব সীমান্তকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে সিন্ধু পশ্চিম সীমান্তকে আরো বেশি সুরক্ষিত করে তুলতে মনোনিবেশ করেন।

তাঁর আমলে মুসলিম আক্রমণ হয়েছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মনে সন্দেহ রয়েছে। "রিয়াজ-উস্-সালাতিন্" নামক গ্রন্থের বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে—১২৭৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা মুঘীশউদ্দীন কামতারাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু অন্য কোন নিরপেক্ষ তথ্যের সাহায্যে উক্ত কাহিনী সমর্থিত হয়নি বলে এবং 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এর কাহিনী সর্বত্র বিশ্বাস-যোগ্য নয় বলে, মুঘীশউদ্দীনের ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণের কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হ'ল না। উক্ত গ্রন্থে মুঘীশউদ্দীনের পরাজয়-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যাই হোক—সিন্ধুরায়ের আমলে কামতাপুর-রাজ্যের যে প্রাথমিক শক্তিময় ও অবমাননা সহ্য করতে হয়—অহমদের কাছে; পরবর্তী অহমরাজ 'সুকফা'-র শান্তিপূর্ণ শাসনে তা দূরীভূত হয়। পশ্চিমভাগে বিধর্মীদের

আক্রমণ রোধে সিন্ধু পূর্বভাগে স্বধর্মীদের কাছে নতি স্বীকার করে নিয়েছিলেন সামরিক সুবিধার স্বার্থে; কিন্তু যখন পশ্চিম থেকে তেমন কোনো বিপদ দেখা গেল না, তিনি তখনি অহমদের করদানে বিরত হলেন ( সম্ভবতঃ ১২৬৮তে, অর্থাৎ সুকফার মৃত্যুতে ) এবং "রাজ-রাজেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করলেন ( গুরুচরিত দ্রঃ )।

সিন্ধুর মৃত্যুতে—তৎপুত্র রূপনারায়ণ ( আ. ১২৮৫-১৩০০ ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জানা যায় না। রূপনারায়ণের মৃত্যু হলে—তাঁর পুত্র সিংহধ্বজ রাজা হন (১৩০০-১৩০৫ খৃ.)। মাণিক নামে তাঁর জনৈক মন্ত্রী ছিলেন—জাতিতে কায়স্থ। এই মাণিকই সিংহধ্বজকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করার পর "প্রতাপধ্বজ" উপাধি গ্রহণ করেন এবং কামতাপুরে নতুন রাজবংশের শাসনের প্রবর্তন করেন।

## খ. কামতাপুরে প্রতাপধ্বজ-বংশীয় রাজত্ব

### ১. প্রতাপধ্বজের শাসন ( ১৩০৫-১৩১৫ ) : কায়স্থ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বৈদ্যদেব-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে কায়স্থ প্রতাপধ্বজ সিংহাসনে আরোহণ করলেও অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এই সময় রাজ্যের পূর্বভাগে অহমরাজ সুখংফা প্রবলভাবে হানা দেন। কয়েক বছর ধরে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ করেও যখন উভয় পক্ষে কিছু জয়-পরাজয় হল না, তখন প্রতাপধ্বজ আপন কন্যা রজনীকে সুখংফার হস্তে সমর্পণ করে সন্ধি স্থাপন করেন [ অহম বুরুঞ্জি—পৃ. ১৫ ]।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ময়মনসিংহে এবং নওগাঁতে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের কয়েকটি ১৩২১ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে। তা থেকে অনেকে মনে করেছিলেন ১৩২১-২২ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন উত্তরবঙ্গ আসাম বিজয় করেছিলেন এবং নওগাঁ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এটি এখন একটি বাজে কল্পনা বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। গিয়াসুদ্দীন এই সময় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই ধরনের অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় উত্তরবঙ্গ বা আসাম বিজয়, যা ইতিপূর্বে কোন মুসলমান শাসককর্তৃক সম্ভব হয়নি, গিয়াসুদ্দীন তা করতে পারলে প্রাচীন

মুসলিম ইতিবৃত্তিগুলিতে অন্ততঃ তার উল্লেখ থাকতোই। কিন্তু সেখানে এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। অতএব প্রতাপধ্বজের সময় তাঁর রাজ্যে কোন মুসলিম আক্রমণ হয়নি এ কথা স্থাপিত হয়েছে। প্রতাপধ্বজের মৃত্যু পর্যন্ত অহমদের সঙ্গেও শান্তি ও সৌহার্দ্য রক্ষিত ছিল।

## ২. কায়স্থ-শাসনের সাময়িক অবলুপ্তি

প্রতাপধ্বজ-প্রতিষ্ঠিত কায়স্থ রাজবংশ আকস্মিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য লুপ্ত হয়। কারণ প্রতাপধ্বজের মৃত্যুতে (১৩২৫ খৃ.) পূর্বতন রাজবংশের অর্থাৎ বৈদ্যদেবের বংশধর ধর্মনারায়ণ আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল করেন (১৩২৫ খৃ.)। কেউ কেউ একে প্রতাপধ্বজের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলে মনে করেন, তা ঠিক নয় [ গুণাভিরামের আসাম বুরুঞ্জি পৃ. ৪৮ ]। কেউ কেউ একে পূর্ববঙ্গের রায় দনুজারিদেবের বংশধর মনে করেছিলেন; কিন্তু দনুজারি বা দনুজমর্দনদেবের বংশ-লতিকায় ধর্মনারায়ণ নামে কাউকে পাওয়া যায় না। একাধিক দিক বিচার করে ধর্মনারায়ণকে মহারাজ সিন্ধুর (পুত্র বা) উত্তরাধিকারী বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে [ Acharya's History of Medieval Assam p-156-57 ]

ধর্মনারায়ণের সিংহাসন দখল কিন্তু প্রতাপধ্বজের মত অনায়াসে সম্পূর্ণ হ'ল না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ পূর্বভাগে স্থানীয় শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহ করলেন এবং ধর্মনারায়ণকে বেশ কিছুকাল ধরে যুদ্ধ করে সে বিদ্রোহ দমন করতে হয়। রাজ্যে নিজ দখল স্থাপিত করে তিনি গৌড়াঞ্চলে সম্ভবতঃ কিছু রাজ্যও জয় করেন এবং "গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করেন। বিস্তৃত রাজ্যের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানা জুড়ে তিনি অনেকগুলি শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলেন। তিনি কামতাপুর থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন 'ডিমলা'তে যা আধুনিক রংপুর জেলায় পড়েছে।

কিন্তু রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজধানী নিয়ে আসায় এবং সে দিকেই বেশি সামরিক দৃষ্টি দেওয়ায় রাজ্যের পূর্বভাগে, প্রতাপধ্বজের পুত্র দুর্লভনারায়ণ ব্যাপক বিদ্রোহ গড়ে তুলতে সময় পেলেন। রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে স্থানীয় ভূঁইয়া-গণকে উত্তেজিত করে দুর্লভনারায়ণ নিজে বিদ্রোহের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ধর্মনারায়ণ ও দুর্লভনারায়ণের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর, জয়-পরাজয় চূড়ান্ত না

হওয়ায়, দু'জনের মধ্যে আপসে রাজ্য ভাগ করে নেওয়া হয়। এতে কামতাপুর-সহ রাজ্যের পূর্বভাগ পেলেন দুর্লভনারায়ণ এবং তৎব্যতীরেকে অপর রাজ্যাংশ যথা, ময়মনসিং থেকে রংপুর পর্যন্ত ভূভাগ পেলেন ধর্মনারায়ণ।

রাজ্যের অর্ধেক ছেড়ে দিয়ে তড়িঘড়ি এই সন্ধির পিছনে একটি কারণ ছিল। দিল্লীর শক্তিশালী সম্রাট মহম্মদ তুঘলক তখন ভারতের চারিদিকে অবাধ্য ও অনমুগত রাজন্যদের দমনে চারিদিকে অভিযান শুরু করেছেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে তুঘলকের সৈন্যগণ বঙ্গের দিকে রওনা হলে ধর্মনারায়ণ রাজ্যের পশ্চিম সীমায় বিপদের আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি সন্ধি করে আপন রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় ঘোড়াঘাটে এসে পৌছলেন। তুঘলকী সৈন্যের এই গৌড় অভিযানের মধ্যেও ধর্মনারায়ণের রাজ্যনাশের কী উপাদান ছিল—তা জানা যায়নি। তবে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ধর্মনারায়ণের রাজত্বের শেষ হয় এবং সম্ভবতঃ তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ ভূভাগ কামতাপুর শাসনে চলে যায়। ধর্মনারায়ণের পুত্র তাম্রধ্বজের হাতে রইল কেবল ঘোড়াঘাট। গেইটের মতে তাম্রনারায়ণের পুত্র ধর্মনারায়ণ, পৌত্র পদ্মনারায়ণ, প্রপৌত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি উত্তরপুরুষগণ উত্তরবঙ্গের এক বৃহত্তর ভূখণ্ডের শাসকরূপে টিকে ছিলেন। কিন্তু গেইটের বক্তব্যের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

## ৩. দুর্লভনারায়ণ ( ১৩৩০-৫০ )

দুর্লভনারায়ণ প্রতাপধ্বজের যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং এই বংশের অন্যতম প্রতাপশালী রাজা। তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃরাজ্য লাভ করেননি। তাঁকে ভূঁইয়া-বিদ্রোহ করাতে হয়েছে। অংশ-রাজ্যে খুশী না থেকে ধীরে ধীরে তিনি ধর্মনারায়ণের রাজ্য করায়ত্ত করেছেন। ঠিক এই সময় অহমরাজের সঙ্গে আকস্মিকভাবে তিনি বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। অহমরাজের পুত্র 'চাও পুলাই' যে দুর্লভনারায়ণের আপন ভাগনে, সিংহাসন-লোভে পিতৃদ্রোহী হয়ে পরাজিত ও বিতাড়িত অবস্থায় মাতুল দুর্লভনারায়ণের কাছে আশ্রয় নেয়। সারিঙ রাজা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ যুবরাজ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সিংহাসনে না বসাবার মতলবের প্রতিবাদেই 'চাও পুলাই'-এর এই বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের সমর্থনে দাঁড়ালেন দুর্লভনারায়ণ। তিনি সসৈন্যে অহমরাজ্যে উপনীত হলেন 'চাও পুলাই'কে সিংহাসনে বসাতে। সেটা ১৩৩২ সালের কথা। দুর্লভ-

নারায়ণ সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে "আটগাঁও" দখল করে নেন এবং সেটিকে দুর্গে পরিণত করেন। আটগাঁও-এর পর সারিন দুর্গ দখল করার সময় তিনি দুঃসংবাদ পান যে, দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তুঘলকের এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য কামতাপুর আক্রমণে এগিয়ে আসছে। সংবাদ পেয়ে তিনি অহমরাজের সঙ্গে এক তরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করলেন, অবরুদ্ধ রাজ্যাংশ ছেড়ে দিয়ে শান্তিচুক্তি করলেন এবং অহমরাজ আপন রাজ্য আক্রমণকারী দুর্লভনারায়ণের প্রতি কোন ক্ষোভ না রেখে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে, মুসলিম আক্রমণের মুখে স্বধর্মী রাজা দুর্লভনারায়ণকে সাহায্য করতে তাঁর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিকে প্রেরণ করলেন। যুদ্ধমান দুই হিন্দুরাষ্ট্র, মুসলিম আক্রমণের মুখে যুদ্ধক্ষেত্রেই শান্তিচুক্তি করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহিরাগত শত্রুর দমনে অগ্রসর হওয়ার এই চমৎকারিত্ব পূর্ব দৃষ্টান্ত সারা ভারতের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

## ৪. প্রান্তিক-উত্তরবঙ্গে পঞ্চম মুসলিম অভিযান

পূর্বেই বলা হয়েছে, সম্রাট মহম্মদ তুঘলক দিল্লীর সিংহাসনে বসেই চারিদিকে অননুগত রাজ্যগুলিকে অধীনস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এই সেই মর্মে ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়বঙ্গ দখল করেছিলেন। সেই থেকেই দিল্লীর শাসন দুর্লভ-নারায়ণের রাজ্য-সীমায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু বিগত চার বছর ধরে মুসলমানগণ কামতাপুর আক্রমণ করেননি বোধকরি উপযুক্ত সুযোগের অভাবে। দুর্লভ-নারায়ণের অহমরাজ্য অভিযানে সেই প্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল। তা সত্ত্বেও কামতাপুরের অরক্ষিত রাজধানী দখলে বিশাল সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী যার মধ্যে এক লক্ষই অশ্বারোহী এই অভিযানে প্রেরিত হল [ Mughal North East Frontier Policy-S. N. Bhattarcharya p-61 ].

ময়মনসিংহের দিক থেকে কামতাপুর আক্রমণ করা হয়। এনায়েৎপুরের ( ময়মনসিং ) আশেপাশে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দের তারিখ যুক্ত মহম্মদ তুঘলকের কিছু মুদ্রা—সে কথা প্রমাণ করেছে। তাছাড়া রয়েছে আলমগীর-নামার সাক্ষ্য। আলমগীর-নামায় এই যুদ্ধের বিবরণ স্পষ্ট দেওয়া হয়েছে—[পৃ. ৭৩১ দ্রষ্টব্য] এবং তা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, সম্রাটের এই বিশাল সেনাবাহিনী দুর্লভনারায়ণের রাজধানীতে প্রবেশ করার আগেই দুর্লভনারায়ণ অরক্ষিত

রাজধানীতে ফিরে আসতে পারেন এবং প্রতিরোধের জন্য এক শক্তিশালী বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মহম্মদ তুঘলকের বিশাল সেনাবাহিনী শুধুমাত্র পরাজিত হয় তাই নয়, সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অপ্রত্যাশিত ও ভয়াবহ পরাজয় ও বিনষ্টিতে মর্মাহত দিল্লী-সম্রাট প্রতিশোধ নিতে ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বের অনুরূপ আরেকটি অভিযান প্রেরণ করেন। এবার তুঘলকী সৈন্যরা পরিচালিত হয়—উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে। কিন্তু ইতিমধ্যে কামতাপুরের যোদ্ধাদের বীরত্বের খ্যাতি ও স্মৃতি মুসলিম-সৈন্যদের মধ্যে এমন একটি ভয়ের দৃঢ়বদ্ধ অনুভূতি জন্মিয়ে দিয়েছিল যে—এবারে তারা আরো অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে পলায়ন করলো। আলমগীর-নামার ভাষায়—তারা বঙ্গে ( উত্তরবঙ্গে ) প্রবেশ করার সাথে সাথেই—কেমন যেন বিভীষিকা-তাড়িত ভয়কম্পিত হয়ে পড়লো যে, অভিযান ত্যাগ করে পালানো ছাড়া পথ রইলো না।' ( আলমগীর-নামা পৃ. ৭৩১ ) এর থেকে মনে হয়—সীমান্ত অঞ্চলে কামতাপুর সৈন্যদের প্রাথমিক আক্রমণেই তুঘলকের সেনাবাহিনী ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করে।

উত্তরবঙ্গে মুসলিম অভিযানের পঞ্চম বিশিষ্ট উদ্যোগও এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। এরপর অবশ্য দুর্লভনারায়ণের জীবৎকালে আর কখনো মুসলিম আক্রমণ হয়নি এবং তিনি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ( ১৩৫০-১৩৬৫ ) কামতারাজ্য এই বংশের হস্তচ্যুত হয়।

## গ. অরিমত্ত তাঁর বংশধরদের শাসন

### ১. অরিমত্ত ( বা শশাঙ্ক )—( ১৩৬৫-৮৫ ) ও বংশধরগণ

অরিমত্ত বা শশাঙ্ক কীভাবে ইন্দ্রনারায়ণের নিকট থেকে ক্ষমতা দখল করেন—তা নিয়ে রহস্য আজও ঘনীভূত। অরিমত্তের বংশপরিচয় নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ইনি বৈদ্যদেবের বংশোদ্ভূত [History of Mdeieval Assam—N. N. Acharya, p-165] এবং সম্ভবতঃ ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল করে নেন [ ঐ—পৃ. ১৬৯ ]।

অরিমত্তের উত্তরাধিকারী গজাঙ্ক ( ১৩৮৫-১৪০০ ) দীর্ঘ পনের বছর রাজত্ব করলেও তাঁর সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায় না। গজাঙ্কের পুত্র শুক্রাঙ্কও আনুমানিক পনের বছর রাজত্ব করেন ( ১৪০০-১৪১৫ )। তাঁর রাজত্বকালের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা—একদিকে অহমরাজাদের সঙ্গে বিরোধ এবং মুসলমান অভিযানের মোকাবিলা করা। অহমরাজা তখন সুদংফা। তাঁর সঙ্গে কামতারাজ্যের বিরোধ সম্পূর্ণ তৃতীয় ব্যক্তির পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য। ঘটনাটি দেওধাই আসাম বুরুঞ্জিতে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সুদংফা তিপম-গোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব আসামে যুদ্ধ করবার সময়ে ঐ গোষ্ঠীর জনৈক স্থানীয় শাসনকর্তার কন্যার রূপমোহে তাকে জোর করে বিবাহ করেন। কিন্তু মেয়েটি ছিল 'তাও সুলাই' নামে তিপামদের স্থানীয় একজন দলপতির প্রতি আসক্তা। এদিকে একা সুদংফার কিছুই করতে না পেরে তাও সুলাই এসে কামতাপুর রাজার সাহায্য চাইলেন—তাঁর প্রণয়িনীকে উদ্ধারের জন্য। শুক্রাঙ্ক অহমরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। এবারেই কামতাপুরের সঙ্গে অহমরাজ্যের যুদ্ধ লাগলে কামতাপুরের প্রতি লোলুপ সুযোগ-সন্ধানে অপেক্ষমান গৌড়বঙ্গের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম খাঁ কামতাপুর আক্রমণ করলেন।

## ২. ষষ্ঠ মুসলিম অভিযান ( ১৩৯৪ ? )

এবারের মুসলিম অভিযানটি একেবারেই বৈচিত্র্যহীন। কাহিনী-সূত্রে দুর্লভনারায়ণের সময়কার মতই এবং সমাপ্তিও অনুরূপ।

কামতারাজ শুক্রাঙ্ক সসৈন্যে অহমরাজ্যে প্রবেশ করলে অহমদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে। এদিকে সিকান্দর শাহের পুত্র বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শা কামতারাজ্য জয়ে সৈন্য পাঠান। অহমদের সঙ্গে যুদ্ধ চলা কালে শুক্রাঙ্ক এই খবর পান এবং সঙ্গে সঙ্গে অহমদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করেন। অহম-রাজের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি নিজ কন্যা 'ভজনীকে' সুদংফার হাতে সমর্পণ করেন। এই বিবাহের যৌতুক ছিল—অঢেল সোনা রূপা ছাড়াও, দু'টি হাতী এবং বহু সংখ্যক ঘোড়া। [ দ্র. দেওধাই আসাম বুরুঞ্জি, পৃ. ১২ ]।

যাই হোক, বৈবাহিক-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে শক্তি,

সৌহার্দ্য এবং সহমর্মিতা স্থাপিত হলে, দুই রাজ্যের মিলিত সৈন্য-সামন্ত এক-যোগে সুলতানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ তৈরী করে। অহম ও কামতাপুরের মিলিত সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিম-সৈন্য পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। কামতাপুরের সৈন্য তাদের পশ্চাদ্ধাধন করে করোতোয়া নদীর ওপারে পৌঁছে দেয়। [ History of Bengal, Vol-II, p-118 ]

### ৩. মহারাজ মৃগাঙ্ক ( আ. ১৪১৫-১৪৪০ )

আনুমানিক ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে শুক্রাঙ্কের উত্তরাধিকারীরূপে মৃগাঙ্ক কামতাপুর সিংহাসনে বসেন। ইনি সম্ভবতঃ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আসামের বুরুঞ্জিগুলির মতে ইনি দক্ষিণ-পশ্চিমে কারোতোয়া থেকে উত্তর পূর্বে সাদিয়া পর্যন্ত ভূভাগ নিজ শাসনাধীনে আনেন। এর থেকে মনে করা যায় যে, তিনি অন্তর্বর্তী ভূখণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও গোষ্ঠীপতিকে পরাজিত বা বশীভূত করে স্বীয় ক্ষমতার বিস্তার কবেন। কিন্তু নিঃসন্তান এই রাজার মৃত্যুতে রাজ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং সেই সুযোগে খান্ বা খেন্ নামক নতুন রাজবংশের শাসন কামতাপুরে প্রবর্তিত হয়।

## খ. কামতাপুরে খেনবংশের শাসন

### ১. নীলধ্বজ ( আ. ১৪৪০-১৪৬০ )

মহারাজ মৃগাঙ্কের মৃত্যুতে কামতারাজ্য অধিকার করে নীলধ্বজ খেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খেনপদবীধারী এই রাজাদের জাতি-গোত্র বিচার বিতর্কিত বিষয়। বুকানন হ্যামিলটন এ বিষয়ে যে স্থানীয় কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন—তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম। সে কাহিনী মানতে গেলে বলতে হয়, এরা চাকর শ্রেণীর মত কোন নিম্নবর্ণের লোক। কিন্তু কামরূপ বুরুঞ্জিতে দেখা যাচ্ছে—নীলধ্বজ প্রথম যুগে 'সিঙ্গমারি' এলাকায় রাজত্ব করতেন। [ কামরূপ বুরুঞ্জি—পৃ. ৯৯ ]। অতএব মনে করা যায় যে—নীলধ্বজ ও তাঁর পূর্বপুরুষগণ স্থানীয় শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং ইতিমধ্যে রাজনৈতিক সুযোগ হাতে এসে পড়ায়—তিনি সমগ্র কামতারাজ্য

দখল করে নূতন রাজ্য গঠন করেন। তিনি কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন, মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ এনে নিজের অমাত্য পদে নিয়োগ করেন। তিনি কামতাপুর নগরের পুনর্নির্মাণ করেন এবং কামতাপুরের দুর্গটি সংস্কার করেন।

## ২. মহারাজ চক্রধ্বজের শাসন ( ১৪৬০-১৪৮০ )

আনুমানিক ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকারসূত্রে তাম্রধ্বজ কামতাপুরের সিংহাসনে বসেন। তাঁর আমলের সবচেয়ে বড় ঘটনা—রুক্‌নুদ্দীন বারবাক শাহের কামতাপুর আক্রমণ।

## ৩. সপ্তম মুসলিম অভিযান ( আ. ১৪৬৮ ? )

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ চক্রধ্বজের শাসনকালে কামতাপুর আক্রমণ করেন। "রিসালাৎ-উস্-সুহাদা" গ্রন্থে জানা যায়—সেনাপতি ইসমাইল কামতাপুরের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মনে করেন—এই সেনাপতি ইসমাইল বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহেরই [ ১৪৫৯-১৪৭৪ খৃ. ] সেনাপতি ছিলেন। [ History of Bengal—Dacca University—Vol-II, p-134. ] সময়ের হিসেবে রুকনুদ্দীনের সেনাপতি যদি কামতাপুর আক্রমণ করে থাকেন তবে তাকে চক্রধ্বজের আমলেই তা করতে হবে। শ্রী কে. এল. বড়ুয়াও সে কথা সমর্থন করেছেন [ Early History Assam—p-263 ]

"রিসালাৎ-উস্-সুহাদা'র বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এই যুদ্ধ পূর্ব দিনাজপুরে সংঘটিত হয়। এবারের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য কামতাপুর জয় নয়। বরং কামতাপুর কর্তৃক ( শুক্রাঙ্ক ও মৃগাঙ্কের সময় ) অধিকৃত গৌড়ের রাজ্যাংশ উদ্ধার। [ History of Bengal, D. U. p-134 ] আর নীলধ্বজ এবং চক্রধ্বজের সময়েই এসব জমির অধিকাংশ দখল হয়ে থাকতে পারে [ History of Medieval Assam—Acharrya, p-173 ].

যাই হোক—এই যুদ্ধে চক্রধ্বজ স্বয়ং বিশাল বাহিনী নিয়ে বর্তমান দিনাজপুরের মহী-সন্তোষ বলে কথিত জায়গাতে যুদ্ধের জন্য উপনীত হন। পূর্বোক্ত মুসলিম গ্রন্থটিতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, এই যুদ্ধে ইসমাইল

পরাজিত হন। প্রবাদে আছে—জয়ে অক্ষম ইসমাইল অগত্যা তাঁর যাদুকরী বিদ্যায় রাজাকে সম্মোহিত করেন এবং রাজা আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পিছনে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায়—এ বিষয়টিকে পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। তবে কেউ কেউ মনে করছেন—এই যুদ্ধের ফলে মুসলিমগণ করোতোয়ার পূর্ব দিকেও রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু এ তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইসমাইলের মৃত্যুর ( আ. ১৪৭৪ ) পরেও—ঘোড়াঘাটে চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। [ আসাম বুরুঞ্জি পৃ. 457 ] মি. গেইট মুসলিম প্রবাদ-কাহিনী অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে চক্রধ্বজের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী সম্পূর্ণ আজগুবি বলেছেন। মার্টিন ও তাঁর "Eastern India" গ্রন্থে ( Vol—III, p-410 ) অপর কোন প্রকার প্রমাণ না থাকায় এ ধরনের কাহিনীকে মূল্য দেননি। মিস্টার মার্টিন ও যদুনাথ সরকার দু' জনেই করোতোয়া পূর্বে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত ভূভাগে কামতাপুরের রাজ্য বিস্তার এই যুদ্ধের শেষ ফলাফলরূপে চিহ্নিত করেছেন।

## ৪. মহারাজ নীলাম্বর ( আ. ১৪৮০-১৪৯৮ )

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চক্রধ্বজের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নীলাম্বর কামতাপুব সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় গৌড়বঙ্গে হাবসী ক্রীতদাসদের রাজত্ব চলছিল—ক্রমাগত হানাহানি, ষড়যন্ত্র ও দুঃশাসনের মধ্য দিয়ে। গৌড়ের এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে নীলাম্বর পিতৃরাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেন। এর ফলে পশ্চিমে করোতোয়া থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ তাঁর অধিকারে আসে [ Martin's Eastern India Vol—III, p-410 ]. Gait তাঁর History of Assam-এ লিখেছেন যে, নীলাম্বর গৌড়রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অংশের বিস্তৃত ভূভাগ তাঁর রাজ্যান্তর্গত করে নিয়েছিলেন [ p-44 ]. একদিকে রাজ্য বিস্তার অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি দিয়ে তিনি নিজেকে সামরিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী ও ক্ষিপ্র করে তুললেন। তিনি কামতাপুর থেকে গৌড়-সীমান্তে অবস্থিত ঘোড়াঘাট দুর্গ পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করলেন। বিংশ শতাব্দীতেও তাঁর তৈরী রাস্তা ব্যবহৃত হচ্ছে—যে রাস্তা বঙ্গ বিভাগের আগেও কোচবিহার রংপুর হয়ে বগুড়া যাবার পথ ছিল। নীলাম্বরের রাজত্বকালের প্রথম চৌদ্দ বছর থেন;

শাসনের সবচেয়ে জাগৃতির কাল। কিন্তু শেষ চার বছর—দুর্ভাগ্যের এবং ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দটি আকস্মিক পতনের কাল বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

## ৫. অষ্টম মুসলিম অভিযান ( ১৪৯৮ )

হাবসী ক্রীতদাসদের নৈরাজ্যমূলক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গৌড়-বঙ্গের ইতিহাসে আবির্ভূত হলেন সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ( ১৪৯৩ খৃ. )। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতানি পর্বের সবচেয়ে খ্যাতনামা, সর্বক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ, এই সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। তারপর তিনি আক্রমণ করলেন—দক্ষিণী হিন্দুরাষ্ট্র ওড়িষ্যা। ওড়িষ্যা দখল ( ১৪৯৬ খৃ. ) করার পর তিনি উত্তরের হিন্দুরাষ্ট্র কামতাপুরের দিকে নজর দিলেন ( ১৪৯৮ খৃ. )। ওড়িষ্যা দখলের পরেই যে তিনি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেন, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে—আব্দুস সালাম রচিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন্' গ্রন্থে।

হুসেন শাহের কামতাপুর আক্রমণের কারণ হিসেবে বুকানন হ্যামিলটন সাহেব—নীলাম্বরের মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদেশীকে আক্রমণের আমন্ত্রণ-মূলক যে আখ্যান বর্ণনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক ভিত্তি বলতে বিশেষ কিছু নেই। নীলাম্বরের এক স্ত্রীর সঙ্গে গোপন ব্যভিচারের অভিযোগে উক্ত মন্ত্রীপুত্রকে হত্যা করে তাঁর মাংসই নাকি কৌশলে উক্ত মন্ত্রীমহোদয়কে খাওয়ানো হয়। এতে ক্ষুব্ধ মন্ত্রীবর নীলাম্বরকে ত্যাগ করে গৌড়েশ্বরের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তাঁকে কামতাপুর আক্রমণে প্ররোচিত করেন।[1] কিন্তু একথা সহজেই বলা যায় যে, মন্ত্রী প্ররোচিত করুন আর না করুন হুসেন শাহ কামতাপুর আক্রমণ করতেনই। এছাড়া অন্য কথা ভাবাই যায় না।

বাংলার অন্যতম শক্তিশালী ও প্রতিভাবান এই শাসনকর্তা—ঘাড়ের উপর চেপে বসা দু'-দুটি হিন্দুরাজ্যের দাপট মোটেই সহ্য করতে পারেন না। তার উপর গত ত্রিশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে সেই কামতাপুর একটু একটু করে

---

1. Fathiyah-i-Ibriyah ( Shihabuddin Talish ), I. A. S. B.—1872, p-79

গৌড়ের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমানা দখল করে চলেছে। এমন কি—কামতাপুরের সেই আগ্রাসন নীতি অব্যাহত ছিল হুসেন শাহের সিংহাসন আরোহণের সময় পর্যন্ত। তাছাড়া এই কাফের-রাজ্য বিগত আড়াই শত বৎসর ধরে মুসলিম রক্তে নিজেদের বিজয় পতাকা রঞ্জিত করে চলেছিল। অতএব বিপক্ষীয় কোন মন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়াই গৌড়রাজ্যের হৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই তো হুসেন শাহের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল এবং দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা নিয়ে নিশ্চয়ই তিনি এই যুদ্ধোদ্যমের ছক কেটেছিলেন। এই জন্যে তিনি এবার তাঁর সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন পথে আলাদা আলাদা ভাবে পাঠিয়ে কামতাপুর অবরোধের কৌশল নিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে রইলো চব্বিশ হাজার পদাতিক, বহু সহস্র অশ্বারোহী ও অগণিত নৌবহর।[২] সেনাবাহিনীর ও অভিযানের মূল দায়িত্বে রইলেন তাঁর নিজের শ্যালক দুলাল গাজী।[৩] দুলাল গাজী নিশ্চয়ই দানিয়েল গাজীর অপভ্রংশ।

যাই হোক, তিনপ্রকার বাহিনীতে গঠিত সৈন্যদল নিয়ে দুলাল গাজী বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করলেন, বোধহয় তিনটি বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন মসান্দার গাজী, কালু দেওয়ান এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন।[৪] বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে নীলাম্বর কামতাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দীর্ঘকাল মুসলিম সৈন্যগণ এই দুর্গ অবরোধ করে রইলো। জনপ্রবাদ অনুসারে মুসলিম সৈন্য দ্বাদশ বর্ষ জুড়ে এই অবরোধ চালায়; কিন্তু তা অবিশ্বাস্য। যাই হোক, ভিতরে যথাপরিমাণ খাদ্য-বস্ত্র-পানীয় থাকায় নগরবাসীর কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, কিন্তু উল্টে বহিরাগত মুসলিম সেনাবাহিনীই অতিরিক্ত অসুবিধায় পড়লো। অথচ দীর্ঘদিনের অবরোধ তথা আক্রমণেও দুর্গের কিছুমাত্র ক্ষতি করা গেল না। তখন হুসেন শাহকে তাঁর রাজনৈতিক মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো। তাঁর সেনাপতি দুলাল গাজী নীলাম্বরের কাছে নিঃশর্ত সন্ধি বা শান্তিপ্রস্তাব পাঠালেন; জয়-পরাজয় অনিশ্চিত স্বীকার করে স্থায়ী সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার জন্যই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নীলাম্বরের

---

2. Haliram's Assam Burungie, p-13
3. Do " " p-13
4. Hamilton, F.—Account of Assam, p-63

এতে অসম্মতিব কারণ ছিল না। তিনি সম্মতি প্রকাশ করলেন। ত্থলাল গাজীর তরফ থেকে প্রস্তাব গেল যে, এই শান্তি ও বন্ধুত্বের বাতাবরণকে আরো মাধুর্য্যময় করে তুলতে এবং সৌজন্যের কারণেও মুসলিম সেনানায়কদের স্ত্রীগণ গড়েব মধ্যে নীলধ্বজের পুরবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। নীলধ্বজ-এর মধ্যে কোন চাতুরী ধরতে পারেননি। তাঁর তোরণরক্ষী হিন্দুগণও বোরখা পরিহিত মুসলিম নারীদের গায়ে হাত দিয়ে পরখ করার কথা কল্পনা করেনি। কিন্তু মহিলাদের ছদ্মবেশে গড়ের মধ্যে ঢুকলো সব পুরুষ যোদ্ধা এবং তাদের সাহায্যেই গড়ের অর্গলমুক্ত হলো। সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্থলাল গাজী ও তার সৈন্যগণ। সপরিবারে এবং সমস্ত অভিজাতবর্গ-সহ বন্দী হলেন মহারাজ নীলাম্বর।[৫] কামতাপুর ত্থর্গ এবং নগরী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হলো। দীর্ঘদিনের স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের শাসকীয় ঘাঁটি এতদিনে বিচূর্ণ হয়ে গেল। বন্দী নীলাম্বর ও তার সঙ্গে সমস্ত পরিবাব-পরিজনকে গৌড়ে প্রেরণ করা হলো। তাঁরা আর কোনদিন ফিরে আসেনি—এবং তাঁদের ভাগ্যে কী হয়েছিল—তারও কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। নীলাম্বর নাকি গৌড়সৈন্যদের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬] কিন্তু পালিয়ে তিনি কোথায় গেলেন সে বিষয়ে সমস্ত প্রাচীন রচনা নীরব।

কামতাপুর রাজতন্ত্রের মূল ঘাঁটির পতন হলে বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ত্থলাল গাজী এগিয়ে চলেন এবং ব্রহ্মপুত্র তীরে 'হাজো' শহর পর্যন্ত দেশ দখল করে নেন।[৭] এ সব অঞ্চল নীলাম্বরেরই রাজ্যাধীন ছিল। নীলাম্বরের অধীন যে সব ভূঁইয়া ছিলেন—যথা, রূপনারায়ণ, ঘোষাল খাঁন, মালকুমার এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁরাও হুসেন শাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন।[৮]

এই বিজিত বিশাল ভূখণ্ডের শাসনের জন্য হুসেন শাহের পুত্রের প্রতিনিধিত্বে আফগান রাজপুরুষগণ নিয়োজিত হলেন। স্থানীয় হিন্দু ভূঁইয়া বা গোষ্ঠীপতিকে সামরিক ও নাগরিক প্রশাসন থেকে বহিষ্কৃত করা হলো। কামতাপুরে নতুন-ভাবে নির্মিত হলো আফগান উপনিবেশ। কিন্তু অধিকৃত অঞ্চলে এই পূর্ণ

---

5. Martin, Eastern India—Vol-III, p-411
6. Do " " " "
7. History of Medieval Assam—N. N. Acharya, p-176
8. Riyaz-us-Salatin—Abdus Salam, I. A. S. B.—1894. p-179

স্বশাসনের পরিকল্পনা হোসেন শাহের সম্পূর্ণ ভেস্তে গেল। এমন কি—কয়েক মাসের মধ্যে কামতাপুর তাঁর হাত ছাড়া হয়ে গেল এবং এক বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ কামতাপুর রাজ্য ভূঁইয়া ও সামন্তদের মিলিত আক্রমণে গৌড়ের শাসন থেকে খসে পড়লো। হিন্দুজনগণের মনে এই আকস্মিক ও অস্থায়ী মুসলিম-শাসন শুধু দুর্যোগপূর্ণ ধ্বংসের যুগ বলে স্মৃত হয়ে রইলো। সমস্ত বুরুঞ্জিগুলির সাক্ষ্যই তাই। মন্দির ধ্বংস আর ইসলাম-প্রচারের সরকারী উচ্ছ্বাস বয়ে গিয়েছিল এই অধিকৃত ভূখণ্ডে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অজস্র মন্দিরের মধ্যে উমানন্দ ও কেদারনাথ মন্দির বুরুঞ্জি লেখকদের হাতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। হাজোতে মুসলিমগণ একটি বৃহৎ মসজিদ স্থাপন করেন—যা আজো "পোয়ামক্কা" বলে পরিচিত। এই পোয়া ( এক চতুর্থাংশ ) মক্কার প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন কেদারনাথ ও উমানন্দ মন্দির ভেঙ্গেছিলেন বলে প্রবাদ। হুসেন শাহও তাঁর কামতাপুর-বিজয়কে চিহ্নিত করতে স্থাপন করেছিলেন মালদহের মাদ্রাসা, যাতে উৎকীর্ণ রয়েছে—হিজরী সাল, যার ইংরেজি সমার্থক ১৫০২ খৃষ্টাব্দ।

## ৬. কামতাপুর রাজ্যের মুসলিম শাসন-মুক্তি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হুসেন শাহের এই বিজয়াভিযান অত্যন্ত ক্ষণজীবী হয়েছিল। আলমগীর-নামা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বর্ষাকাল নেমে আসার সাথে সাথে হিন্দু রাজা পুনর্বার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কামতাপুর অবরোধ করেন। এই আক্রমণে সমস্ত মুসলিম সৈন্য ও সেনাপতিগণ হয় বন্দী, না হয় নিহত হন। বুরুঞ্জি-লেখকগণ বন্দী ও নিহত সেনানায়কদের নামও দিয়েছেন।

কিন্তু কে এই রাজা যিনি কামতাপুরের উদ্ধারকার্য এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করলেন? নীলাম্বরের কোনো সন্ধান কেউ পায়নি! তবে কী তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী কেউ হবেন? কামরূপ বুরুঞ্জি থেকে নীলাম্বরের পরে 'নাগাক্ষ' নামক এক কামতা-রাজের সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ কামতাপুরের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে নাগাক্ষ—পূর্ব কামরূপের ভূঁইয়া অধিপতিগণের এবং অহমরাজার সৈন্য-সহায়তা নিয়ে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন—প্রতি-আক্রমণের জন্য। তাছাড়া পরাজিত রাজা বা তাঁর উত্তরাধিকারী নিজের শক্তিতে আলমগীর-নামায় কথিত বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করতে পারে না—সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে। অহম্-

রাজশক্তি তথা ভূঁইয়া অধিপতিগণের পক্ষে কামতাপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অবস্থিতি গৌড়ের শাসনের চেয়ে বেশি কাম্য ছিল এবং সেইজন্য তাদের সকলকেই মুসলিম-বিরোধী সংগ্রামে পূর্বাপর সব সময়ই সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে। যাই হোক, অল্প সময়ের ব্যবধানে কামতাপুর এবং ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র কামতাং রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে গেলে ভূঁইয়া এবং অহমদের সাহায্যের কথা স্বীকার করে নিতেই হয়।

## ৭. কামতাপুরে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কোচরাজ্যের উদ্ভব

পূর্বেই বলা হয়েছে—আনুমানিক ১৫০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কামতাপুর প্রায় পুনর্মুক্ত হয়ে নাগাক্ষের শাসনাধীনে আসে। আসাম বুরুঞ্জিতে পাওয়া যাচ্ছে দুর্লভেন্দ্র নামক জনৈক কামতা-রাজার নাম—যাকে পরাজিত করে বিশ্বসিংহ কোচ-রাজ্যের পত্তন ঘটান। মনে করা হয়—দুর্লভেন্দ্রই ছিলেন নাগাক্ষের উত্তরাধিকারী। কিন্তু দুর্লভেন্দ্র বোধ করি পরাজিত হয়েও পূর্বাংশে কামতারাজ্যের একটি ভাগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জিতে দুর্লভেন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে রাজা সুচারুচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। উক্ত বুরুঞ্জির মতে সুচারুচন্দ্র ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে নরনারায়ণ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে শাসকীয় ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। এইভাবে নীলাম্বরের সময় বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্যে, রাজনৈতিক দুর্বলতা ও তমসার মধ্য থেকে পরবর্তী ৪৪০ বছর প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের ও কামরূপ অঞ্চলের হিন্দুরাজতন্ত্রের শাসন অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ও নিয়তি নিয়ে জন্ম লাভ করে—কোচ-রাজতন্ত্র।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( একাদশ অধ্যায় ):—

1. Eastern India—Vol-V—Martin, M.
2. Tabaquat-i-Nasiri—Tr. H. G. Raverty
3. History of Assam—E. Gait
4. Cambridge History of India—Vol-III—W. Haig
5. Relation of Ahom Kings with the Tribal Peoples of Assam—Smt. Lakshmi Devi
6. Tarikh-i-Firoz-Shahi—Zia-ud-din Barni

7. Riyaz-us-Salatin—Abdus Salam
8. Back ground of Assamese Culture—Raj Mohon Nath
9. Dynastic History of India—H. C. Roy.
10. History of Civilization of the People of Assam
—P. C. Choudhury
11. Aunexation of Assam—R. M. Lahiri
12. History of Medieval Assam—N. N. Acharya
13. Rudra Singhar Burunji
14. Assam Burunji—Gunabhiram Barua
15. Kamrupa Burunji—S. K. Bhuyan
16. Deodhai Assam Burunji
17. Kalika Puran—Bangavashi Press, 1982.
18. Yogini Tantra—E. Gait
19. Accounts of Assam—F. Hamilton
20. North-East Frontier of Bengal—Machenzie
21. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—রমেশচন্দ্র মজুমদার
22. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
23. গুরুলীলা ( পুঁথি )—রামচরণ ঠাকুর
24. কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত—এইচ. এল. দত্ত বড়ুয়া

# দ্বাদশ অধ্যায়

# গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাস ( ১২০৩-১৫৩৮ খৃ. )

## ১. গৌড়-বরেন্দ্রে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত

পূর্বে দশম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে মীর্জাপুরের জায়গীরদার বখতিয়ার আকস্মিক আক্রমণে লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করে প্রথমে নদীয়া এবং পরে লক্ষণাবতী দখল করে নেন [ ১২০২ খৃ. ]। মুসলিম শাসনের প্রথম ২১ বছর অবশ্য লক্ষণাবতী নয়, দিনাজপুরের দেবকোট ছিল মুসলমান রাজ-শক্তির প্রধান ঘাঁটি। উত্তরবঙ্গ অভিযানে বখতিয়ারের সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হলে দেহে মনে তিনি ভেঙ্গে পড়েন এবং অল্পদিনের মধ্যে মারা যান ( ১২০৬ খৃ )। অতঃপর তাঁর ভ্রাতা মহম্মদ শিরান খিলজী সিংহাসনে বসেন। কুতুবুদ্দীনের সৈন্য-সহায়তায় আলী মর্দান শিরানকে গদীচ্যুত ও নিহত করে সিংহাসনে বসেন। কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে ( ১২১১ খৃ ) তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তখন গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ সিংহাসনে বসেন ( আ. ১২১১ খৃ. )। তাঁর ১৫ বছর রাজত্বের পর আ. ১২২৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিস গৌড় আক্রমণ করেন। গিয়াসুদ্দীন বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হয়ে সে বারের মত অস্তিত্ব রক্ষা করেন। কিন্তু সুলতান ইলতুতমিস ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। সেইজন্যে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে ইলতুতমিসের প্রতিনিধিরূপে নাসিরুদ্দীন ইউয়জকে আক্রমণ করেন। গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ পরাজিত ও নিহত হন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন কামরূপ আক্রমণ করতে গিয়ে সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও তাঁর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ স্বাধীন হয়ে যায়। রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যে নাসিরুদ্দীনও মারা যান ( ১২২৯ খৃ )।

নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুতে গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর ইক্তিয়ারুদ্দীন বলকা নামে একজন খিলজী মালিক লক্ষণাবতী দখল করে ১৮ মাস রাজত্ব করেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইলতুতমিস তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে আলাউদ্দীন জানিকে লক্ষণাবতীর শাসনকার্যে নিয়োজিত করেন। দেড় বছরের মধ্যে ইলতুতমিস আলাউদ্দীন

জানিকে সরিয়ে সৈফুদ্দীন আইবককে লক্ষণাবতী শাসনে নিযুক্ত করেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে সৈফুদ্দীনের মৃত্যু হয়। অতঃপর সুলতানা রিজিয়ার ফরমান নিয়ে তুব্রল খাঁ ( ১২৩৬-৪০ ) চার বছর লক্ষণাবতী শাসন করেন। অতঃপর মালিক তমুর খাঁ ( ১২৪৫-৪৭ খৃ. ) কিছুদিনের জন্য লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসেন। ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর ফলে জালালুদ্দিন মাসুদ জানি ( ১২৪৭-৫১ ) তিন বছরের জন্য গৌড়-বরেন্দ্র শাসন করেন। অতঃপর অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইক্তিয়ারুদ্দীন উজবেক ১২৫১ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং রাঢ় ও নদীয়া অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তৃত করলেন। কিন্তু ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণে গিয়ে তিনি পরাজিত ও পরিবারবর্গসহ বন্দী এবং নিহত হন।

ইক্তিয়ারুদ্দীন উজবেকের শোচনীয় মৃত্যুতে বলবন-ই-উজবেগী লক্ষণাবতীর শাসনভার পান ( ১২৫৭ খৃ. )। তাঁর দুই বছরের শাসনকালও দুর্ভাগ্যময়। তিনি পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করতে গিয়ে বিফল হন এবং লক্ষণাবতীতে পৌঁছবার আগে তা তমিজুদ্দীন আর্সলনের হাতে চলে যায়। আর্সলনের সঙ্গে বিফল যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। আর্সলন প্রায় ৬ বছর ক্ষমতায় থাকেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র তাতার খাঁ ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন সুলতান হিসেবে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসেন। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুতে তাঁর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে। ঐ বছর গিয়াসুদ্দীন বলবন দিল্লীশ্বর হলে তাতার বহু মুল্য উপঢৌকনে তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাখেন। ১২৬৮ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুতে শের খাঁ সুলতান হন। তিনি আপন মুদ্রায় নিজ নাম সহ বলবনের নাম মুদ্রিত করে সিংহাসন বিপদ মুক্ত করে যান। শের খাঁ ১২৭২ খৃ. মারা গেলে, দিল্লীশ্বর বলবন আমিন খাঁকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা এবং তুব্রল খাঁকে তাঁর নায়েব নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে তুব্রল আমিন খাঁকে পরাজিত করে লক্ষণাবতী দখল করেন।

মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ যাবৎ ( ১২৭৬ খৃ. ) যত শাসনকর্তা লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসেন, তাঁদের গড় কার্যকাল ৪ বছর মাত্র। তা থেকে বোঝা যাবে লক্ষণাবতীর শাসন কেন দৃঢ়বদ্ধ হয়নি বা প্রত্যাশিত গতিতে চারিদিকে প্রসারিত হয়নি। এই উর্বর পাললিক ভূখণ্ডের দখল নিয়ে শাসক-শ্রেণীর মধ্যে অন্তহীন কোন্দল—এই পর্বকে পঙ্গু করে রাখলেও মুসলিম শাসনের সূত্রপাত এতে স্থিরভাবে চিহ্নিত করেছে নিশ্চিত ভাবেই।

## ২. বঙ্গে মুসলিম শাসনের বিস্তার

১২৭৬ খৃষ্টাব্দে নায়েব তুঘ্রল খাঁ লক্ষণাবতীর সিংহাসন দখল করলে মুসলিম শাসনের বিস্তারের যুগ শুরু হল। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ অভিযান করেন। পূর্ণ সাফল্য না হলেও কেউ কেউ মনে করেন। তিনি সামান্য কিছু ভূখণ্ড দখল করেছিলেন।[১] তুঘ্রল খাঁ ঐ সালেই জাজনগরের (উড়িষ্যার) রাজাকে পরাজিত করে বহু অর্থ ও হস্তী অধিকার করেন এবং রাঢ়ে আধিপত্য অর্জন করেন। জিয়াউদ্দীন বা৷ণর বিবরণ থেকে জানা গেছে তুঘ্রল পূর্ববঙ্গেও মুসলিম শাসন বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন এবং ঢাকার ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে "নারিকেল দুর্গ" গঠন করেছিলেন। আ. ১২৮০ খৃষ্টাব্দে তুঘ্রল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে খুদবা প্রচার ও মুদ্রা প্রচলন করেন। এতে দিল্লীর সুলতান বলবন ক্রুদ্ধ হয়ে আমিন খাঁর নেতৃত্বে সৈন্য পাঠালেন। যুদ্ধে আমিন খাঁ পরাজিত হলেন। ১২৮১-এ আবার সৈন্য পাঠানো হলো—কিন্তু বিদ্রোহ দমন হল না। অবশেষে ঐ সালেই বলবন স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করলেন এবং তিন লক্ষ সৈন্য ও বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে লক্ষণাবতী দখল করলেন এবং পশ্চাদ্ধাবনের পথে সোনার গাঁয়ের কাছে তুঘ্রল পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হল। (১২৮২ খৃ.)।

বলবন অতঃপর নিজ পুত্র বগরাখানকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লীতে ফিরে যান। ৯ বছর শাসনকালে তিনি বিলাস-ব্যসনে দিন কাটান। ১২৯১ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন কৈকায়ুস সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে কৈকায়ুসের মধ্যম ভ্রাতা সিংহাসন দখল করেন। তাঁর ২৩ বছরের শাসনকালে তাঁর পুত্রগণ বারে বারে বিদ্রোহী হয়ে সিংহাসন দখল করে; কিন্তু ১৩২২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত তাঁর একটি রজত মুদ্রা থেকে মনে হয়, ১৩২২ খৃষ্টাব্দেও তিনি ক্ষমতায় ছিলেন অথবা ক্ষমতা পুনর্দখল করেছিলেন।

১৩২২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহের মৃত্যুতে তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম সিংহাসনে বসেন এবং তিন বছর রাজ্য শাসন করেন। ইনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

---

১ বাঙলার ইতিহাস—প্রভাস সেন, পৃ. ২৫২

কিন্তু ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-তুঘলক দিল্লীশ্বর হয়েই নাসিরুদ্দীনের স্থলে কদর খাঁকে লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কদর খাঁ ১৪ বছর লক্ষণাবতীর শাসন-ক্ষমতায় ছিলেন, কিন্তু ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে সোনার গাঁ আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হন। কদব খাঁর মৃত্যুতে তাঁর সেনাপতি আলি মোবারক ক্ষমতা দখল করেন ও ৩ বছর লক্ষণাবতী শাসন করেন।

## ৩. ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন আলিসাহেবের মৃত্যুতে সামসুদ্দীন ইলিয়াস লক্ষণাবতী দখল করেন। এর ফলে গৌড-বরেন্দ্রের ইতিহাসে বিভিন্ন যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর সিংহাসন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হয়ে একটি বংশেব সুলতানি স্থাপিত হল। ইলিয়াসশাহ শুধু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাধীন সুলতান বলে নয়, সফল সামবিক প্রতিভা এবং এক বিশাল ভূখণ্ডের প্রায় সাম্রাজ্য গডে তোলার জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁব রাজত্বকালে ( ১৩৪২-৫৭ খৃ. ) লক্ষণাবতী পূর্ব ভারতের ক্ষমতাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তুঘলকের বিশৃঙ্খল শাসনের সুবিধা গ্রহণ করে তিনি মিথিলা দখল করেন। ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপাল অভিযান করে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ১৩৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ওড়িষ্যা অভিযান করেন এবং কাশী পর্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সোনার গাঁ অধিকার করে পূর্ববঙ্গের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষণাবতীর শাসনে আনয়ন করেন।

পূর্ব ভারতে ইলিয়াসশাহের শক্তি বৃদ্ধিতে দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তুঘলক ৯০,০০০ অশ্বারোহী, বিশাল পদাতিক বাহিনী এবং ১০০০ রণতরী নিয়ে ইলিয়াসশাহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। বিহারের মধ্যে অন্ততঃ চারটি স্থানে যুদ্ধ হয়। ইলিয়াস সুবিধা করতে না পেরে ক্রমাগত পিছু হটতে থাকেন এবং অবশেষে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দীর্ঘকাল অবরোধ সত্ত্বেও একডালা দুর্গ দখল করতে না পারায় ইলিয়াসের স্বাধীন সুলতানি মেনে নিয়ে ফিরোজশাহ দিল্লী ফিরে গেলেন এবং চার বছর আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ইলিয়াসও উপঢৌকন-মাধ্যমে দিল্লীর সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে লাগলেন।

দিল্লীর দিক থেকে বিপদ কেটে গেলে কারো কারো মতে তিন বছর

ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ( ১৩৫৪-৫৭ ) তিনি ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রতিষ্ঠিত কামতাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের কোন বিবরণ অহমীয়া বুরুঞ্জিগুলিতে পাওয়া যায় না। এ যুদ্ধের ফলাফলও সুনিশ্চিত হয়। সেকেন্দারশাহের 'চাউলিস্থান-ওরফে-কামরু' মুদ্রার ইঙ্গিত মাত্র—এতদঞ্চলের ক্ষমতা বিস্তারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে গৃহীত হয়নি।

১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াসশাহের মৃত্যুতে তৎপুত্র সেকেন্দারশাহ ( ১৩৫৭-৮৯ ) সিংহাসনে বসেন। এই বছরই দিল্লী-সম্রাট ফিরোজশাহ লক্ষণাবতী আক্রমণ করেন। সিকান্দরশাহ পিতার মতই একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ দু' বছর যাবৎ অবরোধ চালিয়েই জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হওয়ায়—ফিরোজ শাহ সেকেন্দারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে ফিরে যান। এর পর প্রায় ২০০ বছর আর কোনো দিল্লীশ্বর গৌড়-বঙ্গের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি।

সুলতান সেকেন্দারশাহের প্রধান কীর্তি পাণ্ডুয়ার উপকণ্ঠে আদিনা মসজিদ। এটির আয়তন ৪০০ ফুট × ১৫০ ফুট। মসজিদের চতুর্দিকে ৪০০ স্তম্ভের উপরে স্থাপিত বারান্দা। এটি নির্মাণ করতে সময় লাগে চার বছর ( ১৩৬৪-১৩৬৮ খৃ. )। এটি নির্মাণ করতে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে কাজে লাগানো হয়।

সেকেন্দরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ ( ১৩৮৯-১৪০৯ ) সিংহাসনে বসেন। আসাম বুরুঞ্জি থেকে জানা যায়—তিনি উত্তরবঙ্গ ও কামরূপ অভিযান করেন এবং ভীষণভাবে পরাজিত হন। আজমশাহের পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হামজা সুলতান হন ( ১৪০৯-১০ )। এই সময় ইলিয়াসশাহীবংশে সিংহাসন নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে রাজা গণেশ সিংহাসন দখল করেন এবং ইলিয়াসশাহীবংশের রাজত্বের অবসান হয়।

## ৪. সাময়িক হিন্দুশাসন : রাজা গণেশ, দনুজমর্দন ও মহেন্দ্র

গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাসে, দীর্ঘ মুসলিম শাসনের অন্তর্বর্তীকালে রাজা গণেশ, দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের প্রতিষ্ঠিত সাময়িক হিন্দু-শাসন, একটি অতি বিশিষ্ট ঘটনা।

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে ( ১৬১১ খৃ. ) লিখেছেন, গণেশ

( কন্‌স ) নামক এক বাঙালী সুলতান গিয়াসুদ্দীনের পৌত্র সমসুদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করে সিংহাসনে বসেন এবং ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত নিজামুদ্দীন আহমদের 'তাবাকাৎ-ই-আকবরী'তে ঐ ঘটনার সমর্থন জানিয়ে বলা হয়েছে—তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৭ বছর।

রাজা গণেশ কিভাবে এবং ঠিক কোন সময় ক্ষমতা দখল করেন তা নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে রাজা গণেশের পুত্র যদু ( বা জিৎমল ) জালালুদ্দীন নামে ৮১৮ হিজরী বা ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে ফিরোজাবাদ থেকে মুদ্রা প্রচার করেন। সুতরাং ১৪১৫-তে অবশ্যই গণেশ সিংহাসনে ছিলেন না। আবার তাবাকাৎ-ই-আকবরীতে বলেছে তিনি সাত বছর রাজত্ব করেন। তাহলে গণেশকে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করতে হয়; কিন্তু ঐ সালে সৈফুদ্দীন হামজাশাহ পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজমশাহের সময় পরিবারের কলহ ও গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে। সম্ভবতঃ এই সময় গণেশ হামজাশাহের ডান হাত হয়ে পড়েন এবং 'de facto' রাজারূপে গণ্য হন। সম্ভবতঃ এই 'de facto' রাজত্ব ধরেই নিজামুদ্দীন গণেশের রাজত্ব ৭ বছর ধরেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই গণেশ যে রাজকোষ ও রাজক্ষমতা হস্তগত করে প্রকৃত সুলতান হয়ে ওঠেন, সে তথ্যের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে মহম্মদ কাসিম ফিরিস্তার রচিত 'তারিখ-ই-সিরিস্তাতে।

রাজা গণেশ সম্ভবতঃ দিনাজপুরের লোক ছিলেন এবং প্রথম জীবনে দিনাজপুরের অন্তর্গত বিজয়নগর পরগণার শাসন ক্ষমতা আয়ত্ত করেন। এ কথা লেখা রয়েছে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে তিনি হয়তো শাসকীয় বংশের বিশ্বাস অর্জন করে প্রভাবশালী আমীরের পদে উন্নীত হয়ে থাকবেন এবং রাজকোষের তথা শাসন-ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়ে বসেন। অবশেষে হামজাশাহের নাবালক পুত্রের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার আগেই তিনি সিংহাসন দখল করেন।

রাজা গণেশের স্থাপিত হিন্দুরাজ্য সম্ভবতঃ মুসলিম আক্রমণে ইসলামিক শাসনে পরিণত হয়নি। তাঁর বংশধরগণের পক্ষে আরো কিছুকাল হিন্দুরাজ্য চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল না। গণেশের পরিবারবর্গ বা অন্যান্য পুত্রগণও মুসলমান হননি। গণেশের জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি ছোটবেলা থেকেই 'অল্পবুদ্ধি' মস্তিষ্কের লোক বলে পরিগণিত, নিজে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন

এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর সিংহাসনের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। উপস্থিত আমীর ওমরাহরা অবশ্য ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি করে সিংহাসনের অধিকার নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা ধর্মান্তরিত জামালুদ্দীনকে গণেশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মেনে নিলেন। 'তাবাকাৎ-ই-আকবরী' 'আইন-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' থেকে ঐ একই কাহিনী পাওয়া যায়।

মুসলিম গ্রন্থগুলিতে যদিও বলা হয়েছে যে, আমীর ও সামন্তগণ ইসলাম গ্রহণকারী জালালুদ্দীনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সত্য সম্ভবতঃ অন্যরূপ। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক সমর্থন করলেও হিন্দু সামন্ত ও রাজকর্মচারীরা এটা সমর্থন করেননি। কারণ এই ঘটনার প্রতিবাদে চন্দ্রদ্বীপ পরগণার শাসন-কর্তা দনুজমর্দনদেব লক্ষণাবতীর আধিপত্যকে অস্বীকার করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং চট্টগ্রাম ও সোনার গাঁ দখল করে নেন। তিনি অতঃপর কালবিলম্ব না করে লক্ষণাবতীর হিন্দু রাজকর্মচারী ও মালীদের সহযোগিতা নিয়ে পাণ্ডুয়া আক্রমণ করেন এবং জালালুদ্দীনকে বিতাড়িত করে পাণ্ডুয়া (লক্ষণাবতী) অধিকার করেন (৮২০ হিজরি বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে)। ঐ সালেই দনুজমর্দনদেব চট্টগ্রাম, সোনার গাঁ এবং পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া) থেকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। জালালুদ্দীন সম্ভবতঃ এই সময় সপ্তগ্রামে আশ্রয় নেন। কারণ সপ্তগ্রাম টাঁকশাল থেকে দনুজমর্দনদেবের কোন মুদ্রা প্রচারের তথ্য নেই। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে গৌড়বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করে দনুজমর্দন সপ্তগ্রাম অধিকারের চেষ্টা করলে জালাল-উদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে সম্ভবতঃ তিনি নিহত হন। তখন মহেন্দ্রদেব রাজা হন ও পাণ্ডুনগর এবং চট্টগ্রাম থেকে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রা প্রচার করেন। এ পর্যন্ত দনুজমর্দনদেবের ও মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত যত মুদ্রা পাওয়া গেছে তাদের এক পিঠে উক্ত রাজাদের নাম এবং অন্য পিঠে "শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ" কথাটা থাকায় মনে করতে বাধা নেই এরা একই বংশীয় ছিলেন এবং তাই একই ইষ্ট-দেবতার নাম মুদ্রিত করেছেন।

১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে জালালুদ্দীনের নামে পাণ্ডুনগর থেকে প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাতে মনে করা যেতে পারে যে, ঐ সালে জালালুদ্দীনের পক্ষ প্রবল ও সংগঠিত হয়ে মহেন্দ্রদেবকে বিতাড়িত করে পুনরায় পাণ্ডুনগর দখল করে। তখন মহেন্দ্রদেব শুধুমাত্র সোনার গাঁ ও চট্টগ্রামে স্বাধীনভাবে রাজত্ব

করতে থাকেন। ঐ সময় উক্ত স্থানগুলি থেকে প্রাপ্ত তাঁর মুদ্রাগুলিই মূল প্রমাণ। আনুমানিক ৮২৩ হি. অর্থাৎ ১৪২০ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন পুনরায় সোনার গাঁ ও চট্টগ্রাম দখল করেন ও সেখান থেকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে—রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করলেও এবং কোন সময়েই অবশ্য সম্পূর্ণভাবে স্থলতানিচ্যুত না হলেও ১৪১৭ থেকে ১৪১৮ পর্যন্ত গৌড়ের অধিকার এবং ১৪১৭ থেকে ১৪২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনার গাঁ ও চট্টগ্রামের অধিকার হারান। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গণেশের পরে জালালুদ্দীন ও তার পরে সামসুদ্দীনের রাজত্ব লাভের কথা বললেও এবং তাতে মূলে মিথ্যা ভাষণ না হয়ে থাকলেও—এই মুসলিম শাসনের মধ্যভাগে বাংলার প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলই যে আবার কিছু সময়ের জন্য ( ১৪১৭-২০ ) হিন্দু-শাসনে চলে এসেছিল, প্রাপ্ত মুদ্রার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দ্বারা এত দিনে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে।

যাই হোক—জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১৪৩১ খৃ. ) কিন্তু সাদি খাঁ ও নাদির খাঁ নামক দুই হাবসী ক্রীতদাসের হাতে নিহত হলে ( ১৪৪২ খৃ. ) গণেশের বংশধরদের শাসন বাঙলা থেকে অবলুপ্ত হয়।

## ৫. গৌড়-বরেন্দ্রে হাবসী-শাসন

সামসুদ্দীন আহমদকে হত্যা করে নাদির খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করলে ( ১৪৪২ খৃ ) গৌড়-বরেন্দ্রে হাবসী-শাসনের সূত্রপাত হয়। এরপর হুসেনশাহী বংশের রাজত্বের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে হাবসী ক্রীতদাসদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। তাঁরা অনেকেই সিংহাসন দখল করেন, আবার সিংহাসনে না থাকলেও তাঁরা প্রাসাদে পূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু অনধিকারীর এই রাজ্য দখলের লোভ ও ষড়যন্ত্রে রাজধানীর জীবন বিভীষিকাময় এবং দেশে অরাজকতা ও অনাচার বেড়ে গিয়েছিল।

সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই হাবসী ক্রীতদাস সাদি খাঁর হাতে নাদির খাঁ নিহত হলেন। কিন্তু অভিজাত আমীর-ওমরাহগণ প্রাসাদের

কর্মী হাবসীদের ক্ষমতা সহ্য করতে না পেরে সাদি খাঁকে হত্যা করে ইলিয়াস-শাহী বংশের মজঃফর খাঁকে সিংহাসনে বসান ( ১৪৪২-১৪৫৯ খৃ. )। মজঃফর খাঁর মৃত্যুতে তাঁর পুত্র বারবাকশাহ রাজত্ব করেন ( ১৪৫৯-৭৪ খৃ. )। উনি বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের লেখক মালাধর বসুকে ইনি "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দিয়েছিলেন।

বারবাকশাহের পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন ইউসফ সুলতান হন ( ১৪৭৪-৮১ খৃ. )। পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ এঁরই তৈরী। তিনি সম্ভবতঃ শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুরাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন। সামসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সেকেন্দর ২½ দিন রাজত্ব করেন কিন্তু তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে ঐ বংশেরই জালালুদ্দীন ফত্তা সুলতান হন। রাজ্যশাসনে ও প্রাসাদের রাজনীতিতে হাবসীদের প্রতাপ খর্ব করতে সচেষ্ট হলে সুলতান জালালুদ্দীন নিহত হন হাবসী নেতা সুলতান সাহজাদার হাতে। সাহজাদা হাবসী দ্বিতীয় বারবাক নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। ৬ মাস সিংহাসনে বসার পর মালিক 'আন্দিল হাবসী' বারবাককে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। আন্দিলই ফিরোজশাহ নামে সুলতান হন ( ১৪৮৭-৯০ খৃ. )। ফিরোজশা'র পরে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ( ১৪৯০-৯১ খৃ. ) রাজত্ব করেন। এর পর বদর দেওয়ানা নামক আরেকজন হাবসী নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন এবং সামসুদ্দীন নাম ধারণ করেন। সামসুদ্দীনের অত্যাচারে গৌড়ের বহু সংখ্যক অধিবাসী বিদ্রোহী হয়ে নগর ত্যাগ করে ভয় পেয়ে গৌড়দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চার মাস অবরোধের পরে মজঃফর প্রকাশ্য যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসেন এবং পরাজিত ও নিহত হন।

## ৬. হোসেনশাহী বংশের রাজত্বকাল

হাবসী-পর্বের রক্তাক্ত শাসনের অবসান ঘটতে গৌড়ের প্রধান ওমরাহ ও আমীরগণ সৈয়দ হোসেনকে সিংহাসনে বসান। তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নাম ধারণ করেন। বাংলার সুলতানদের মধ্যে হোসেনশাহ বোধকরি সব দিক দিয়ে খ্যাতি ও কৃতিত্বে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি প্রতিভাবান যোদ্ধা, সুশাসক, প্রজাদরদী, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে গৌড়-বরেন্দ্রে শান্তি ও প্রাচুর্য ফিরে আসে। তাঁর

রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলিমের মিলনের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেছিলেন। সনাতন ছিলেন দবির খাস ( প্রধান মন্ত্রী ), রূপও ছিলেন "সাকর মল্লিক" গোপীনাথ বসু ( পুরন্দর খাঁ ) ছিলেন উজীর। রূপ ও সনাতনের ভাই অনুপ টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। মুকুন্দ দাস হোসেনশাহের চিকিৎসক এবং কেশব বসু দেহরক্ষী সেনাপতি ছিলেন [ চৈতন্যভাগবত ]। এঁরই রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বৈষ্ণববাদের প্লাবন আসে। বাংলার সাহিত্য-সৃষ্টিতেও আসে নতুন যুগ।

হোসেনশাহ গৌড়ের রাজনৈতিক প্রাধান্যকে সুলতানী আমলের সর্বযুগের মধ্যেই বিস্তৃততম করেন। হুসেনশাহের সঙ্গে দৌলতাবাদের যুদ্ধে ( ১৪৯৫ খৃ. ) দিল্লীশ্বর সেকেন্দর লোদী বাংলার সামরিক শক্তির পরিচয় পান এবং সন্ধি করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কামতাপুর আক্রমণ করেন এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বহুকালের হিন্দু রাজধানীর পতন ঘটান। অতঃপর বিজয়ী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র তীর পর্যন্ত গমন করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অহমগণ এবং নাগাক্ষের নেতৃত্বে ভূঁইয়াগণ একযোগে আক্রমণ করে হোসেনশাহের সৈন্যদের বিতাড়িত করে দিয়ে আসাম ও উত্তরবঙ্গকে মুক্ত করেন।

১৪৯৬ খৃ. থেকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশ বছর হোসেনশাহীবংশের সঙ্গে ওড়িষ্যার যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকে। তার সূত্রপাত হয় হোসেনশাহের ওড়িষ্যা আক্রমণে ( ১৪৯৬ )। জয়-পরাজয়ের সেই দীর্ঘ ইতিবৃত্ত এখানে অবান্তর। তবে কামতাপুরের মত ওড়িষ্যাও হোসেনশাহ করতলগত করতে পারেননি পুরোপুরি ভাবে। ত্রিপুরাতেও হোসেনশাহকে দীর্ঘ-মেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত হতেই হয়। পর পর তিনটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ায়, চতুর্থ অভিযানে ( আ. ১৫১০ খৃ. ) তিনি ত্রিপুরার কিয়দংশ দখল করেন। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হোসেনশাহের মৃত্যু হ'লে পুত্র নসরৎশাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি তীরভুক্তির হিন্দুরাজ্যকে পরাজিত ও দখল করেন। কিন্তু ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরের সৈন্য তীরভুক্তি গৌড়ের সৈন্যদের পরাজিত করে তীরভুক্তি দখল করে নেয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৩১ পর্যন্ত অহমগণও নসরৎশাহকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং গৌড়ের প্রাধান্য সমূলে উৎপাটিত করে।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে নসরৎশাহ আপন ক্রীতদাসের হাতে নিহত হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল বদর (১৫৩২) এবং পরে আলাউদ্দিন ফিরোজ (১৫৩২-৩৩) অল্পদিন

রাজত্ব করেন। ফিরোজকে হত্যা করে তাঁর কাকা আবুল বদর, গিয়াসুদ্দিন মামুদ নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঠিক এই সময় শেরশাহের রাজনৈতিক উত্থানের যুগ। শেরশাহের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধ শুরু হলে মামুদ হুমায়ুনের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম অভিযানে শের খাঁ—উত্তর রাঢ় দখল করে নেন এবং ষোল লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে সন্ধি করেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ আবার গৌড় দুর্গ অবরোধ করলেন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গৌড় অধিকার করেন। মামুদ পলায়ন করেন ও কিছুদিনের মধ্যে মারা যান। মামুদের পুত্রদ্বয়ও শেরশাহের হাতে নিহত হয়। রাজা এবং বংশ দুই-ই শেষ হওয়ায়—হোসেনশাহীবংশের শাসনের অবসান ঘটে [ ১৫৩৮ ]।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( দ্বাদশ অধ্যায় ):

1. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—মজুমদার সম্পাদিত
2. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
3. বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়
4. গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্তী
5. Husain Shahi Bengal—M. R. Tarafdar
6. Tarikh-i-Firoz-Shahi—( Tr. Elliot )
7. Tabaquat-i-Nasiri—( Tr. H. G. Raverty )
8. Riyaz-us-Salatin—( Tr. Abdus Salam )
9. Memories of Gaur and Pandua—H. E, Stepleton (Ed.)
10. Bengal in the 16th Century—J. N. Dasgupta
11. Cambridge History of India—Vol-III—Haig, W.
12. History of Bengal—Vol-II—R. C. Mazumdar (rd)
13. History of Medieval India—I. Prasad

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

# প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে কোচরাজতন্ত্র

[ প্রথম পর্ব : খৃ. ১৫১৫ থেকে খৃ. ১৭৭২ সন ]

## ১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে হোসেনশাহের আক্রমণে কামতাপুর বিধ্বস্ত এবং সাময়িকভাবে অধিকৃত হলে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। অহমরাজ ও ভূঁইয়াদের সহায়তায় "নাগাক্ষ" ও তাঁর উত্তরসূরীরা মুসলিম হানাদারদের তাড়াতে পারলেও দেশে সেই সংহত প্রশাসন, ঐক্য ও শান্তি ফিরে এলো না। 'নাগাক্ষ' হয়তো পশ্চিম ভাগে অংশবিশেষ দখলে রেখেছিলেন—কিন্তু ভূঁইয়া-গণ পূর্ব-কামরূপে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। এই সময়েই সম্ভবতঃ স্থানীয় ভূস্বামী হাড়িয়া মণ্ডল ও তাঁর যুদ্ধনিপুণ পুত্রগণ রাজ্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে—স্থানীয় গোষ্ঠীপতির ভূমিকা থেকে রাজন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

একেবারে ভূমি থেকে জাত এই রাজশক্তির অন্যতম চমৎকারিত্ব হলো এর দীর্ঘ জীবন—প্রায় ৪৩৫ বছরের আয়ুষ্কালের এই রাজতন্ত্র অন্ততঃ ২৫৭ বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছে। এই হিন্দুরাজতন্ত্র টিকেছিল যখন ভারতে একের পর এক হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমবর্ধমান মুসলিম রাজশক্তির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেই গৌড়ের এত কাছাকাছিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে কোচরাজতন্ত্র আপন অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিচয় তুলে ধরেছে। কী সেই অন্তর্নিহিত মৌলশক্তি? বোধকরি সেটা এর উদ্ভবের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়ে গেছে। এই রাজবংশের জন্ম হয়েছে লোকায়ত কৌম-জীবন থেকে। উত্তরবঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রক্তের যোগ, নাড়ীর যোগ থাকাতেই হয়তো বহু ঘাত-প্রতিঘাতেও কোচরাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েনি। প্রচণ্ড বিপদের দিনেও এই রাজবংশ গণ-সমর্থন হারায়নি; অন্ততঃ প্রজা-বিদ্রোহ একে কখনো বিপন্ন করে তোলেনি। গৃহ-বিবাদ ও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র সব রাজবংশের মত এখানেও হয়েছে কিন্তু সেই ভ্রাতৃবিরোধ ও জাতিবিরোধে গণ-সমর্থন যুক্ত হয়নি। শুধু তাই নয়, এই রাজবংশের কোনো

কোনো রাজার অপদার্থ শাসনকালে, যখন প্রজাগণ দীর্ঘকাল ধরে বহিরাগত হানাদারদের অত্যাচারে ধনে মানে নিঃস্ব হয়ে গেছে, তখনো তারা কোচ-রাজাদের বিপন্ন করার জন্য কোনো প্রয়াস গ্রহণ করেনি। দশকের পর দশক জুড়ে ভুটানী হানাদাররা যখন প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের প্রজাদের জীবনে বিভীষিকা টেনে এনেছিল এবং দলে দলে গ্রাম শূন্য হয়ে যাচ্ছিল তখন এরা টুঁ-শব্দটি করেনি। কিন্তু দেবীসিংহের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। প্রাকৃত জনজীবনের মধ্য থেকে জাত এবং মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলার তাৎপর্যপূর্ণ এই রাজতন্ত্রের মুখ্য ঘটনাবলীর ধারাবাহিক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা গেল।

## ২. কোচশক্তির উদ্ভব কাহিনী

আগেই আভাসিত হয়েছে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসাম-বাংলার সীমানা-অঞ্চলে বসবাসকারী কোচজাতির এক গোষ্ঠী প্রধান হাড়িয়া < হরি মণ্ডল চিকনা পর্বতে একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ভূস্বামী ছিলেন। নৃতাত্ত্বিক বিচারে কোচগণ হলেন দ্রাবিড় ও বোডো-জাতির মিশ্রণ সঞ্জাত। শাস্ত্রীয় মতে পুরাকালের কোন ক্ষত্র-বংশ অবস্থা-বিপাকে পড়ে 'ভঙ্গক্ষত্রিয়'রূপে উত্তর বাংলার অরণ্যভূমিতে আত্মগোপন করে। সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-বংশীয় পুণ্ড্রগণের কোনো একটি শাখা এইভাবে এক সময়ের যুদ্ধ ও রাজ্য-পরিচালনার পরিবর্তে কৃষিকর্মে লিপ্ত হয়ে প্রাকৃত জনজীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর মত স্বভাবতঃই এরাও আর্য-ভাষাভাষী হয়ে যান। পরবর্তীকালে ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা বেয়ে আগত বিশাল ইন্দোচীনীয় 'বোডো'-গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে মিশ্রণে যে বিভিন্ন উপশ্রেণীয় কোম সৃষ্টি হয় 'কোচ' তাদের মধ্যে একটি। তবে নৃতাত্ত্বিক বিচারে যাই হোক—ভাষাতত্ত্বের বিচারে দেখা যাবে, এরা মূলত আর্যভাষা-গোষ্ঠীর এবং সেই কারণেই আর্যায়িত দ্রাবিড় পুণ্ড্রবংশীয়দের ঐতিহ্যজাত বলে অনুমানের সঙ্গে এই তথ্য মিলে যাচ্ছে। যাই হোক, লোকায়ত কোম-জীবন থেকে উঠে আসা এবং স্বভাবতঃই উপভাষার বৈশিষ্ট্যসহ বাংলা-ভাষী কোচগণ—মধ্যযুগীয় প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে গৌরবময় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইতিহাস-বিখ্যাত হয়ে রইলেন।

পূর্বকথিত হরি (?) মণ্ডলের রাজত্বের কেন্দ্রস্থল চিকনা পর্বত ছিল বর্তমান আসামের ধুবড়ী শহর থেকে ৫০ মাইল উত্তরে, সংকোশ ও চম্পাবতী নদীর মাঝখানে। হরি মণ্ডলের ছিল দুই স্ত্রী ও চার পুত্র, হীরাদেবীর গর্ভে বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ এবং জীবাদেবীর গর্ভে মদন ও চন্দন। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতান হুসেনশাহ কামতাপুররাজ নীলাম্বরকে উচ্ছেদ করে সেখানে নিজ পুত্র দানিয়েলকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আনুমানিক ১৫০৮ সালে দানিয়েল কামরূপেব অহমবংশীয় রাজা সুহঙ্গ-মুঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু মুসলিম অভিযান মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয় এবং এক খণ্ডযুদ্ধে দানিয়েল নিহত হন। দানিয়েলের মৃত্যুতে কামতাপুরের উপর তুর্কীশাসন পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। এই সুযোগে হরি (?) মণ্ডলের যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শী পুত্রগণ স্থানীয় তুর্কী কোতোয়ালকে যুদ্ধে পরাস্ত করে কামতাপুরের এক বড় অংশ দখল করে নেয়। এই যুদ্ধে জীবাদেবীর প্রথম পুত্র মদন নিহত হওয়ায়, বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও বিশ্বসিংহ নিজে সিংহাসনে না বসে, মদনের ভাই চন্দনকে বসান ( ১৫১০ খৃ ) এবং তাকে মহারাজা উপাধি দেওয়া হয়। মহারাজা চন্দনের আমলেই, প্রধানতঃ বিশ্ব-সিংহের সৈন্যাপত্যে ও যুদ্ধ-কৌশলে সমগ্র কামতাপুর রাজ্য কোচরাজের অধীনে চলে আসে। কোচরাজবংশের এটাই হলো পত্তনের ইতিহাস।

## ৩. মহারাজা বিশ্বসিংহ ( ১৫১৫-১৫৩৩ )

অপুত্রক মহারাজা চন্দনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দেন এবং একে একে সৌমার রাজ্য, বিজনী বিদ্যাগ্রাম এবং বিজয়পুর দখল করে নেন। উত্তরদিকে ভুটান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি ; অগত্যা তাঁকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়। কিন্তু এর পরে বিশ্বসিংহ যে দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন, তা হলো হুসেনশাহের রাজধানী গৌড় আক্রমণ। রণনীতি ও কূটনীতি-বিশেষজ্ঞ বিশ্বসিংহ এমন সময় গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন, যখন সুলতানী ( ১৫১২-১৮ ) সৈন্য ও সেনাপতিগণ ত্রিপুরা বিজয়ে ব্যস্ত। তুর্কী-সৈন্যের সঙ্গে নানা স্থানে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং মুসলিম-শক্তিকে ক্রমাগত পরাভূত করে। তিনি রংপুর-দিনাজপুর পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল ভূখণ্ড সুলতানী শাসন থেকে কোচবিহারের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

এই বিশাল রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য বিশ্বসিংহ রাজধানী চিকনা পর্বত থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে সমতলভূমিতে নেমে আসেন এবং বর্তমান আলিপুর-দুয়ারের পূর্বদিকে হিঙ্গুলাবাস নামক স্থানে রাজধানী নির্মাণ করেন। এই হিঙ্গুলাবাসের বর্তমান নাম মহাকালগুড়ি—সেখানে 'হিঙ্গুলাকোট' এখনো বর্তমান। যাই হোক, নতুন রাজধানীতে ক্ষমতা সংহত করার আগেই ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান নসরৎশাহ বিশ্বসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর এই সামরিক অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

## ৪. মহারাজ নরনারায়ণ ( ১৫৩৩-১৫৮৭ )

মহারাজা বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নরনারায়ণের রাজত্বকালই কোচরাজশক্তির বিকাশের চূড়ান্ত অধ্যায়। কোচবিহার তখন আর আঞ্চলিক রাজশক্তি নয়, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে তার প্রবেশ ঘটেছে। নরনারায়ণ নিজ নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার প্রবর্তন করেন, ঐ মুদ্রা তাঁর নাম অনুসারে 'নারায়ণী' মুদ্রা নামে পরিচিত হয় এবং বৃটিশ যুগ পর্যন্ত প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে, আসামে ও ভুটানে এই মুদ্রার ব্যবহার চলতে থাকে।

আকবর-নামার সাক্ষ্যে দেখা যায় নরনারায়ণের রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল তিব্বত। একথা সত্য হলে বুঝতে হবে ভুটানের রাজা কোন না কোন ভাবে নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করে করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৬৩০ সাল পর্যন্ত ভুটানরাজগণ যে কোচবিহার রাজ্যকে কর প্রদান করতো তার প্রমাণ রয়েছে। বীর মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বকালে ভুটানরাজ এই কর প্রদান বন্ধ করলেও আরো কিছুকাল পর্যন্ত প্রথা রক্ষার খাতিরে বার্ষিক উপঢৌকন পাঠাতে থাকে।

নরনারায়ণের আমলে কোচরাজ্য করোতোয়া নদীর পশ্চিম পাড়ে ত্রিহুত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, আকবর-নামায় সেকথা লেখা আছে। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে তিনি এদিকে রাজ্য বিস্তার করেন, সে বিষয়ে সঠিক জানা যায় না।

যাই হোক—উত্তরে কোচরাজ্যের ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি গৌড়ের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান কোচরাজ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই সংবাদ পেয়ে মহারাজ

নরনারায়ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সৈন্যাপত্যে এক বিরাট বাহিনীকে দিয়ে গৌড় আক্রমণে প্রেরণ করেন। কিন্তু স্থলেমান কররানীর ইতিহাস-বিখ্যাত পরাক্রান্ত সেনাপতি কালাপাহাড়ের কাছে শুক্লধ্বজ পরাজিত হন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই বিধ্বস্ত হয়। কালাপাহাড় এর পরে আসাম আক্রমণ করেন এবং বিজয়ীবাহিনী নিয়ে তেজপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। পথে তিনি কামরূপ কামাক্ষ্যা মন্দির ও আরো অনেক হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করেন। কালাপাহাড়ের এই বিজয় অভিযান রাজ্যজয়ের জন্য নয়, বরং ধ্বংস ও লুণ্ঠনের নেশায়। সে নেশা নিবৃত্ত হলে তিনি গৌড়ে ফিরে আসেন।

কিন্তু কালাপাহাড়ের এই বিধ্বংসী আক্রমণের ফলে কোচরাজ্যের পূর্ব সীমানায় যে রাজনৈতিক শূন্যতা বা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, কোচরাজ নরনারায়ণ তার সুযোগ গ্রহণ করেন। সেনাপতি শুক্লধ্বজের নেতৃত্বে তিনি এক বিরাট বাহিনী পূর্বদেশীয় রাজ্য দখলে প্রেরণ করেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে স্থলেমান কররানীর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় গৌড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সময়ে নরনারায়ণ আসামের রাজা স্থখাং গ্রাফার বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। স্থখাং গ্রাফার সৈন্যদলের সঙ্গে গৌহাটির নিকট কোচ-সৈন্যদের জলে স্থলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অহমরাজ এই যুদ্ধে পরাস্ত হলে নরনারায়ণ গৌহাটি, নীলাচল পর্বত, দরং, বেলতলী প্রভৃতি স্থান দখল করে নেন এবং আরো উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হন। চূড়ান্ত বিপদ বুঝে স্থখাং গ্রাফা নরনারায়ণের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সৌমার উপত্যকার পশ্চিমাংশ নরনারায়ণকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বিহার-প্রদেশের অধিকার নিয়ে সম্রাট আকবরের সঙ্গে গৌড়ের স্থলতান দাউদ খাঁর বিরোধ বাধে। ঐ বছর ৩রা আগষ্ট স্বয়ং আকবর বহু সংখ্যক রণতরী, রণহস্তী ও কামান নিয়ে অগ্রগামী মুঘল-সেনাপতি মুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে দাউদ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। দূরদর্শী কূটনীতিবিদ নরনারায়ণ এই সময় মুঘল-সম্রাটের সঙ্গে সামরিক আঁতাতে মিলিত হন এবং আকবরের অনুরোধে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অপর দিক থেকে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বিমুখী আক্রমণে ক্রমাগত পরাজয়ে বিতাড়িত হয়ে মুনিম খাঁ ওড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন। মুঘল-সেনাপতি মুনিম খাঁ গৌড়ের রাজধানী দখল করলেন। আর এদিকে নরনারায়ণ গঙ্গাতীর পর্যন্ত সমস্ত উত্তরবঙ্গে দখল বিস্তার করলেন। সামরিক আঁতাতভুক্ত বন্ধুরাষ্ট্রে কোচবিহারের এই রাজ্যবৃদ্ধি সম্রাট আকবর মেনে নিলেন।

এই সামরিক আঁতাতের ফলে মুঘল-সাম্রাজ্য কোচরাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমানারূপে পরিণত হওয়ায় সেদিক থেকে সামরিক বিপদের সম্ভাবনা রইলো না। অন্যদিকে করপ্রদায়ী ভুটানরাজের দিক থেকে আক্রমণেরও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব নরনারায়ণ এবার পূর্বদিকে আরো রাজ্য বিস্তারে মেতে ওঠেন। তিনি একে একে কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তিয়া এবং শ্রীহট্ট দখল করেন। অনেকের মতে তিনি ত্রিপুরাও দখল করেছিলেন। আকবর-নামায় কোচ-রাজ্যের সীমার যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় এই রাজ্য পশ্চিমে ত্রিহুত (মিথিলা), উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঝোড়াঘাট এবং আসাম-পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য ২০০ ক্রোশ (৮০০ মাইল) এবং প্রস্থে ৪৫ থেকে ১০০ ক্রোশ (অর্থাৎ ১৬০ থেকে ৪০০ মাইল) পর্যন্ত ছিল।

নরনারায়ণ এই বিস্তৃত রাজ্য একা ভোগ করেননি, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পশ্চিমভূমির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং পূর্বভূমির (কামরূপ সহ আসাম অঞ্চল) শাসনকার্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের হাতে অর্পণ করেন। কোচরাজ্যের বিস্তারে সেনাপতি শুক্লধ্বজের ভূমিকা ও কৃতিত্বই সর্বাধিক। তাঁর মত কুশলী যোদ্ধা এবং সফল সেনাপতি কোচরাজবংশে কেউ কখনো জন্মাননি।

## ৫. মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭)

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের মৃত্যু হলে তার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময় মুঘলদের সঙ্গে সীমানা নিয়ে কোচ-রাজ্যের বিরোধ বাধে। মুঘল-সৈন্য কোচরাজ্য আক্রমণ করে এবং গৌড় ও তার আশেপাশে গঙ্গাতীর সংলগ্ন বহু স্থান কোচ-শাসন থেকে ছিনিয়ে নেয়। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনী মুঘলদের নিকট পরাজিত হয়। আকবরের সেনাপতি আলিকুলি খাঁ কোচ-রাজ্যের সীমান্তবর্তী অনেক ভূখণ্ড দখল করে নেন। লক্ষ্মীনারায়ণ আকবরের সঙ্গে আলোচনা করে সীমানা-বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার জন্য দিল্লী যাত্রা করেন। কিন্তু দিল্লীতে যখন উপনীত হলেন তখন আকবরের মৃত্যু হয়েছে এবং জাহাঙ্গীর শাহ সিংহাসনে বসেছেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কোচরাজের অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিক হয় বর্তমান সীমানার পরিবর্তন করতে কেউ কারো অংশ দখল করবে না। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে লক্ষ্মীনারায়ণ কয়েকজন

কারিগর সঙ্গে আনেন এবং বর্তমান কোচবিহার জেলায় আঠারো-কোঠা গ্রামে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এখানে তাঁর তৈরী আঠারো-কোঠাযুক্ত প্রাসাদের নামেই গ্রামের নাম আঠারো-কোঠা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের সময় থেকেই কোচরাজ্যের বিস্তার ও গৌরব ধীরে ধীরে অবসিত হতে থাকে। তাঁর সময়েই আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তচ্যুত হয়। তবু লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবংশের অন্যতম শক্তিমান রাজা এবং আকবর-নামার সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, তাঁর বিপুল বাহিনী ২ লক্ষ পদাতিক, ৪ সহস্র অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী এবং ১০০০ রণতরী দিয়ে গঠিত ছিল।

## ৬. মহারাজ বীরনারায়ণ ( ১৬২৭-১৬৩২ )

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হলে তৎপুত্র বীরনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও প্রমোদবিলাসী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোন বৈদেশিক আক্রমণও হয়নি। প্রজাগণ শান্তিতেই বসবাস করছিল।

## ৭. মহারাজ প্রাণনারায়ণ ( ১৬৩২-১৬৬৫ )

মহারাজ বীরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১৬৩২ )। তাঁর অক্ষম উচ্চাশা এবং অদূরদর্শী কূটনৈতিক পদক্ষেপ কোচরাজ্যকে সমূহ বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

প্রথমেই তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং কামরূপরাজ পরীক্ষিতনারায়ণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। পরীক্ষিতনারায়ণকে শায়েস্তা করা নিজের পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে অতি উৎসাহে তিনি মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে হাত মেলান এবং বাংলার সুবাদার ইসলাম খাঁর নিকট একযোগে কামরূপ আক্রমণের অনুরোধ পাঠান। দুটি হিন্দু-রাজশক্তির মধ্যে বিবাদের এই সুযোগ ইসলাম খাঁ ছাড়লেন না। তিনি আব্দুল ওয়াহিদ-এর সৈন্যাপত্যে কামরূপ দখলের জন্য সৈন্য পাঠান। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে পরীক্ষিতনারায়ণ মুঘলদের দীর্ঘদিন প্রতিহত করে রেখেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হয়ে দিল্লীতে প্রেরিত হন।

বিজয়ী মুঘল-সৈন্য কোচহাজো এবং অহমরাজ্যগুলিকে দখল করলেও সামরিক আঁতাতভুক্ত বন্ধুরাষ্ট্র কোচবিহারকে উচ্ছেদের কোনো চেষ্টা করেনি। কিন্তু মুঘল-শক্তির সঙ্গে অনাক্রমণ আঁতাতের মূল্য প্রাণনারায়ণ বোধকরি যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই মুঘল-সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিপদে তিনি পূর্বচুক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে বন্ধুরাষ্ট্র আক্রমণ করেন। সাজাহানের অসুস্থতার খবর শুনে সিংহাসনলোভে সুবাদার সাহসুজা দিল্লী রওনা হলে এবং ভাই-মেয়ের মধ্যে সিংহাসন দখল নিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বাংলার মুঘল-রাজশক্তি দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে। এই সময় প্রাণনারায়ণ মুঘল-শক্তির অন্যতম কেন্দ্র ঘোড়াঘাট দখল করে নেন। তাছাড়া গোয়ালপাড়ার মুঘল-ফৌজদারকে পরাজিত করে গোয়ালপাড়া দখল করেন।

ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন দখল করেই মীরজুমলাকে বাংলরে সুবাদার করে পাঠান। ঘোড়াঘাট ও গোয়ালপাড়া মুঘলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধে মীরজুমলা প্রথমেই কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। এই বাহিনী ৩০০০০ পদাতিক, ১২০০০ অশ্বারোহী এবং বিপুল সংখ্যক রণতরী নিয়ে গঠিত ছিল। এই বিপুল বাহিনীর সঙ্গে প্রাণনারায়ণ পেরে ওঠেন না। মীরজুমলা পরাজিত কোচরাজার রাজধানী কোচবিহার দখল করেন এবং রাজ্য পরিচালনার ভার একজন সেনাপতির হাতে তুলে দিয়ে আসাম আক্রমণের জন্য রওনা হন। পরাজিত প্রাণনারায়ণ এই সুযোগে আরাধ্য অঞ্চল থেকে সদলবলে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুঘল-শাসনকর্তাকে বিতাড়িত ক'রে পুনরায় কোচবিহার দখল করেন। আসাম আক্রমণে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ঘটায় এবং অল্পদিনের মধ্যে নিজের মৃত্যু ঘটায়, মীরজুমলার পক্ষে কোচরাজ্যের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।

## ৮. মহারাজ মোদনারায়ণ ( ১৬৬৫-১৬৮০ )

মহারাজ প্রাণনারায়ণের মৃত্যুতে সিংহাসনের দখল নিয়ে রাজ্যে চক্রান্তে ছেয়ে যায়। অবশেষে প্রাণনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মোদনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু প্রাসাদে ষড়যন্ত্র চলতেই রইল। শক্তিশালী আমলা নাজিরদেব রাজার অনুগত কর্মচারীদের একে একে হত্যা করেও বিশেষ সুবিধা

করতে না পেয়ে শেষে প্রকাশ্যে মোদনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজধানী অবরোধ করেন। তুমুল যুদ্ধের পর মহীনারায়ণ পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। মহীনারায়ণের পুত্রগণ ভুটানে আশ্রয় নেয় এবং ভুটান সরকারের সাহায্য নিয়ে দু তিনবার কোচরাজ্য আক্রমণ করে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়। আভ্যন্তরীণ বিবাদের দিনে বহিরাক্রমণকে এড়িয়ে চলেন মোদনারায়ণ। তিনি মুঘলদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং অম্বররাজ মানসিংহের আসাম আক্রমণেব সময় (১৬৬৬)—মোদনারায়ণ সৈন্যাদি নিয়ে মুঘল সেনাপতিকে সাহায্য করেন।

## ৯. ভুটানের বৈরিতা

কোচবিহার-রাজশক্তিব অন্তর্কলহ ও দুর্বলতার দিনগুলিতে ভুটানের ক্রমাগত আক্রমণ কোচরাজশক্তির ক্রমাবনতিকে দ্রুততর করে তোলে। সে ইতিহাস পরবর্তী কয়েকজন কোচরাজের রাজত্বকালের বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। মোদনাবায়ণের বাজত্বকালে দেখতে পেয়েছি যে, ভুটানরাজ কোচরাষ্ট্রদ্রোহী মহীনারায়ণ ও তাব পুত্রকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়—ভুটানরাজের সৈন্য-সাহায্য নিয়ে তারা কোচবিহার আক্রমণ করেছে। পর পর তিনবার তাদের আক্রমণ প্রতিহত হলেও মহারাজ মোদনারায়ণের মৃত্যুতে তারা কোচরাজ্য দখল করতে সক্ষম হন।

মহারাজ মোদনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করলে নাজির মহীনারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ ভুটিয়া-সৈন্যসহ কোচবিহারের রাজধানী আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। ভুটিয়া-সৈন্যগণ রাজধানীতে যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও হত্যা কার্য চালিয়ে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার করে তুললো। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত জগদেব ও ভুজদেব সসৈন্যে কোচবিহারে ছুটে আসেন এবং অবৈধ দখলদার দর্পনারায়ণকে বিতাড়িত করে মোদনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বাসুদেবনারায়ণকে সিংহাসনে বসালেন।

## ১০. মহারাজা বাসুদেবনারায়ণ ( ১৬৮০-১৬৮২ )

বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের সাহায্যে ও সমর্থনে বাসুদেবনারায়ণ সিংহাসনে বসলেন বটে কিন্তু তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হলো না। কিছুকালের মধ্যে মহীনারায়ণের অপর পুত্র যজ্ঞনারায়ণ পুনরায় একদল ভুটানী-সৈন্য নিয়ে কোচবিহার আক্রমণ করে। মহারাজ বাসুদেবনারায়ণ সসৈন্যে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে অগ্রসর হন। দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হয়। কিন্তু যুদ্ধে বাসুদেবনারায়ণ পরাজিত ও নিহত হন। যজ্ঞনারায়ণ সিংহাসন দখলে অগ্রসর হতে থাকে। এই সংবাদ বৈকুণ্ঠপুরে পৌছামাত্র জগদেব ও ভুজদেব রায়কত আবার সসৈন্যে কোচবিহারের দিকে ছুটে যান অবৈধ দখলদারদের বিতাড়িত করতে। নিহত বাসুদেবনারায়ণের সৈন্য-সামন্ত এবং রাজকর্মচারীরাও রায়কতদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যজ্ঞনারায়ণকে আক্রমণ করে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু হতাহতের পর যজ্ঞনারায়ণ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলো। যাবার আগে কিন্তু তারা কোচপ্রাসাদকে সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত, নিঃস্ব এবং ক্ষতবিক্ষত করে রেখে গেল। নিহত বাসুদেবনারায়ণের কোন পুত্র না থাকায়, রায়কতগণ এবার বাসুদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিষ্ণুনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান।

## ১১. মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ( ১৬৮২-১৬৯৩ )

মহেন্দ্রনারায়ণ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫ বছর। তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে রায়কতগণ বৈকুণ্ঠপুরে ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে রাজ্যের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এই সুযোগে যজ্ঞনারায়ণ ও তাঁর ভাই জগৎনারায়ণ রাজ্যে বারে বারে হানা দিতে আরম্ভ করে। পরগণাগুলির শাসনকর্তারা অনেকেই পরিস্থিতি বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কেউ কেউ আবার মুঘল-পক্ষে যোগ দিয়ে মোঘলের প্রতিনিধিরূপে পরগণাগুলি শাসন করতে গেল। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘোড়াঘাট পরগণা মুঘলদের অধিকারে চলে যায়। এই সময় বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ ও পাঙ্গার রাজকুমারগণও মুঘলকে কর দিয়ে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হন। ডাইনে বাঁয়ে সাহায্যকারী কেউ না থাকায় মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ অবশেষে তার শত্রু যজ্ঞনারায়ণের সঙ্গেই সন্ধি করে ফেলেন এবং ভুটান-রাজাকেও বন্ধুভাবে পেতে

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই চেষ্টা সফল হয়। যজ্ঞনারায়ণকে সেনাপতির পদ দেওয়া হয়। রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে মুসলমান অধিকার বাড়তে থাকায় কোচরাজ মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধে ভুটানরাজও কোচ-রাজের পক্ষে যোগ দেন। ভীষণ যুদ্ধে যজ্ঞনারায়ণ পরাজিত হয়ে দেহত্যাগ করেন। বিজয়ী মুসলমানগণ বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ পরগণা দখল করে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যু ঘটে।

## ১২. মহারাজ রূপনারায়ণ ( ১৬৯৩-১৭১৪ )

অপুত্রক মহেন্দ্রনারায়ণেব মৃত্যুতে মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ সর্বসম্মতিক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রপৌত্র রূপনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি মুঘলের দ্বারা দখলীকৃত কোচভূমি দখলের জন বঙ্গপুরের মোঘল ফৌজদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধে জয় পরাজয় চূড়ান্ত কিছু না হওয়ায় মুঘলের সঙ্গে সম্মানজনক সন্ধি করলেন। তাব ফলে হারানো বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ পরগণা কোচরাজ্যাধীনে এলো এবং কার্যীহাট, কাকিশ ও ফতেপুরে মুঘল অধিকার বর্তালো। কিন্তু অল্পকাল পরেই সন্ধি অমান্য করে মুঘলগণ কোচরাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে রূপনারায়ণ পরাজিত হন। মুঘলরা যথারীতি আবাব বোদা, পাটগ্রাম আর পূর্বভাগ দখল করে। ক্রমাগত রক্তক্ষয় বন্ধ করে মহারাজ রূপনারায়ণ নিজ নাজিবের নামে এ পরগণাগুলি মোঘলদের নিকট থেকে ইজারা নেন।

মহারাজ রূপনারায়ণ আঠারো-কোঠা থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন গুড়িয়াহাটিতে যেখানেই এখন কোচবিহার শহর। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির ও বিগ্রহ তাঁরই স্থাপিত।

## ১৩. মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭১৪-১৭৬৩ )

মহারাজ রূপনারায়ণের মৃত্যুতে তাঁর পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে ভুটানরাজ কোচবিহারের উত্তরাংশের ভূমি দখল করতে থাকেন। মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ভুটানের কয়েকবার যুদ্ধ হয়। কিন্তু ভুটানকে স্থায়ীভাবে পরাজিত বা প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ অনেক বয়স পর্যন্ত অপুত্রক থাকায় দীনেন্দ্রনারায়ণ নামক একটি বালককে দত্তক নিয়েছিলেন এবং বয়সকালে তাকে যুবরাজপদেও বরণ করেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহারাজের পুত্রসন্তান জন্মানোয় সিংহাসন-লাভে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় দীনেন্দ্রনারায়ণ রংপুরের ফৌজদার মোহাম্মদ আলি খাঁ-এর সঙ্গে যোগ দেন এবং তাকে কোচবিহার আক্রমণে প্ররোচিত করেন। মহম্মদ আলি বিশাল সৈন্যদল নিয়ে কোচবিহার আক্রমণ করেন। উপেন্দ্রনারায়ণ এই আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। পরাজিত মহম্মদ আলি পলায়ন করেন। কিন্তু কোচরাজ্য মুসলমান-শক্তির সঙ্গে যখন যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক সেই সময় উত্তর দিক থেকে ভূটানরাজ সসৈন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কোচরাজ্যের উত্তরাংশে অনেক ভূখণ্ড দখল করে নেন।

## ১৪. মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৬৩-১৭৬৫ )

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় শিশু দেবেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসানো হয়। নাবালক রাজার রাজত্বকালে ভূটান সরকার কোচবিহারের রাজ্যভুক্ত চাকলাগুলি একে একে দখল করতে থাকে। কিন্তু ভূটানকে নিরস্ত করার শক্তি কোচবিহারের ছিল না। এই সময় ভূটানের স্থায়ী রাজপ্রতিনিধি কোচ-দরবারে হাজির থাকার নিয়ম চালু হয়। ইতিমধ্যে বালক-রাজা একদিন মাঠে খেলা করবার সময় আততায়ীর হাতে নিহত হন।

## ১৫. মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৬৫-১৭৭০ )

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারী কেউ না থাকায় দেওয়ান দেও খড়্গনারায়ণের পুত্র ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ সর্বসম্মতিক্রমে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় ভূটান-রাজ জালাশ, মাণ্ডাস, লক্ষ্মীপুর, সণ্ডরাবাড়ী, মরাঘাট, ভল্কা প্রভৃতি স্থান দখল করায় ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ভূটানের সঙ্গে ব্যাপক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ভূটানরাজ তাঁর প্রত্যুত্তরে বক্সায় মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে ভোজসভায় আনয়ন করে কৌশলে বন্দী করেন এবং এই সঙ্গে আরো বন্দী হন তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণ, দেওয়ান দেও এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অমাত্যগণ। বন্দীদের ভূটান-রাজধানী পুণাখে নিয়ে কারাগারে রাখা হয়।

## ১৬. মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৭০-১৭৭২ )

মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারয়ণকে কৌশলে সিংহাসনচ্যুত করে ভুটানরাজ-প্রতিনিধি 'পেন-সুৎমা' রাজ-ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র-চালনার সব ক্ষমতা পেন-সুৎমার হাতেই থাকে। নামেমাত্র 'মহারাজ' রাজেন্দ্রনারায়ণ সামান্য কিছু ভরণ-পোষণ পেতেন। তাতে তাঁর সংসার খরচা চলতো না। অগত্যা ব্যক্তিগত খামারের আয়ে তাঁর ও রাজ-মাতার পেট চলতো। দুই বছর পর জরাক্রান্ত হয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন।

এখানেই আমরা কোচরাজবংশের প্রথম যুগের ইতিবৃত্ত শেষ করছি। এই বংশের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হবে ইংরেজের সহায়তায় ভুটান-রাজশক্তির উচ্ছেদের কাহিনী দিয়ে। সে ইতিহাস আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচনার জন্য রেখে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে পিছে ফেলে আসা গৌড়-বরেন্দ্রের ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যাক।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( ত্রয়োদশ অধ্যায় ) :—

1. কোচবিহারের ইতিহাস—আমানত উল্লা আহমদ খাঁন চৌধুরী
2. বাঙ্গালার ইতিহাস –রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
3. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন
4. বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়
5. বৃহৎ বঙ্গ—দীনেশচন্দ্র সেন
6. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—মজুমদার ( সম্পাদিত )
7. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
8. কোচবিহারের ইতিহাস—হেমন্তকুমার রায় বর্মা
9. Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement —H. N. Choudhury.
10. Settlement Report on Western Duars—J. Sunder.
11. District Hand book ( Cooch Behar )— A. K. Mitra
12. District Gazetter ( Cooch Behar )—
13. Census Report of Bengal ( 1872 )—H. Beverty

# চতুর্দশ অধ্যায়

## গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাস ( ১৫৩৮-১৭৬৫ )

### ১. ভূমিকা

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুঘল যুগ শুরু হলেও, গৌড়ে অন্ততঃ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তা ধরা যায় না। অবশ্য ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের গৌড় দখল এবং বিলাস-ব্যসনে অতিবাহিত কয়েকটি মাসকে মুঘলযুগের সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করা গেলেও যথার্থ সত্য হ'ল এই যে, ভারতে মুঘলযুগের মধ্যেও যেমন শেরশাহের পর্বকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়, বাংলার ইতিহাসে অবশ্য শুধু শেরশাহের বংশই নয়, কররানীবংশকেও অন্তর্ভুক্ত ধরে নিতে হয়। আমরা অবশ্য দুটি বংশের শাসনকে স্বতন্ত্র উপচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করবো। কারণ মুঘলদের ভাবী ইতিহাস গৌড়-বরেন্দ্রের ইতিহাসকে পরবর্তীকালে যতই প্রভাবিত করুক —শেরশাহ ও কররানীবংশের শাসনের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

### ২. শূরবংশের শাসনকাল ( ১৫৩৮-৬৪ খৃ. )

কর্মনাশা নদীর তীরে চৌসা-নামক স্থানে শেরশাহ কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণে মুঘল-শিবির বিধ্বস্ত হলে হুমায়ুন কোনক্রমে পালিয়ে আগ্রায় চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শেরশাহ গৌড় আক্রমণ করে সেখানকার মোঘল শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলিকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়-বরেন্দ্র-সহ অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেন ( ১৫৩৮ )। এইভাবে গৌড়ে শূরবংশীয় শাসন প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী সনে খিজির খাঁকে গৌড়ের শাসন-ভার অর্পণ করে শেরশাহ আগ্রা অভিমুখে অভিযানে বহির্গত হলেন। বিশগ্রামের যুদ্ধে সমগ্র উত্তর ভারতের শাসনভার শেরশাহের করায়ত্ত হয়। শেরশাহ আগ্রা দখল করলে হুমায়ুন লাহোর অভিমুখে পলায়ন করেন। শেরশাহ লাহোর অধিকার করে খোসাব পর্যন্ত অগ্রসর হন। [ Elliot's History of India—Vol-IV. p-383 ]. শেরশাহ যখন ভারত বিজয়ে ব্যস্ত, খিজির খাঁ তখন বঙ্গে স্বাধীন হয়ে উঠেছেন। খবর পেয়ে পাঞ্জাব থেকে ছুটে এলেন শেরশাহ এবং খিজির

খাঁকে বন্দী করে গৌড়ের শাসনভার অর্পণ করলেন কাজী ফজিলৎ-কে [ ১৫৪১ ]। এর পর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে আদিল শা' সাহাবাজ এবং ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুরশাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দিন নাম ধারণ করে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে বসেন। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে তিনি নিজ পুত্রের হাতে নিহত হন। পিতৃহন্তা তৃতীয় গিয়াসুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করলেন বটে ( ১৫৬৪ ), কিন্তু তাঁর রাজ্যভোগলিপ্সা পূর্ণ হলো না। ঐ বছরই কররানী-বংশীয় তাজ খাঁর হাতে তিনি নিহত হলে গৌড়-বরেন্দ্র কররানীবংশের শাসনাধীনে চলে যায়।

## ৩. কররানীবংশের শাসন ( ১৫৬৪-৭৬ )

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাজ খাঁ গৌড়ের সিংহাসন দখল করে সুলেমান কররানীকে তার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এক বছরের মধ্যে তাজ খাঁর মৃত্যু হলে সুলেমান স্বাধীন সুলতান হিসেবে আট বছর রাজত্ব করেন ( ১৫৭২ খৃ. পর্যন্ত )। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সুলেমানের সঙ্গে কোচরাজ্যের বিরোধ ঘটে এবং যুদ্ধে কোচ-সেনাপতি চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন। বিজয়ী সেনাপতি কালাপাহাড় কামরূপ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং কামাখ্যা-সহ বহু মন্দির ধ্বংস এবং প্রচুর ধন-দৌলত লুণ্ঠন করে গৌড়ে ফিরে যান। চিলারায়কে কিছুকাল পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমানের মৃত্যু হলে প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ সুলতান হন এবং পরে গৃহবিবাদে বায়াজিদ নিহত হলে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ গৌড়ের শাসনভার গ্রহণ করেন। দাউদের রাজত্বকালে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর আকবরের সৈন্যবাহিনী গৌড়ের রাজধানী তাণ্ডা দখল করে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ আকবরের এই অভিযানকে সাহায্য করেন এবং ফলে দাউদ খাঁ পরাজিত হলে তাঁর রাজ্য নরনারায়ণ ও আকবরের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়। এইভাবে ঘোড়াঘাট প্রভৃতি গৌড়ীয় ভূখণ্ড নরনারায়ণের হস্তগত হয়।

আকবরের প্রতিনিধিরূপে গৌড়ের শাসনকর্তা মুনিম খাঁ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলে দাউদ খাঁ পুনরায় গৌড় দখলের জন্য সসৈন্যে

অগ্রসর হন। এই সংবাদে আকবরও টোডরমল এবং খাঁ জহানকে সসৈন্যে গৌড়ে প্রেরণ করেন এবং নিজেও পশ্চাতে আরো সৈন্যসহ রওনা হন। বিহারের শাসন-কর্তা মজঃফর খাঁও এই অভিযানে মিলিত হলেন। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হলেন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁর শিরচ্ছেদ করা হলো। [ ১৫৭৬ খৃ. ১২ই জুলাই ]। এইভাবে গৌড়ে কররানীবংশের শাসনের অবসান ঘটলে স্থায়ীভাবে মুঘল-শাসনের প্রতিষ্ঠা হলো গৌড়-বরেন্দ্রে।

## ৪. গৌড়-বরেন্দ্রে মুঘল-শাসনের ইতিহাস

বিশাল বাহিনীর অভিযান দিয়ে বহু ধুমধাম করে গৌড়ে মুঘল-শাসনের সূত্রপাত হলেও মুঘল-শাসনে গৌড়ে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে এলো না। মোঘল-শাসনের প্রথম কুড়ি বছর সমগ্র গৌড়বঙ্গে বিদ্রোহ, অরাজকতা, আফগানদের লুঠতরাজ, বার ভূঁইয়ার স্থানীয় প্রভুত্ব দেশের রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্তিকে খর্ব করলো।

আকবরের প্রথম প্রতিনিধি খান-ই-জাহান তিন বছর রাজ্য শাসন করে মারা গেলেন ১৫৭৮ খৃ. ১৯শে ডিসেম্বর। সুবাদার হয়ে এলেন মুজাফ্‌ফর খাঁ। এই দুর্বল শাসকের আমলে রাজকর্মচারীরা বিদ্রোহী হয়ে মুজাফ্‌ফর খাঁকে পরাজিত ও বধ করলো। বিদ্রোহীদের নেতা মীর্জা হাকিম নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। .১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমনে আকবর অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফল হলো না। প্রায় এক বছর অরাজকতার পর ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়বঙ্গ আবার আকবরের শাসনে এলো। তিনি ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য সুবার মত সুবে বাংলার জন্যও সুবাদারী শাসনের প্রবর্তন করলেন যার শিরোদেশে থাকবেন সিপাহসালার ( বা সুবাদার ), তাঁর অধীনে দিওয়ান ( রাজস্ব বিভাগের প্রধান ), বখ্‌শী ( সৈন্যবিভাগের প্রধান ), কাজী ( নগরের প্রধান বিচারক ) এবং কোতোয়াল ( নগরের শাসক ও শান্তিরক্ষক )।

ওয়াজীব খান বাঙ্‌লার প্রথম সিপাহসালার নিযুক্ত হলেন ( ১৫৮৭ )। সে বছরই তাঁর মৃত্যু ঘটলে সৈয়দ খাঁ নিযুক্ত হলেন সিপাহসালাররূপে। তাঁর সাত বছরের অযোগ্য শাসনে মুঘলদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ তো হলোই না, উল্টে পাঠানদের ও জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলো। অবস্থা সামাল দিতে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠানো হলো। এতে

কাজ পাওয়া গেল। মানসিংহ শাসনভার গ্রহণ করেই চারিদিকে পাঠান ও ভূঁইয়াদের দমন করতে সৈন্য পাঠালেন। তাঁর পুত্র হিম্মৎসিংহ ভূষণা দখল করলেন ( ১৫৯৫ )। ঐ বছরই মানসিংহ রাজমহলে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তিনি নিজে ইশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং পাঠানদিগকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে পাঠিয়ে ক্ষান্ত হলেন। অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করলো। কিন্তু মুঘলশাসনের উন্নতি ও কল্যাণ করতে এসে মানসিংহের ব্যক্তিগত ক্ষতি হলো প্রচুর। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁকে পুনর্বার আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর পুত্র দুর্জনসিংহ নিহত হলেন। ঐ বছরই মানসিংহের অপর পুত্র হিম্মৎসিংহ কলেরায় মারা গেলেন। এক বছরের মধ্যে দুই দুইটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় শোকাতুর মানসিংহ আজমীরে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাকে সুবেদারের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো না। মানসিংহের অধীনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহকে বাঙলা শাসনের কাজ করতে পাঠানো হলো। এক বছরের মধ্যে তাঁব মৃত্যু হলে মানসিংহের নাতি মহাসিংহকে শাসনভার গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো। মহাসিংহ মালদহে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করতে পারলেও—অন্যান্য স্থানে বিফল হলেন। অবস্থা বেগতিক হওয়ায় মানসিংহকে আবার বাংলায় আসতে হয় ( ১৬০১ ) এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি সমস্ত বিদ্রোহীদের অন্ততঃ সাময়িকভাবে পরাজিত করে সারা বাঙলায় মুঘলশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় এসেই মানসিংহকে বদলী করে কুৎবুদ্দিনকে বাংলার সুবাদার করেন। কুৎবুদ্দিন বর্ধমানের শের আফগানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলে, জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ বাংলার সুবাদার হন ( ১৬০৭ )। তিনি মাত্র ৫ বছর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন এবং বাংলায় মুঘলশাসনকে দৃঢ়বদ্ধ করেন। পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ ভূষণার জমিদার, ভুলুয়ার জমিদার প্রভৃতিকে পরাজিত করে খ্যাত হন। শ্রীহট্টের পাঠানগণ, আরাকানের মগগণ এবং কামরূপে পরীক্ষিৎনারায়ণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইসলাম খানের সময়ই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গে মুঘলশাসন নিষ্কণ্টক এবং পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ইসলাম খাঁর আমলে যা আয়ত্ত করা গিয়েছিল পরবর্তী সুবাদার কাসিম খাঁর ভুল শাসনে তা হারিয়ে গেল। দেশ জুড়ে আবার বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দিল। কাসিম খাঁর বাইরের অভিযানগুলিও সফল হলো না। তাঁর সৈন্য অহমরাজের সঙ্গে যুদ্ধে এবং চট্টগ্রাম অভিযানে পরাজিত হয়ে ফিরে

আসে। জাহাঙ্গীব স্ববাদার বদল করে ইব্রাহীম খানকে পাঠান। ইব্রাহীম খাঁ দেশে মুঘল অধিকাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন ঠিকই, কিন্তু এই সময় জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান বিদ্রোহী হয়ে রাজমহল দখল করেন এবং বাংলা বিহার ওড়িষ্যায় ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেন। ইব্রাহীম রাজমহল আক্রমণ করলে বিদ্রোহী সৈন্যদের কাছে পবাজিত ও নিহত হন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান দিল্লীব সম্রাট হলে তৎপুত্র সুজা বাংলার স্ববাদার হন। সুজার সুদীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ শাসনে (১৬২৯-৫৯) বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক সঙ্গতি ভালো হয়। কিন্তু ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃ-দ্রোহের ফলে সিংহাসন-দখলকারী আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর হাতে তাড়িত হতে হতে সুজা আরাকানে প্রবেশ করেন ও সেখানে নিহত হন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা বাংলাব স্ববাদার হন। তিনি প্রথমেই কোচ-বিহার আক্রমণ করেন। তাঁর অত্যন্ত বিশাল বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পেরে ওঠা যাবে না জেনে বিনা রক্তক্ষয়ে কুচবিহাররাজ বাজধানী ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু মীরজুমলা যখনই কামরূপ জয়ের জন্য অগ্রসব হলেন তখন স্বল্পসংখ্যক মুঘলদের বিতাড়িত করে কোচবাজ হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। মীরজুমলা কামরূপও বিনা বাধায় জয় করলেন। কারণ অহমরাজও অযথা যুদ্ধ না করে বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। ইতিমধ্যে বর্ষা এসে গেলে অহমসৈন্যগণ দলে দলে এসে মুঘল-ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে। রাস্তাঘাট জলে ডুবে যাওয়ায় খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লে বিচ্ছিন্ন শিবিরগুলি সহজেই অমহসৈন্য কর্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তাছাড়া জলে ডুবে, অসুখে ভুগে এবং খাদ্যের অভাবেও অনেক সৈন্য মারা যায়। প্রায় অধিকাংশ সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ সব নষ্ট করে খালি হাতে মীরজুমলা বাংলায় ফিরে আসেন। কিন্তু ঢাকায় পৌছবার আগেই পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ বাঙলার স্ববাদার হন এবং দীর্ঘ ২২।২৩ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি যথেষ্ট আয়েসী ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন কাটিয়ে গেছেন। তবে তিনি দিল্লী-সম্রাটকে প্রত্যাশার অতিরিক্ত রাজস্ব ও উপঢৌকন পাঠিয়ে খুশী রেখে গেছেন এবং নিজের গদীকে অক্ষুন্ন রেখেছেন, যদিও তা প্রজাসাধারণের উপর কর-ভার চাপিয়েই করা হয়েছিল। তিনি নাকি প্রথম ১৩ বছরের স্ববাদারীকালে নিজস্ব তহবিলে ৩৬ কোটি টাকা সঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর দৈনিক আয় ছিল দুই লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ছিল এক লক্ষ টাকা। [ অধ্যাপক

সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা দেশের ইতিহাস ( মজুমদার সম্পাদিত ) ২য় খণ্ড —পৃ. ১৪২ ]

শায়েস্তা খাঁর পর খান-ই-জাহান বাহাদুর বাংলার সুবাদার হলেন (১৬৮৮)। কিন্তু অপদার্থতার জন্য এক বছরের মধ্যেই তাঁকে পদচ্যুত করে ইব্রাহিম খানকে সুবাদার করা হয়। এই সময় ঘাটালের শোভাসিংহ ও তাঁর ভাই হিম্মৎ সিংহের পরিচালিত বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার জন্য ইব্রাহিম পদচ্যুত হন। তখন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুদ্দীন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুবাদারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফারুক-সিয়র দিল্লীর সম্রাট হলে তাঁর নাবালক পুত্র ফারখুন্দাসিয়র বাংলার নবাব নিযুক্ত হন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা-সম্পন্ন মুর্শিদকুলী খাঁ এই বালকের অধীনে নায়েব-সুবাদার হন এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পুরোপুরি নবাব নাজিম রূপে নিযুক্ত হন। এ সময় দিল্লীর শাসন দুর্বল হওয়ায় মুর্শিদকুলি খাঁ অপ্রতিহত ক্ষমতায় বাংলা শাসন করতে শুরু করেন।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলির মৃত্যু হলে ( নিঃসন্তান )—তাঁব জামাতা শুজা-উদ্দীন সুবাদারেব পদটি দখল করেন। এই বিলাসী ও দুর্বল চরিত্রের নবাবের আমলে বিশ্বস্ত রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ী-মহল অন্যায় পথে ধন-সংগ্রহ আবম্ভ করে। শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হন ( ১৭৩৯ খৃ. )। তিনি পিতার চেয়ে অযোগ্য ও চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দুর্বল শাসনে রাজ্য জুড়ে বিশৃংখলা শুরু হলে বিহারের নবাব আলিবর্দী খাঁ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। সরফরাজ খাঁও সসৈন্যে মুর্শিদকুলিকে আক্রমণ করতে রওনা হন। যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলে আলিবর্দী বাংলা ও বিহারের যুগ্ম নবাব হন [ ১৭৪০ খৃ. ]।

আলিবর্দীব আমলে ওড়িষ্যার সঙ্গে বিরোধ, বর্গীর আক্রমণ এমনভাবে লেগে রইল যে, প্রৌঢ় ও সুযোগ্য আলিবর্দী তাঁর দীর্ঘ নবাবী শাসনের (১৭৪০-৫৬) প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত বিড়ম্বিত দিন কাটিয়েছেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মারাঠাদের নিকট কোন প্রকার একটা সন্ধিতে উপনীত হয়ে ১২ বছর পরে তিনি বর্গীর হাঙ্গামা থেকে দেশকে বাঁচান। কিন্তু এই বারো বছর ধরে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিশৃংখলাতে দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল এবং আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেল।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আলিবর্দী খাঁর মৃত্যু হলে—তাঁর দৌহিত্র

সিরাজদৌলা নবাবী দখল করেন। তাঁর নবাব হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি আপত্তি ছিল—বড় পিসি ঘেসেটি বেগমের এবং গোপন আপত্তি ছিল আলিবর্দীর ভগ্নিপতি মীরজাফরের। তাছাড়া মেজো পিসির ছেলে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকৎজঙ্গও নবাবীর দাবীদার ছিলেন। ফলে নবাব-পরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র দেখা দিল। অল্পবয়সী ও বদরাগী সিরাজ নিজের কাজের দ্বারাও বহু লোককে শত্রু করে তুললেন এবং নবাবী দখল করার সাথে সাথে ঘসেটি বেগমকে বন্দিনীরূপে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এই সময় ইংরেজদের সঙ্গেও নবাবের সম্পর্কের অবনতি হল এবং নবাব-পরিবারে অনৈক্যের সন্ধান পেয়ে তারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করতে সাহসী হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণ জয় লাভ করায় ( ২৩শে জুন, ১৭৫৭ খৃ. ) বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের করতলগত হয়। এই যুদ্ধের ফলে যে শুধু সিরাজ-দৌলার নবাবী গেল, তাই নয় দু'শ বছর ধরে বাঙালীর স্বাধীনতা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত হল।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( চতুর্দশ অধ্যায় )

1. History and Culture of the Indian People—
R. C. Mazumdar (Ed)-Vol.-VI
2. Cambridge History of India—Vol-III
3 Akbarnamah—Abul Fazal ( Tr. H. Beveridge ).
4. Mughal North-East Frontier Policy—
S. N. Bhattacharya.
5. Bengal under Akbar & Jahangir—T. Roy Choudhury
6. History of Bengal—V-III, J. N. Sarkar ( Ed )
7. North-East-Frontier of Bengal—Machenzie
8. Alamgirnamah—Tr. H. Vansittart
9. Advance History of India—Mazumdar and other
10. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
11. বাংলাদেশের ইতিহাস—মজুমদার ( সম্পাদিত )

# পঞ্চদশ অধ্যায়

# প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে কোচরাজতন্ত্র

[ দ্বিতীয় পর্ব খৃ. ১৭৭২ থেকে খৃ. ১৯৫০ পর্যন্ত ]

## ১. ভূমিকা

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি কীভাবে ভুটানরাজতন্ত্র কোচরাজতন্ত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে করতে অবশেষে কোচ-রাজকেই বন্দী করে নিয়ে গেছে তাঁদের রাজধানীতে। তা সত্ত্বেও কোচরাজ্য সরাসরি শাসনের চিন্তা ভুটান সরকার করেনি। এ ধরনের ভূমি-দখল এই সময়ে সম্ভব ছিল না। কারণ মুর্শিদাবাদে তখন ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই নয়, প্রত্যক্ষ শাসনে স্বাধীন কোচরাজ্য ও তার জনগণের বিপুল প্রতিরোধ ছিল প্রত্যাশিত। তাই রাজবংশীয় কোন ব্যক্তিত্বকে 'পুতুল'রূপে খাড়া রেখে কোচবিহার শাসন করাই ভুটান সরকারের নীতি ছিল। ওদিকে মিত্ররাজ্য বলে চিহ্নিত বৈকণ্ঠপুরও সরাসরি রাজ্য দখলে বিরুদ্ধ শক্তিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। অতএব ভুটানের পুরাতন নীতিই চালু রইলো—মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালেও।

## ২. মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৭২-১৭৭৫ )

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি—'পুতুল-রাজ' রাজেন্দ্রনারায়ণ মাত্র দু' বছর রাজত্ব করেই জরাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। এই অবস্থায় ভুটান-রাজপ্রতিনিধি 'পেন্‌সুৎমা'র আদেশ অগ্রাহ্য করে নাজিরদেও ও অন্যান্য পরিবার পারিষদবর্গ বন্দী মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান এবং সসৈন্যে আক্রমণ চালিয়ে পেন্‌সুৎমাকে কোচরাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করেন। পেন্‌সুৎমা কোচরাজ-প্রাসাদের এই আকস্মিক বিদ্রোহে বক্সদুয়ার দিয়ে ভুটানে পালিয়ে যান এবং ভুটানরাজকে এই দুঃসংবাদ জানান।

## ৩. ভুটানরাজের কোচবিহার দখল ও বৃটিশ-সহায়তায় উদ্ধার

পেন্‌সুৎমার বিতাড়নের অপমানের শাস্তিরূপে ক্রুদ্ধ ভুটানরাজ সঙ্গে সঙ্গে ৪০০০ সৈন্যের এক বাহিনী পাঠিয়ে কোচরাজধানী আক্রমণ করেন। নাবালক রাজার প্রতিনিধিরূপে নাজিরদেও সম্মিলিত কোচসৈন্য নিয়ে ভুটানের এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। ভুটানের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল প্রাণভয়ে পলায়ন করে।

প্রাথমিক যুদ্ধে পরাজয়ে হতোদ্যম না হয়ে ভুটানরাজ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র জিম্পেকে সেনাপতি করে ১৮০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী দিয়ে কোচবিহার আক্রমণে পাঠান। "সঞ্চামিনী" নামক স্থানে কোচসৈন্যেরা ভুটানীদের গতিরোধ করে। তুমুল যুদ্ধে শত শত সৈন্য নিহত ও আহত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোচসৈন্য পরাজিত হয়ে পশ্চাৎ অপসরণ করতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে নাবালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে রাজমাতা রংপুরে পালিয়ে যান এবং বৃটিশ-শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভুটান-সেনাপতি জিম্পে রাজধানী দখল ক'রে চারিদিকে হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগ শুরু করেন। রাজধানীর চারপাশে বিষমিশ্রিত খুঁটি পুঁতে রাজধানীর দুর্গকে নিরাপদ করে তোলেন। তিনি রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে যে-কোন সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে গীতালদহ, বাশাডাঙ্গা, মওনারী প্রভৃতি নানা স্থানে দুর্গ গঠন করতে থাকেন। কিন্তু অধিকৃত দেশ-শাসনের ভাগ্য জিম্পের ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে কোচরাজের সঙ্গে লর্ড হেষ্টিংসের সামরিক আঁতাত সই হয়ে গেছে এবং মিঃ পার্মিং-এর অধীনে এক রেজিমেণ্ট বৃটিশ-সৈন্য জিম্পেকে বিতাড়িত করতে রওনা হয়েছে। কয়েকটি যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হতে হতে ভুটান-সৈন্য রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ভুটান সরকার ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্যরা মুক্তি পান। কিন্তু কোচবিহার বৃটিশের অধীন করদরাজ্যে পরিণত হয়েছে শুনে, ধৈর্যেন্দ্র সিংহাসনে বসতে অস্বীকার করেন এবং বাক্‌রহিত হন। এইভাবে ক্রমাগত ভুটিয়া আক্রমণে এবং অবশেষে ইংরেজের সঙ্গে আরক্ষা-চুক্তি করতে গিয়ে করদরাজ্যে পরিণত হওয়ায় সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কোচবিহারের ইতিহাস সমাপ্ত এখানেই হয়।

## ৪. অপর মহারাজগণের তালিকা ( ১৭৭৫-১৯৫০ )

এর পরেও ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৭৫-১৭৮৩ ), হরেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭৮৩-১৮৪০ ), শিতেন্দ্রনারায়ণ ( ১৮৪০-১৮৪৭ ), নরেন্দ্রনারায়ণ ( ১৮৪৭-১৮৬৩ ), নৃপেন্দ্রনারায়ণ ( ১০৬৩-১৯১১ ) রাজেন্দ্রনারায়ণ ( ১৯১২-১৯১৩ )। জিতেন্দ্র নারায়ণ ( ১৯১০-১৯২২ ) রিজেন্সি কাউন্সিল ( ১৯২২-১৯৩৬ ) এবং রাজা জগদীশচন্দ্র ( ১৯৩৬-১৯৫০ ) ইংরেজাধীন বাজত্ব পরিচালনা করে গেছেন। এই সময়কার ইতিহাস আর যথার্থভাবে কোচরাজ্যের ইতিহাস নয়—আসলে বৃটিশ রাজত্বের ইতিহাস; রাজনৈতিক ঘটনার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তখন ইংরেজ আর তার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

## ৫. বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে কোচরাজবংশের অবদান

৪৩৫ বর্ষব্যাপী কোচরাজবংশের শাসন ঐতিহাসিক কালের উত্তর বাংলার শুধু বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনাই নয় এখানকার ধর্ম, লোক-সংস্কৃতি, লিপি-সাহিত্যের বিকাশের ধারায় তার অবদান অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিশেষতঃ মধ্যযুগে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং বিকাশে এই রাজবংশের অতুলনীয় ভূমিকা সমগ্র বাংলাদেশই গর্বিত ও যথার্থভাবে উপকৃত। ধর্ম, শিল্পকলা, শিক্ষার বিকাশ প্রতিক্ষেত্রেই এই রাজবংশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

## ৬. ধর্ম ও মন্দির-স্থাপত্য

উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান মন্দির নির্মাণে এবং লোকধর্মের প্রসারে কোচ-রাজবংশ প্রভূত চেষ্টা করে গেছেন। উত্তরবঙ্গ যে শৈব-মত-প্রধান হিন্দুদের আবাসস্থল তার মূল কারণও এই রাজবংশের ধর্মবোধের মধ্যে নিহিত।

কোচরাজবংশের মূল প্রতিষ্ঠাতা হরি ( হাড়িয়া ) মণ্ডল ( ১৪৯০ ? ) শৈব ছিলেন এবং সেই থেকে মহারাজ রূপনারায়ণের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ( ১৭০৪ ) কোচরাজবংশে প্রধানতঃ শৈব-বিশ্বাসের ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মহারাজ রূপনারায়ণের সময় থেকে বৈষ্ণববাদের প্রতি এই রাজবংশ অনেকখানি ঝুঁকে পড়লেও "শিব", এবং তার শক্তিরূপে দুর্গা এবং

কালী উপাসনার মূল ধারাটি এই বংশ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে গেছে। তার ফলে উত্তরবঙ্গের মূল জনধারায় শৈবমতের এত প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে।

মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় প্রাচীন অথচ বিস্মৃত শক্তিপীঠ, কামাখ্যা-মন্দিরের স্থান আবিষ্কার করেন। ঐ স্থানে তখন প্রায় কিছুই ছিল না। তিনিই ওখানে প্রথম মন্দির তৈরী করে দেন এবং কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ এনে, দেবোত্তর ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করে নিত্যপূজার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। বিশ্বসিংহ শৈব ছিলেন। তিনি কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট শৈবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড় ও বোড়োর জাতির মিশ্রণ-জাত কোমগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির দ্রুততর বিস্তারের জন্য এই রাজবংশের দান সর্বাধিক। মহারাজ নরনারায়ণের সময় থেকে অনেক মৈথিলী ব্রাহ্মণ কোচরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি নিয়ে বসবাস ও পূজা-অর্চনা করতে থাকেন। সুলেমান কররানীর সেনাপতি কালাপাহাড়-কর্তৃক কামাখ্যা-মন্দির বিধ্বস্ত হলে মহারাজ নরনারায়ণ তার পুনর্নির্মাণ করেন। তাছাড়াও 'হয়গ্রীব মাধবের' মন্দির ও আরো কয়েকটি মন্দিরও তিনি তৈরী করেন। উত্তরবঙ্গে সর্ব প্রথম "দুর্গাপূজা" করান মহারাজ নরনারায়ণ স্বয়ং।

নরনারায়ণের সময় চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণববাদের প্রসার ঘটতে থাকে উত্তরবঙ্গে এবং সেই সময় স্বয়ং চৈতন্যদেব এসেছিলেন কামরূপ-কামতাপুর রাজ্যে। বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক শংকরদেব নরনারায়ণের রাজ্যে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর রচিত শ্রীমদ্ভাগবত ও কৃষ্ণগুণাবলী গ্রন্থ—বাঙালি ও অসমীয়া-সাহিত্যের যৌথ সম্পদ [তখনো বাঙ্‌লা-অসমীয়া পৃথক হয়নি]। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক মাধবদেব উত্তরবঙ্গে আসেন এবং কোচরাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি "ভক্তি রত্নাবলী", "শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য" এবং "আদিকাণ্ড" রচনা করেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণই অরণ্যে পরিত্যক্ত জল্পেশ-মন্দির পুনরাবিষ্কার ও পুনরুদ্ধার করেন। তিনি যে নতুন মন্দির নির্মাণ শুরু করেন, তাঁর প্রপৌত্র মোদনারায়ণ তা সমাপ্ত করেন এবং মন্দিরে নিত্যপূজার খরচ বাবদ ৪৪ খানা জোত দান করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ বাণেশ্বর-মন্দির ও ষণ্ডেশ্বর-মন্দির

পুনর্নির্মাণ করান। গোমানীমারীতে কামতেশ্বরী-মন্দিরও তিনি নতুন করে নির্মাণ করেন।

মহারাজ নরনারায়ণ কোচবিহারে "মদনমোহন ঠাকুরের" মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং তথায় স্বর্ণবিগ্রহ স্থাপিত করেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ সাগর-দীঘি খনন করেন এবং তাঁর পশ্চিম তীরে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। তাছাড়া ধলুয়াবাড়ীতেও তিনি একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। শিবোপাসক হরেন্দ্রনাথ দিন রাত ধ্যান ও জপে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করতেন এবং রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তিনি নিজেই অনেকগুলো শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন।

কোচরাজগণ ধর্মমতের ব্যাপারে উদার ছিলেন। শৈব-শাক্ত ও বৈষ্ণব-বিরোধ এ রাজ্যে কখনোই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। এই রাজবংশ আদিবাসী ও অন্যান্য লৌকিকজনের ধর্মমতের কোন বিরুদ্ধাচরণ করেননি। কোচরাজগণ কোনদিনই জাতিভেদ নিয়ে গোঁড়ামি করেননি, এমন কি যবন-অস্পৃশ্যতাও স্বীকার করেননি। তাঁদের সেনাবাহিনীতেও মুসলমান সৈন্য নেওয়া হতো।

## ৭. বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা

মধ্যযুগে যখন বাংলা-ভাষা, লোক-ভাষা বলে শিক্ষিতজন দ্বারা উপেক্ষিত এবং সামাজিক বিধান প্রণেতাদের ভাষায় সাহিত্য-চর্চা পর্যন্ত "রৌরব নরকে" যাবার রাস্তা বলে ফরমান ঘোষিত হল, তখন কোচবিহার-রাজবংশই এগিয়ে এসেছিল—বাংলা-ভাষায়, সাহিত্য-চর্চায় এবং রাজকার্য পরিচালনে। বাংলা গদ্যে প্রথম চিঠি লেখার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব এখন পর্যন্ত কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণের। তিনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে সমকালীন অহমরাজকে বাংলা গদ্যে রচিত একটি চিঠি লেখেন। কিন্তু তার অনেক আগেই কোচরাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্য রচিত হতে শুরু হয়েছে। মহারাজ নরনারায়ণের (১৫৩৩-১৫৮৭) রাজসভা বহু জ্ঞানী-গুণী দ্বারা অলংকৃত ছিল। তাঁকে কামরূপের বিক্রমাদিত্য বলা হতো। তাঁর সভাপণ্ডিত অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতী রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পদ্যানুবাদ করেন। নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় সমকালীন বাংলায় শঙ্করদেব "সীতা স্বয়ম্বর" (নাটক), "শ্রীকৃষ্ণগুণাবলী" এবং

শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ রচনা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে মাধবদেব তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেন এবং "ভক্তিরত্নাবলী" "শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য" রামায়ণের "আদিকাণ্ড" অনুবাদ করেন। গোবিন্দ মিশ্র শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় পদ্যানুবাদ করেন। মহারাজ বীরনারায়ণের সময় পণ্ডিত কবিশেখর "কিরাতপর্ব" গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময় রাজদরবার সংস্কৃত-সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেও এ সময় বিশারদ কবি কর্তৃক মহাভারতের "বিরাটপর্ব" ও "কর্ণপর্ব" অনূদিত হয়। মোদনারায়ণের সভাকবি দ্বিজ কবিরাজ "দ্রোণখণ্ড" অনুবাদ করেন। মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণের আদেশে রাম সরস্বতী "ভীষ্মপর্বের" অনুবাদ করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কামতানগরের অধিবাসী কবি শ্রীনাথ মহাভারতের "বিরাট পর্ব" রচনা করেন। ঐ সময় দ্বিজনারায়ণ "নারদীয় পুরাণের" পদ্যানুবাদ রচনা করেছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই একজন প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তিনি "বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ", "উপকথা", "স্কন্দপুরাণ", "রাজপুত্র উপাখ্যান", "কৃষ্ণযোগসার" "রামায়ণ" ( সুন্দরকাণ্ড ) এবং "মহাভারত" ( কৌশিক পর্ব ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অনেকগুলি শ্যামা-সঙ্গীতও রচনা করেন। এ ছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় "বিষ্ণুপুরাণ" "ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ" "ভাগবতপুরাণ" "নৃসিংহপুরাণ" প্রভৃতি বাংলায় অনূদিত হয়। এসব অনুবাদ যেমন প্রাঞ্জল তেমনি সুললিত। রচনার মাধুর্যে একে অনুবাদ মনে না হয়ে নতুন সৃষ্টি বলে মনে হবে। কোচ-রাজসভায় মধ্যযুগে যে ব্যাপক অনুবাদ-সাহিত্য ও মৌলিক রচনা হয়েছে—তা সত্যিই বাঙালীর গর্বিত ঐতিহ্য।

## ৮. শিল্পকলা

প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব থাকায়, তাছাড়া বন্যার প্রকোপ বেশি থাকায় এখানে ইট-পাথরের সুবিশাল স্থাপত্য গড়ে ওঠার বাধা সৃষ্টি করেছে। এই সেদিন পর্যন্ত দ্বিতলগৃহ নির্মাণেই মানুষের আপত্তি দেখা গেছে। তবুও কোচরাজগণ সেকালের সে সব স্থাপত্যকীর্তি রেখে গেছেন। ভূমিকম্প, বন্যা ও কালের ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে তার মধ্যে যা রক্ষা পেয়েছে, তার থেকে এতদঞ্চলের স্থাপত্যকলার উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এই রাজবংশ-নির্মিত কামাখ্যা-মন্দির এবং

ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়গ্রীবমাধবের মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে। কামরূপের শৈলভূমিতে কোচরাজগণের কীর্তি টিঁকে রয়েছে। কেননা তা প্রস্তর-নির্মিত; কিন্তু গোসামীমারীতে তাঁদের কামতেশ্বরী-মন্দির কালের স্রোতে জীর্ণ হয়ে গেছে। গোসামীমারীর রাজপ্রাসাদ আজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

স্থাপত্য-শিল্পের প্রতি কোচরাজগণের আকর্ষণেব অভ্রান্ত প্রমাণ—তারা বাঙলার বাইরে থেকে পর্যন্ত কারিগর এনে সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির নির্মাণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। মহারাজ লক্ষীনারায়ণ তো জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লী থেকে কারিগর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর আঠারো-কোঠা প্রাসাদ তৈরী করার জন্যে।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ ও মোদনারায়ণকৃত জল্পেশ-মন্দিরের শক্তিমান গঠন, তার উচ্চতা, প্রকোষ্ঠ-কল্পনা প্রভৃতি এখনো দর্শকদের বিস্ময়। তেমনি বাণেশ্বর-মন্দিরও প্রাচীন স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এ সব নির্মাণ-কলার মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছে—গঠনের দৃঢ়তা ও পৌরুষ। বন্যা ও ভূমিকম্প-প্রধান উত্তরবাংলায় সঠিক দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। মীর-জুমলার সমসাময়িক ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন লিখে গেছেন যে, কোচ-রাজধানীতে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ছিল, রাজপথগুলি খুব সরল ও বৃক্ষশোভিত এবং পূর্বভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় কোচবিহারের জলবায়ু, গাছপালা এবং বাসগৃহগুলি উত্তম।

কোচরাজ্যের প্রাচীন দুর্গগুলি প্রায়ই অস্থায়ীভাবে তৈরী; মাটির প্রাচীর আর পরিখাই ছিল প্রাথমিক নিরাপত্তার প্রধান ব্যবস্থা। দুর্গকেন্দ্রিক যুদ্ধ এখানে খুব বেশি হয়নি। সমতলভূমিতে যে-কোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারতো এবং বস্তুতঃ ছোট ছোট সৈন্যদলের খুচরো আক্রমণ বহুকাল যাবত লেগেই ছিল।

যাই হোক, পরবর্তীকালে নগর-পরিকল্পনা এবং প্রাসাদ তৈরীতে কোচরাজগণ আধুনিকতম স্থপতিদের সংগ্রহ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এফ. বার্কলি সাহেবকে চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ যে বিশাল প্রাসাদ তৈরী করেন, তা আজও কোচবিহারের প্রধান দর্শনীয় বস্তু হয়ে রয়েছে।

## ৯. শিক্ষাবিস্তার

কোচরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহ নিজে শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর সূত্রপাতেই তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়ের উচ্চশিক্ষার্থে তাদের বারাণসীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে নরনারায়ণ রাজা হয়ে নিজ রাজ্যে সংস্কৃত-শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক আয়োজন করেন। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ তাঁর রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য সংস্কৃতভাষায় বিখ্যাত ব্যাকরণ "প্রয়োগরত্নমালা" রচনা করেন। মহারাজ বীরনারায়ণ নিজের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন এবং রাজকর্মচারীদের পুত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ প্রায় আবশ্যিক স্তরে নিয়ে এসেছিলেন। রাজ্যে তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সেগুলো পরিদর্শনে যেতেন।

মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের সময় কোচবিহারে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কোচবিহার শহরে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে—জেঙ্কিন্স হাই স্কুল স্থাপন করেন। উত্তরবঙ্গে আধুনিক (ইংরেজি) শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই স্কুলটির ভূমিকা অনন্য। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চশিক্ষার প্রসারে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজে তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম. এ. ও আইন পড়ার ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় দীর্ঘকাল এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ নারীশিক্ষার প্রবর্তন এবং মহারানী সুনীতি দেবীর নামে "সুনীতি একাডেমি" প্রতিষ্ঠিত করেন। একথা আজ অনস্বীকার্য যে—বাংলার অনেক স্থানের চেয়ে আগে প্রান্তিক উত্তর বাংলায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তার যে সম্ভব হয়েছিল—তার মূলে ছিল কোচ-রাজবংশের অগ্রণী ভূমিকা ও উৎসাহ।

## ১০. জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণ

বৃটিশ সরকারের অধীন অঞ্চলগুলির চেয়ে কোচরাজাদের শাসনাধীন অংশে জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণের কাজ যে বেশি দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল তা এককথায় অনস্বীকার্য। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময় (১৭১৪-১৭৬৩)

সমস্ত জমি জরিপ করানো হয়। আধুনিক শহর সৃষ্টি ও তার পৌর সুবিধাগুলি মানুষের আয়ত্তগম্য করা হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় সর্বোচ্চ আপীল আদালত সৃষ্টি করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়িতে নৃপেন্দ্রনারায়ণ পাবলিক হল তৈরী হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার-রাজার প্রদত্ত জমিতে সুইস জুবিলী স্যানাট্যারিয়াম তৈরী হয়। এই সময় গীতালদহ থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত "ন্যারো গেজ" রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মনে রাখা দরকার সমস্ত রেলপথ কোচরাজের খরচায় তৈরী এবং এটা ছিল ঐ স্টেটের নিজস্ব সম্পত্তি। নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময় জেলায় অনেকগুলো প্রধান সড়ক, হাসপাতাল ও স্কুল নির্মিত হয়। প্রধান প্রধান শহরও পরিকল্পনা মত গড়ে তোলা হয়।

মোটকথা আধুনিক সমাজ-জীবন গড়ে তোলার পক্ষে সময়ের স্রোতের উপরে ভরসা না করে কোচরাজগণ আপন উদ্যমে ও কর্মকুশলতায় তাকে জনসাধারণের কাছে আগেই পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে স্বাধীন ভারতের আইন অনুসারে রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে কোচবিহারকে ভারতের মধ্যে মিশে যেতে হয়। রাজতন্ত্রের সেই অনিবার্য আত্মবিলুপ্তির দিনেও কোচবিহাররাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ তাঁর প্রজাদের কল্যাণে শেষ এক কোটি টাকা দান করে এখানকার জনসাধারণের প্রতি এই রাজবংশের মমত্ববোধের চূড়ান্ত পরিচয় রেখে গেলেন।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( পঞ্চদশ অধ্যায় )


1. বাংলাদেশের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )—মজুমদার সম্পাদিত
2. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
3. কোচবিহারের ইতিহাস—আমানত উল্লা খান্
4. কোচবিহারের ইতিহাস—হেমন্তকুমার রায় বর্মা
5. ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর-( প্রবন্ধ )—( জলপাইগুড়ি জেলা শত-বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ )—অরুণভূষণ মজুমদার
6. Cooch Behar State and its land Revenue Settlement—H. N. Choudhury
7. Settlement report on Western Duars—I. Sunder
8. Eastern Frontier of British India—A. C. Banerjee

# ষোড়শ অধ্যায়

## ইংরেজ-শাসনে উত্তরবঙ্গ

[ প্রথম পর্বঃ কোম্পানীর যুগ ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) ]

### ১. উত্তরবঙ্গে ইংরেজ-বসতির সূত্রপাত

ভারতবর্ষে ইংরেজরা প্রথমে প্রবেশ করেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। উত্তরবঙ্গেও তাই। উত্তরবঙ্গে ব্যবসা ও কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রিচার্ড এডওয়ার্ড উত্তরবঙ্গে আসেন। তিনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মালদা জেলায় রেশমবস্ত্র উৎপাদনের কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসা স্থাপনের বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ খতিয়ে দেখবার জন্যই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর সুপারিশ-ক্রমেই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুরনো মালদা শহরের এক ভাড়া বাড়ীতে উত্তরবঙ্গের প্রথম ইংরেজ কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে ইংরেজরা স্থানীয় জমিদার রাজারায় চৌধুরীর নিকট থেকে পুরনো মালদা শহরের দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মোকদ্দমপুর মৌজায় ১৫ বিঘা জমি মাত্র ৩০০ টাকায় খরিদ করেন এবং নতুন কারখানা ও বসতি স্থাপন করেন। এইভাবেই হলো উত্তরবঙ্গের মাটিতে ইংরেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

আগেই বলেছি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল 'মোটিভ' নিয়েই ইংরেজরা দূর দেশ পাড়ি দিয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ও অযৌক্তিক দাবী নিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে মুসলিম রাজশক্তির প্রথম সংঘাত বাধে এবং তারই ফলে ক্রমান্বয়ে ভারতের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী ইংরেজের হাতে চলে যায়। ভারতে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাতের সেই প্রধানতম কারণকে অনুধাবন করতে গেলে—ঘটনার আরেকটু গোড়া থেকে জানা দরকার।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে কালিকট বন্দরে এসে নামেন। পর্তুগীজ এই নাবিকের জলপথে ভারতাগমন বিকাশশীল ইয়োরোপের কাছে ভারতের দ্বার মুক্ত করে দিল। অতঃপর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ সকলেই বাণিজ্যের স্বার্থে ভারতে প্রবেশ করে। ১৬০০

খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মহারানী এলিজাবেথের নিকট থেকে পূর্বদেশীয় জলপথে একক-বাণিজ্যের অধিকার পেয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুমাত্রা, জাভা ও ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সুরাটে কারখানা স্থাপনের অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু নৌ-যুদ্ধে পর্তুগীজদের দমন করে, সম্রাটের বিনানুমতিতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মাসুলিপত্তমে এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কারখানা স্থাপন করেন। যাই হোক, ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অগত্যা সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজদের প্রয়োজনীয় ফরমান প্রদান করেন। সম্ভবতঃ নৌ-যুদ্ধে ইংরেজদের বিশেষ সুবিধা করা যাবে না জেনেই তিনি অগত্যা এই 'ফরমান' প্রদান করেন।

অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকেও ইংরেজরা একটি ফরমান বের করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় আবগারী শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের অধিকার আদায় করে বার্ষিক মাত্র ৩০০০ টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিতে। নবাব শায়েস্তা খাঁ এ ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আনবার চেষ্টা করলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ বাধে এবং ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে হুগলিস্থিত নৌ-ঘাটি থেকে তারা স্থানীয় ফৌজদারকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে। দশ বছর বিরোধ ও সংঘাতের শেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে নতুন সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে ইংরেজগণ আপাততঃ বিরোধ মিটিয়ে নেয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক লাভে বেপরোয়া ইংরেজ অনিবার্যভাবেই বাংলার নবাবদের সঙ্গে সামরিক সংঘাত এড়াতে পারেনি এবং যার অনিবার্য পরিণতিতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর মাঠে নবাব-সৈন্য পরাজিত হয় এবং ইংরেজগণ ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে শাসকীয় ক্ষমতায় অবতীর্ণ হয়। পূর্বভারতে তাদের এই জয় হুগলী, কলকাতা ও মালদার কারখানার উৎপাদন, বিক্রয় এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু ফুলে ফেঁপেই উঠলো না, রাজশক্তির সহায়তায় একচেটিয়া কারবারের পথে, অযৌক্তিক সুবিধার মোড়কে, ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের দ্বার সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল।

## ২. ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনের সূচনা

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাবকে পরাজিত করলেও ইংরেজরা বাংলার শাসন-ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে হাতে নিল না। কারণ তাদের মূল উদ্দেশ্য—

অবাধ ব্যবসায় অর্থ রোজগার, শাসনের দায়িত্ব, খরচা ও ঝুটঝামেলা পোহানো নয়। কিন্তু ৯ বছর পর এই আর্থিক লোভেই অবশেষে তারা শুধুমাত্র 'দেওয়ানী' কার্যটি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইল, কারণ সেখানে রয়েছে রাজস্ব। ব্যাপারটা খুবই সরল। বছরে মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতিতে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যায় যথেচ্ছ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার আদায় করে নিল। অথচ নবাবের উপর রইলো সারা বাংলার রাজ্য-শাসন-ভার; তার জন্য বার্ষিক খরচা ধার্য হলো মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা। ফলে ইংরেজের হলো বিপুল রাজস্ব লাভ, পূর্বভারতের জনগণের জীবনে নেমে এলো অরাজকতার অন্ধকার; কারণ অর্থহীন ক্ষমতাহীন পুতুল সরকারের তথাকথিত নবাবগণ রাজ্যশাসনের অনুপযোগী হয়ে পড়লেন।

যাই হোক, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 'দেওয়ানী' লাভের সাথে সাথে সারা বাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ, কোচবিহার আর বৈকুণ্ঠপুর বাদে, সমস্ত ভূখণ্ড ইংরেজদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে এলো। কিন্তু এই বিরাট ভূখণ্ডকে তারা যথাযথ শাসনের স্বার্থে সুবিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হলেন না। রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর এই তিনটি মাত্র জিলার মধ্যে পুরো উত্তরবঙ্গের বিশাল ভূখণ্ডকে শুধু নয়, সেই সঙ্গে ভাগলপুর বিভাগের কিছু অংশ, দক্ষিণ আসামের কিছু অংশ এবং গঙ্গার দক্ষিণেরও কিছু অংশকে শাসনের চেষ্টা চলতে থাকে। এরকম অবাস্তব চিন্তা ইংরেজদের মধ্যে ছিল, কারণ তারা তো শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের দিকে চিন্তা করছিলেন, সবচেয়ে কম খরচা করে। তাই রাজস্ব আদায়ের জন্যও নিজস্ব প্রশাসনযন্ত্র তৈরী করার মধ্যে গেল না, সেই পুরাতন মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের বন্দোবস্তের নিয়মকেই আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু নতুন যেটুকু করলো তা হলো আরো মারাত্মক—অর্থাৎ স্থায়ী মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে খাজনা আদায় না করে, ইজারাদারী ব্যবস্থার পত্তন। শিথিল ও ব্যয়বহুল নবাবী আমলাতন্ত্রের মধ্যে না গিয়ে বা জমিদারী জায়গীরদারী প্রথার স্বল্পআয়ী ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে অতিরিক্ত লোভের আশায় ইজারাদারী প্রথার প্রবর্তন কৃষকদের কাছে মারাত্মক সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কারণ অস্থায়ী ইজারাদার অতিরিক্ত নীলামের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে-কোনো পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহে আগ্রহী হ'ল। খাজনা ছাড়াও অতিরিক্ত অন্যান্য দাবী মেটাতে গিয়ে কৃষকদের আর্থিক বোঝা দুর্বহ হয়ে উঠলো।

অন্যদিকে রাজ্যশাসনে ইংরেজের অনীহা ও নবাবের অক্ষমতা সাধারণ

আইন শৃংখলা-পরিস্থিতি একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। পুরাতন শাসনপদ্ধতি ভেঙ্গে পড়লো, অথচ নূতন শাসনপদ্ধতি কেউ গড়ে তুললো না—ফলে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র তখন চোর, ডাকাতের, উপদ্রব, ফকির আর সন্ন্যাসীর লুঠতরাজ, ধন আর প্রাণের নিরাপত্তাহীনতা জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুললো।

## ৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

এই পরিস্থিতিতে আবার নেমে এলো ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ মূলতঃ ইংরেজের ভুল রাজস্বনীতির ফল। এবং এই দুর্ভিক্ষে যে বিপুল জীবনহানি হয় তা প্রধানতঃ শাসকশ্রেণী তথা তাদের অধ্যয়ন আমলা ও সহযোগী ধনিকশ্রেণীর নির্দয়তা ও সাহায্য হীনতার ফল। এই দুর্ভিক্ষে সারা বাংলার প্রায় ৩০ ভাগ লোক, চাষী শ্রেণীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শাসকশ্রেণীতো সাহায্যের হাত বাড়ায়ই নি, উপরন্তু এই দুর্ভিক্ষের বছরেও করহার বাড়ানো হয়েছে—এবং আদায়ে কোন শৈথিল্য দেখানো হয় নি। উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র এই দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা অনুভূত হয়। তার মধ্যে রংপুরেই চাষীদের অবস্থা সর্বাধিক সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়।

এই দুর্ভিক্ষে বহুগ্রাম লোকশূন্য হয়ে যায়, এবং বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বসতি-এলাকা জঙ্গলে পরিণত হয়। দলে দলে লোক চুরি, ডাকাতি ও দস্যুবৃত্তিতে যোগ দেয়। দেশ সম্পূর্ণ অরাজকতায় ছেয়ে যায়। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ভারতের আর কোথাও হয়নি এবং শাসকীয় শ্রেণীর অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য আর নির্দয়তায় এত বেশি লোক-মৃত্যু আর কোথাও ঘটেনি। ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণই সেদিন শুধু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল তা নয়, কোম্পানীর অনেক দায়িত্বশীল কর্মচারীই সেদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য-পরিচালনার চূড়ান্ত অপদার্থতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষের বছরের আগে থেকেই যে ইংরেজের শাসনের ভয়াবহ কুফল দেশের উপর প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরের নিকট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লেখা, কোম্পানীরই উর্ধ্বতন কর্মচারী রিচার্ড বীচারের লেখা পত্র। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "আমি জানি, একথা শুনতে যে-কোন ইংরেজ লোকই ব্যথা পাবে যে, কোম্পানী এ দেশের 'দেওয়ানী'

লাভের পব থেকেই এ দেশের অবস্থা পূর্বের থেকে খারাপ হয়েছে ; তবু এ সত্য সন্দেহেব অতীত। এই সুন্দর দেশ, যা একনায়কী ও স্বৈরতন্ত্রী শাসনেও বিকাশশীল হয়ে উঠেছিল, তা আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে।”

## ৪. কোচবিহাররাজের সার্বভৌমত্বের অবসান

একদিকে যেমন ইংরেজ শাসনাধীন উত্তরবঙ্গে ইজারাদি রাজস্ব-নীতি শাসনহীন অরাজকতা আর দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠছে—অন্যদিকে তেমনি উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক রাজ্যদ্বয় কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরে চরম দুরবস্থা।

মহারাজ বাসুদেবনারায়ণের ( ১৬৮০-১৬৮২ ) সময় থেকেই কোচবিহার-রাজ্যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে, একদিকে মুসলমান আক্রমণ, পশ্চিম থেকে বৈকুণ্ঠপুরেব আমলা, উত্তর থেকে ভুটিয়াদের আক্রমণ, রাজপরিবারের অন্তর্কলহ একদা প্রতাপশালী এই রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ অসহায়, দুর্বল এবং সংকুচিত করে এসেছিল।

১ অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, কোচবিহাবরাজ্যের উপর ভুটিয়াদের আক্রমণের তীব্রতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণের সময় কোচরাজ্যের উত্তর সীমানার বিপুল অংশ ভুটিয়াবা দখল করে নেয় এবং কোচবিহারের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও রাজ্যশাসনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপ শুরু করে। কোচরাজসভায় পেন্সুৎমাকে প্রায় স্থায়ীভাবে ভুটানরাজপ্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। ( তার অনুমতি ছাড়া সরকারের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব ছিল না )। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভুটানরাজ কৌশলে কোচরাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করে রাজধানী পুনাখে নিয়ে যান। অতএব পেন্সুৎমা রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। ভুটানী আধিপত্য ক্ষুব্ধ নাজিরদেব ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ রাজেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, পেন্সুৎমার আপত্তি সত্ত্বেও, নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসান। ক্ষুব্ধ ভুটানরাজ ৪০ হাজার সৈন্য-সহ কোচবিহার আক্রমণ করেন। নাজিরদেব কাশীশ্বর লাহিড়ী এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুটানরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ১৮ হাজার সৈন্যসহ কোচবিহার আক্রমণ করেন। সঞ্চামিনি নামক স্থানে ভয়াবহ যুদ্ধে কোচ-সৈন্য পরাজিত হয়ে পশ্চাৎ

অপসরণ করে। নাবালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে রাজমাতা রংপুরে আশ্রয় নেন।

পরিত্যক্ত রাজপুরীতে বিজয়ী সৈন্য ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে, নিরীহ নাগবিকদেব উপর অত্যাচারে রাজধানীর জীবনে বিভীষিকা টেনে আনে। সেনাপতি জিম্পে কোচবিহারপ্রাসাদে মূল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অবস্থান করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী দিয়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে দখল কায়েম করতে পাঠান। তাছাড়া তিনি গীতালদহ, মওয়ারী, বালাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে নূতন দুর্গ নির্মাণ কবে বিজিত রাজ্যে আপন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে থাকেন।

যাই হোক, ১৭৭২ সালে ভুটানরাজ সম্পূর্ণ কোচরাজ্য গ্রাস করে রাজধানীতে পবেশ করলে নাবালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে রাজমাতা পাঙ্গাতে আশ্রয় নেন এবং ইংরেজ-সৈন্যের সাহায্যে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হন। বাংলার গভর্ণর তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস। দিনাজপুরে কোম্পানীর এজেণ্ট মিস্টার হেরিসের মাধ্যমে কোচবিহাররাজ প্রস্তাব পাঠালো যে, কোম্পানীকে কোচবিহার সরকার এক লক্ষ নারায়ণী স্বর্ণমুদ্রা দেবে, বিনিময়ে ইংরেজ-সৈন্য কোচবিহার থেকে ভুটানীদের তাডিয়ে ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসাবে।

ক্ষমতা-লোভী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের গভর্ণর হেষ্টিংস এতে সম্মত হলেন না। তাঁরা কোচবিহারকে বার্ষিক কর দিতে এবং রাজনৈতিক পাহারায় আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হতে বাধ্য করেই তবে সামরিক সাহায্য দিতে রাজী হলো। নিরুপায় এবং রাজ্যহীন কোচবিহাররাজ নিজের শেষ অস্তিত্বটুকু রক্ষা করতে উক্ত সর্তে রাজী হলেন। এইভাবেই আড়াইশ' বছরের পুরাতন কোচ-রাজশক্তির সার্বভৌমত্ব ইংরেজের হাতে চলে যায়।

## ৫. প্রথম ভুটানযুদ্ধ ( ১৭৭২ )

কোচবিহাররাজ ও কোম্পানীর মধ্যে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এক রেজিমেণ্ট সৈন্য ও ৪টি কামানসহ সেনাধ্যক্ষ মি. পার্লিং কলকাতা থেকে রংপুর হয়ে মোগলহাটে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি তাঁর সহযোগী ক্যাপ্টেন জোন্‌স ধবলা নদী অতিক্রম করে গীতালদহ দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে নাজিরদেব ও কোচ-সেনাপতি ভগবন্তকুমার সসৈন্যে গীতালদহ দুর্গের উপর

ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং পরাজিত ভুটিয়া সৈন্য পশ্চাৎ অপসরণ করে বালাডাঙ্গা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংরেজ সৈন্য বালাডাঙ্গা দুর্গের দিকে অগ্রসর হলে ভুটানী সৈন্য তাদের আক্রমণ করতে বেরিয়ে আসে। ভুটিয়াগণ বৃটিশ রণকৌশলের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। প্রায় সাত গুণ অধিক সৈন্য নিয়ে তারা সানন্দে বৃটিশ সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইংরেজ-সেনাধ্যক্ষ মি. পালিং নিজ সৈন্যদের পশ্চাৎ অপসরণে আদেশ দিলেন। পশ্চাৎ অপসরমাণ সৈন্যদেব সুশৃংখলভাবে সংহত করে তিনি একটি একটি স্থানে নিয়ে এলেন—যার পশ্চাতে লুক্কায়িত আছে—বৃটিশ কামানশ্রেণী। স্বল্পতর স্থানে সংহত ইংরেজ-সৈন্যকে ধ্বংস করতে বৃহদায়তন ভুটানী সৈন্য দলে দলে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে নিয়ন্ত্রিত রণক্ষেত্রে যখন উপনীত, অপসরমাণ বৃটিশ সৈন্য তখন কামানের পশ্চাতে চলে এসেছে। বৃটিশ কামানের সামনে তখন ঘন সন্নিবিষ্ট ভুটানী সৈন্য চরম দুর্ভাগ্যের মুখোমুখি। দুর্দান্ত গোলাবর্ষণে মুহূর্তের মধ্যে শত শত ভুটিয়া সৈন্য ভূপতিত হল এবং বাকী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। বালাডাঙ্গা দুর্গের পতনের পর মি. পালিং প্রায় বিনা বাধায় নাজিরগঞ্জ দুর্গ দখল করেন। সমস্ত স্থান থেকে পলায়িত বা বিতাড়িত ভুটিয়া সৈন্য তখন রাজধানীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে মূল ঘাঁটিকে শক্ত করতে ব্রতী হল। মি. পালিং কালবিলম্ব না করে রাজধানী কোচবিহারে উপনীত হলেন এবং সৈন্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক থেকে যুগপৎ আক্রমণ পরিচালনা করলেন। এই যুদ্ধে ভুটিয়া সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হল এবং সেনাপতি ও রাজ-ভ্রাতুষ্পুত্র জিম্পে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। বেশ কিছু ভুটিয়া সৈন্য বন্দী হল। রাজপ্রাসাদে মহারাজার পতাকার সঙ্গে কোম্পানীর পতাকা উত্তোলিত হ'লো।

মি. পালিং পরাজিত ভুটান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে আধুনিক রাজাভাতখাওয়া নিকটস্থ চোকাখাত দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হলেন এবং ঐ দুর্গ দখল করে লর্ড হেষ্টিংসকে যুদ্ধজয়ের খবর পাঠান। কিন্তু হেষ্টিংসের নিকট থেকে নির্দেশ এলো আর অগ্রসর না হতে। এ সময় উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমাংশে কোচবিহাররাজ্যের অনেক অংশ ভুটান দখলে ছিল। হেষ্টিংসের আদেশে সে সব পুনর্দখল না করেই মি. পালিংকে ফিরে যেতে হলো এবং একতরফা যুদ্ধবিরতিতে প্রথম ভুটান-যুদ্ধের অবসান ঘটে।

## ৬. ইংরেজের ভুটিয়া-তোষণ-নীতি

চুক্তির মর্মার্থ অনুসারে বেদখল সমস্ত রাজ্যাংশ উদ্ধার না করেই—ভুটান-যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজের ভুটিয়া-তোষণ-নীতির যে সূত্রপাত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল, সে নীতি প্রায় এক শতাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল।

এই অসম্পূর্ণ বিজয়েও কিন্তু কোচবিহাররাজ কোনো আপত্তি তুললেন না। নাবালক রাজার কাছে আর কোনো উচ্চাশাও বোধহয় ছিল না। এক-তরফা যুদ্ধবিরতির শর্তে অবশ্য ভুটানরাজ্যে কারারুদ্ধ মহারাজা ধৈর্যেন্দ্র-নারায়ণ, তাঁর ভ্রাতা সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ানদেব ও অন্যান্য বন্দীগণ মুক্তি পেলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর মুক্তির বিনিময়ে স্বাধীন কোচবিহাররাজ্যকে করদরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং শোকাহত এই স্বাধীনচেতা রাজা সম্পূর্ণভাবে বাক্‌রুদ্ধ হলেন ও ভগবতী-চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করলেন। সুতরাং নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণই সিংহাসনে আসীন হলেন।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী ভুটান-সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। এই চুক্তির মধ্যে আক্রমণকারী এবং পরাজিত ভুটান-সরকারের প্রতি দমনমূলক বা কঠোর কোনো শর্ত তো নেই-ই বরং রয়েছে বিজেতার তরফ থেকে বিজিতকে খুশী করার চেষ্টা। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পশ্চিমে তিস্তা থেকে পূর্বে সংকোশ নদী পর্যন্ত হিমালয় পাদদেশীয় বিপুল ভূখণ্ড, যা কোচ-রাজ্যভুক্ত ছিল এবং যুদ্ধ শেষে তাদেরই পাওয়ার কথা, তা সবই ভুটান সরকারকে দেওয়া হলো।

একদিকে ইংরেজের যেমন পরাজিতকে তোয়াজ করার চেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি শুরু করলো সন্ধিবদ্ধ কোচবিহারকে শোষণের চেষ্টা। দফায় দফায় কোচবিহারের বার্ষিক করের বোঝা বাড়িয়ে যাওয়াতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ১৭৭২ সালের স্থিরীকৃত কর ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ১৭৭৪ সালে এক লক্ষ টাকা ধার্য হয়। অতিরিক্ত করভারে কোচবিহারের রাজা ও প্রজা উভয়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

ভুটিয়া-তোষণ-নীতির পরোক্ষ ফল হিসেবে নেমে আসে প্রান্তিক উত্তর বাংলায় মধ্যযুগীয় অরাজকতা। অভুটিয়া সমতলবাসী প্রজাদের প্রতি

ভুটানীদের কোন আত্মিক সম্পর্ক বা মানসিক দুর্বলতা না থাকায় সন্ধির ফলে প্রাপ্ত সমতলের রাজ্যাংশে তারা জোর-জুলুম করে রাজস্ব আদায় এমন কি সংঘবদ্ধ সৈন্যবাহিনী দিয়ে লুণ্ঠন ও হত্যা চালাতে থাকে। তাছাড়া কোচবিহারের রাজ্যাংশে ঢুকে পড়েও হামলা চালাতে থাকে। দুর্বল কোচ-রাজের পক্ষে প্রজার দুর্ভাগ্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ইংরেজ সরকারকে সে কথা জানিয়েও কোন লাভ হয়নি, কারণ সে কোম্পানী তখন ভুটান-সরকারকে তুষ্ট রেখে, ভুটানের সঙ্গে তো বটেই, ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়ে অর্থগৃধ্নুতার স্বপ্নে বিভোর। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইংরেজের ভুটান-তোষণনীতি উত্তর প্রান্তিক বাংলার সমূহ অকল্যাণ সাধন করেছিল।

## ৭. বৈকুণ্ঠপুরের পতন

একথা আগেই জানা গেছে যে, কোচরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের ভ্রাতা তথা প্রধান মন্ত্রী শিশুসিংহ বৈকুণ্ঠপুর পরগণায় বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে 'রায়কত' বংশের স্থায়ী আবাস গড়ে ওঠে। মহারাজ বীরনারায়ণের সময় ( ১৬২৬-১৬৩২ ) খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তারপর থেকে কোচবিহারের পতনের জন্য ক্রমাগত নিজেরা এবং পার্শ্ববর্তী রাজশক্তির সহযোগিতায় বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু সেই চেষ্টা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সফল হতে গিয়েও ইংরেজদের সহযোগিতায় মূলতঃ অসফল হয়। কিন্তু পরিণতিতে নিজের স্বাধীন সত্তা যতটুকু ছিল তাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।

কোচবিহারের সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়ে বৈকুণ্ঠপুরপতিদের ভুটানের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয় এবং দক্ষিণে মুসলিম শক্তির প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে ইরদাদ খাঁনের আক্রমণ থেকে বাঁচতে গিয়ে এবং নবাব সুজাউল্লার সময়ে ( ১৭২৭-৩৫ ) মুঘলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে আনুগত্য প্রকাশ করেছে বৈকুণ্ঠপুর, যখন পার্শ্ববর্তী কোচবিহার ঐ শক্তিগুলির সঙ্গে স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল।

কিন্তু এত করেও বৈকুণ্ঠপুরকে রক্ষা করা গেল না। চুক্তিবদ্ধ কোচবিহারের শান্তি স্থায়ী করতে, সন্ন্যাসী-দস্যুতা দমন করতে এবং সরাসরি রাজস্ব আদায়ের

মুনাফার লোভে ইংরেজরা ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠপুররাজ্য আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন স্টেওয়ার্টকে এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিতে হয়। মি. স্টেওয়ার্ট জলপাইগুড়িতে ঘাঁটি পেতে অল্পদিনের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুরকে অধিকার করে নেন। এইভাবে স্বাধীন বৈকুণ্ঠপুররাজ্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে একটি সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হল।

## ৮. উত্তরবঙ্গে কৃষকবিদ্রোহ (খৃ. ১৭৭০-খৃ. ১৭৮৩)

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে সারা বাংলার মত উত্তর বাংলারও প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যাওয়ায় বিস্তৃত জনপথ শ্মশানে পরিণত হলেও ইংরেজ সরকার রাজস্ব আদায়ে ছাড় দেননি, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তার চেয়েও নিষ্ঠুরতার কাজ হয়েছিল—ঐ বছরই কোম্পানী উত্তরবঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৭৭০ সাল অপেক্ষা বছরে ৭০,০০০ টাকা অতিরিক্ত রাজস্বের প্রতিশ্রুতিতে দুর্ধর্ষ ইজারাদার দেবীসিংহের হাতে রংপুর জেলাটি তুলে দেন। রংপুর তখন পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া এবং পশ্চিমে পূর্ণিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপুরসহ জলপাইগুড়ির বৃহত্তর ভাগ নিয়ে গঠিত সুবৃহৎ জেলা। এ ছাড়াও, হেষ্টিংসের অনুগ্রহপুষ্ট এই দেবীসিংহ ঐ সালেই (১৭৭০) দিনাজপুররাজের নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারূপে কোম্পানীর নিয়োগপত্র পান। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরে প্রায় সমগ্র মালদা, দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি (শিলিগুড়ি মহকুমা সহ) জেলায় রাজস্ব আদায়ের একচ্ছত্র, স্বৈরতান্ত্রিক এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা লাভ করলেন। ইংরেজের প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ঠিক হলো, কিন্তু প্রজাদের দেয় টাকার উর্ধ্বসীমা বলে কিছু রইল না। তাই দেবীসিংহ আবার দুর্ধর্ষ কিছু আঞ্চলিক সর্দারদের হাতে এই বিশাল ভূসম্পত্তি পত্তনী দিলেন। এই পুনর্বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু রংপুর জেলাতেই তার নিজস্ব মুনাফা হাঁকলেন ৬০,০০০ টাকা। দেবীসিংহের কৃপাপুষ্ট এই হঠাৎ পত্তনীদার ভূস্বামীগণ শুধুমাত্র লাঠির জোরে যত ইচ্ছা রাজস্ব আদায় করে নিতে লাগলো। এরা প্রত্যেকেই জানতো, এই ব্যবস্থাটা আকস্মিক ও অস্থায়ী; অতএব যা পারো লুটে নাও। প্রাচীন জমিদারী ও নবাবী-শাসনেও তবু অপরাধের জন্য কাজী বা জমিদারের কাছে শাস্তির সম্ভাবনা ছিল। এখন সে ভয়ই

রইলো না। নবাবী আমলের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে—অথচ নতুন শাসকেরা শাসনকর্মে নেই। তাই খাজনা আদায়ের নামে যে-কোন রকমের অত্যাচার শুরু হলো এই প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ জুড়ে।

খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার করা হতো তার বর্ণনা রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের লেখনীতেও যা ফুটেছে তা লোমহর্ষক। তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন, বন্ধ ঘরের মধ্যে অস্থিচর্মসার মানুষ, হাতে পায়ে দড়ি বাঁধা, গাদাগাদি অবস্থায় পড়ে আছে। ১০।১২ দিন আবদ্ধ অবস্থায় তাদের শুধু বেত্রাঘাত করা হয়েছে। দেবীসিংহের আদেশ ছিল তাদের খাদ্য না দেওয়া, যদিও তার অজ্ঞাতে বিগলিত কর্মচারী ১২ দিনে ৩।৪ বার মাত্র সামান্য খাদ্য দিয়েছে। উডল্যাণ্ড সাহেবের দেখা এই মানুষগুলি এত মুমূর্ষু ছিল যে, তাদের কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না।

রংপুরের প্রজাদের আসল জমার উপর টাকা প্রতি আট আনা হারে আবার "আবওযাব" দিতে হইত এবং নৃশংসভাবে এই বর্ধিত খাজনা আদায় করা হতো। যেসব পাওনাদার প্রতিশ্রুত খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হ'লো দেবী সিংহের অত্যাচার থেকে তারাও মাপ পায়নি। বর্ধিত হারে খাজনা দিতে না পারায় বহু পুরাতন জমিদারকেও দেবীসিংহ উৎখাত করে। বার্কের ভাষণের মধ্য দিয়ে দেবীসিংহ ও তার অনুচরদের এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে সেদিনের বৃটিশ পার্লামেণ্ট লজ্জাকণ্টকিত এবং আতঙ্ক-শিহরিত হয়ে উঠেছিল।

অবশেষে সাধারণ মানুষের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রংপুর-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। বিদ্রোহের বিস্তৃতি ও ভয়ঙ্করত্বে রংপুরের শাসনকর্তা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি দিনাজপুরের বৃটিশ রেসিডেণ্ট ও সেনাঘাঁটির উপর ভরসা না করে সরাসরি ফোর্ট উইলিয়মে সংবাদ পাঠালেন। গুডল্যাণ্ডের মতে বাংলার ইতিহাসে এতবড় শক্তিশালী দাঙ্গা (বিদ্রোহ) আর কোথাও হয়নি।

বিদ্রোহীরা শুধুমাত্র প্রতিবাদে সোচ্চার মিছিল করেনি, শুধু আকস্মিক সশস্ত্র হানা চালায়নি; এ ছিল মূলতঃ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। এ শুধু বিদ্রোহ ছিল না, এ ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা। প্রজাবৃন্দ ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘোষণা করে। তারা বিকল্প সরকার গঠন করে। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সেই সরকার মহম্মদ নুরুলুদ্দিনকে নবাব এবং দয়ারাম শীলকে দেওয়ান নিযুক্ত

করে। এই সরকারে ব্যয় নির্বাহের জন্য এক প্রকার কর ধার্য করা হয়, যার স্থানীয় নাম ছিল "দিঙ্"।

এই বিদ্রোহী সরকার দিনাজপুর, কোচবিহার, বোদা এবং জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। সেই সব ঘাঁটিতে জমায়েত হয়ে প্রত্যেক অঞ্চলে বিদ্রোহের পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করা হতো এবং দূতের মাধ্যমে বিভিন্ন ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা হলো। সারা অঞ্চলে দেবীসিংহকে কর দেওয়া বন্ধ হলো।

প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কায় বিদ্রোহীরা প্রথমে সমগ্র রংপুর জেলার উত্তরাংশ জুড়ে প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলে। কোচবিহার ও বোদা অঞ্চলেও দুটি শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরী করে দুই দল বিদ্রোহীকে পাঠানো হলো। এইবার বাদ বাকী বিদ্রোহীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে ইংরেজ সরকারের সবরকম অফিস, কাছারী আর সংস্থাকে চুরমার করে দিতে শুরু করে। এই সশস্ত্র ও শক্তিমান বিদ্রোহী দলগুলির সামনে ছোট বড় নায়েক-গোমস্তা বা তাদের পাইক-বরকন্দাজ ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে গেল। আমলারা যে যেখানে পারলো প্রাণ নিয়ে পালালো। অত্যাচারের প্রতীক অজস্র কাছারী বাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।

এর পরে বিদ্রোহীরা স্বয়ং দেবীসিংহের কাছারী বাড়ী লুঠ করতে এবং তার নায়েবদের শাস্তি দিতে ছুটলো। আতঙ্কিত দেবীসিংহ বার বার ইংরেজ-সরকারের কাছে বিদ্রোহ দমনে সৈন্য পাঠাবার আবেদন পাঠিয়েও কোন ফল পেলো না। দেবীসিংহের এক কুখ্যাত নায়েব গৌরমোহনকে বিদ্রোহীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলো এবং সে দণ্ড কার্যকর করলো। দেবীসিংহ গত্যন্তর না দেখে ইজারাদারের পদে ইস্তফা দেয়। কিন্তু বৃটিশের রাজস্ব যে ডুবিয়েছে, বৃটিশ-ভোগ্য বঙ্গভূমিতে যে রয়ে সয়ে শোষণ করতে না পারার নির্ব্বুদ্ধিতায় বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে একদা পদলেহী হলেও বৃটিশ তাকে ছাড়লো না, বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে গেল বিচারের জন্য।

কিন্তু তাতেও বিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। কলকাতা থেকে সৈন্য আসতে দেরী হতে থাকায় রংপুরের কালেক্টর গুড্‌ল্যাণ্ড সাহেব ভয় পেয়ে অনুগত জমিদারদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি বোদার নায়েব মীর্জা মহম্মদ এবং বাহারবন্দের জমিদার নরসিংহের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এই বিপদের দিনে তাঁরাও খুব একটা কিছু সাহায্য করতে পারলেন না।

অবশেষে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সৈন্য এসে পৌঁছলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোম্পানীর সৈন্যদের প্রবল সংঘর্ষ শুরু হলো। বিশেষতঃ বোদা এবং পাটগ্রামে বিদ্রোহীরা ঐতিহাসিক লড়াইয়ে নেমেছিল। পাটগ্রামের সংঘর্ষকে প্রায় যুদ্ধ বলা চলে। বিদ্রোহীরা সংখ্যায়ও ছিল হাজারে হাজারে। কিন্তু ইংরেজের কূট রণকৌশলের কাছে সংখ্যাধিক্য নবাবী সৈন্য যেমন পলাশীতে হেরেছিল, এখানেও তাই। সম্মুখ লড়াই নিষ্ফল জেনে প্রতারণার পথে বিদ্রোহীদের পরাস্ত করতে হয়। সাদা পোষাকে কিছু সৈন্যকে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বিদ্রোহীরা এদের নিজেদের লোক ভেবে নিকটে আসতে বাধা দেয়নি। বাদ বাকী সিপাহীরা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহের নায়কেরা এই চাতুরী ধরতে পারেনি। তাই অকস্মাৎ আত্মসমর্পণের ভঙ্গি পাল্টে এরা যখন গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলো এবং ঠিক তখনি শাদা পোষাকের লোকেদের বন্দুকও যখন গর্জে উঠলো, এই আকস্মিক দুর্বিপাকে পড়ে বিদ্রোহী প্রজারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আকস্মিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েও বিদ্রোহী প্রজাগণ প্রাণপণ লড়তে লাগলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। বিদ্রোহী সরকারের দেওয়ান দয়ারাম শীল যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বিদ্রোহীদের নবাব নুরুলুদ্দিন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে সিপাহীদের হাতে বন্দী হলেন এবং পথিমধ্যেই তার প্রাণান্ত ঘটে। অজস্র বিদ্রোহী আহত ও নিহত হলো। পাটগ্রামের সংঘর্ষে বিদ্রোহীদের প্রধান সংগঠকরা মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকারও নানারকম আশ্বাস দিয়ে এবং জনহিতকর সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদ্রোহী প্রজাদের মন জয় করতে সচেষ্ট হয় এবং এইভাবে ইংরেজ ভারতের অন্যতম প্রধান প্রজা-বিদ্রোহের ক্রমিক অবসান ঘটে।

কিন্তু বিদ্রোহীরা ও তার সরকার ইংরেজের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও এই বিদ্রোহ এতটুকু নিষ্ফল হয়নি। বহু লোকের মৃত্যু হলেও তার বহু শত গুণ বেশি লোকের কল্যাণ এতে সাধিত হয়েছে। এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক ফল (ক) দেবীসিংহের উচ্ছেদ, (খ) ইরাজাদারী ব্যবস্থার সমাপ্তি ঘটিয়ে পুরাতন জমিদারদের মাধ্যমে অথবা সরাসরি খাজনা সংগ্রহ (গ) খাজনার হার বহুলাংশে কমিয়ে দেওয়া (ঘ) 'আবওয়ার' সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া (ঙ) জমিদারদের দেয় জমা'র পরিমাণ কমানো এবং (চ) আইন-শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি এবং তদনুরূপ প্রশাসনিক সংস্কার। কিছুকালের

মধ্যে Bengal Tenancy Act-এর পাশ এবং (ছ) ইজারাদারী ব্যবস্থায় দেবীসিংহ ও তার অনুচরদের সমস্ত অত্যাচারের বিচারের জন্য কমিশন গঠন।

## ৯. সশস্ত্র সন্ন্যাসী-দস্যুতার ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দলে দলে আগত সশস্ত্র সন্ন্যাসীদের আক্রমণে ও অত্যাচারে উত্তরবঙ্গের সমতল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর ও রংপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

এই সন্ন্যাসীগণ নিজেদের শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত বলে পরিচয় দিত। দশনামী সম্প্রদায়গুলি হল—পুরী, গিরি, পর্বত, সাগর, বাণ, অরণ্য, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী এবং ভারতী। শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত অজস্র মঠগুলি এদের কোন একটি সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। মুসলিম যুগে এই সব মঠমন্দির পরিচালনায় রাজকোষের সাহায্য না পেয়েই হয়তো একদিন এঁরা সশস্ত্র ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছিল এবং চূড়ান্ত অমানবিক অত্যাচারে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই গভীর নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরও থানেশ্বরে গিরি ও পুরী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে দেখেছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রান্তিক উত্তর বাংলায় রাজশাসন দুর্বল হয়ে পড়লে এদের অত্যাচারও মাত্রাহীন হয়ে ওঠে।

এদের কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমালয় পাদদেশীয় অঞ্চলেই এদের প্রধান গতিবিধি। অযোধ্যা থেকে ব্রহ্মপুত্রের কিনারা পর্যন্ত ছিল এদের লুঠতরাজের ক্ষেত্র। এরা বিয়ে-থা করতো না, কিন্তু গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে জোর করে ধরে আনা শক্ত সমর্থ শিশুদের নিজেদের দলে ভিড়িয়ে দল বৃদ্ধি করে চলতো। গেরুয়ার আড়ালে এদের অনেকেরই থাকতো টাকা পয়সা সোনা রূপা এমন কি হীরা-জহরৎ। বলাবাহুল্য সবই লুঠের মাল এবং এই মাল দিয়েই তারা প্রকাশ্যে কারবার করতো। বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণের নাম করে এরা দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতো এবং বর্ষাকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন গ্রামে গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নিতো। প্রত্যেক গৃহস্থ তাদের যথাপ্রয়োজনীয়ভাবে আপ্যায়ন করে খুশী রাখতে বাধ্য হতো, নইলে ছিল সমূহ বিপদ। অস্ত্রহাতে এরা প্রকাশ্যে চলাফেরা করতো এবং হত্যা লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ এদের চিত্তকে এতটুকু বিচলিত করতো না।

নেতৃস্থানীয় সন্ন্যাসীরা অশ্বারোহণে চলতো, অনুসারীরা ঘোড়া, খচ্চর বা পদব্রজে চলতো। এদের দলে লোক সংখ্যা শত থেকে সহস্র যে-কোন রকমের হতে পারতো এবং সন্ন্যাসী-দস্যু ও তাদের দলবলের মোট সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার বলে অনুমিত হয়েছে সমসাময়িক প্রশাসনিক বিবরণে।

উত্তরবঙ্গে কুখ্যাত সন্ন্যাসী-দস্যুদের মধ্যে নারায়ণ গিরি ও ভবানী পাঠকের নাম সবিশেষ শোনা যায়। এদের অত্যাচারে বহু গ্রাম জনশূন্যও হয়ে পড়ে। সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ভয়ে বহু জমিদার কাছারী বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো। বড় জমিদাররাও এদেব ঘাঁটাতে সাহস পেতো না। যাত্রাপথে পতিত কাছারী, গোলাবাড়ী ও সম্পন্ন গৃহস্থদের বাড়ী লুঠ করতে করতে যেতো। শোনা যায়, বৈকুণ্ঠপুর বাজপবিবার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সন্ন্যাসী-দস্যুদের আশ্রয় ও সাহায্য পযন্ত দিয়েছে। এইভাবে দেশের সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসীদের হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনো পথ খুঁজে পায়নি। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো যে, এ যুগে ফকির-দরবেশরাও দস্যুবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারাও বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করে ধনসম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয়। মুসলমান সুলতানদের সময় তারা যেভাবে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্য পেয়েছিল—সেটা এ যুগে কোন আশায় তাদের এই দস্যুবৃত্তির সূত্রপাত। এমন কি মুঘল আমলে শাহ সুজা পর্যন্ত হাসান মুরিয়া বুরহান নামক একজন ফকিরকে এমন একটি সনদ লিখে দেন, যাতে এই ফকির বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার যে-কোনো নাগরিকের কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। এমনকি নিষ্কর ভূমি বা উত্তরাধিকারী-বিহীন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করে দখল নিতে পারবে। এইভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই এরা একদিন জনসাধারণকে শোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সশস্ত্র ফকির-দস্যুদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল—কনৌজ-নিবাসী মজনু শাহ। মজনু শা'র অনেকগুলো দল ছিল যারা সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সারা উত্তর ভারত ও বাংলায় দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতো। ইংরেজরা ফকিরদের দমনে অস্ত্র ধরলে মজনু শা' রাণী রাসমণির সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে পত্র পাঠান।

## ১০. সন্ন্যাসী-দমন অভিযান

যাই হোক, শাসন ক্ষমতায় এসেই ইংরেজগণ এই সব দস্যু-সন্ন্যাসী বা ফকিরদের দমনে আত্মনিয়োগ করে; কারণ ছিল সেই একই—রাজস্ব। এদের ভয়ে জমিদার রাজস্ব সংগ্রহ বন্ধ রেখে পালায়। এদের অত্যাচারে সর্বহারা প্রজা রাজস্ব দিতে অপারগ হয়ে ওঠে। যাই হোক, ইংরেজ সৈন্যের ক্রমাগত চেষ্টায় ফকির ও সন্ন্যাসীদের উপদ্রব ধীরে ধীরে কমে আসে।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন টমাস সন্ন্যাসীদের একটি দলকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হন। হেষ্টিংস আরো বেশি সৈন্য পাঠিয়ে সন্ন্যাসী-দমনে বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। বহু স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হতে থাকে। সন্ন্যাসীদের শেষ বড় আশ্রয় ছিল বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের উত্তর ভাগ। মিঃ ম্যাগডোগালের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসীদের এই শেষ বড় ঘাঁটি বিধ্বস্ত করেন। দলপতি কৃপানাথ বন্দী হয়। এরপর থেকে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-দস্যুতার স্থায়ীভাবে অবসান ঘটে।

## ১১. গুর্খা আক্রমণ ও প্রতিকার

কিন্তু প্রান্তিক উত্তর বাংলার কপালে একের পর এক দুর্যোগ লেখা ছিল। তাই একদিকে যখন সন্ন্যাসী-দস্যুদের অত্যাচার কমে আসতে রইলো, তেমনি সেই শূন্যতা পুরণ করতে মূর্তিমান দুর্ভাগ্যের মত নেমে আসতে লাগলো অস্ত্র-সজ্জিত সুসংহত নেপালী লুণ্ঠনকারীর দল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৬ পর্যন্ত এই ৬টি বছর তাদের দলে দলে আক্রমণ ও লুণ্ঠনে বর্তমান দার্জিলিং জেলার সমতলভূমি ও জলপাইগুড়ির উত্তর-পশ্চিম ভাগের জন-জীবন বিপন্ন হয়ে উঠলো। এসব আক্রমণকারীরা প্রথম প্রথম শুধু অর্থ-সম্পদ লুঠ করেই ক্ষান্ত থাকতো; কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা গবাদি পশু ও সাধারণ মানুষদেরও ধরে নিয়ে যেতে থাকে।

আসলে দীর্ঘকাল সংহত কোন রাজশক্তি বা শাসনতন্ত্রের অভাবে প্রান্তিক বাংলার এই অঞ্চলে যেমন নেমে এসেছিল দারিদ্র্য শিথিল সমাজ-জীবন, আর তাই পার্শ্ববর্তী সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল এদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। পুণ্ড্রবর্ধন-রাজ্যের পতনের পর দীর্ঘকাল এ অঞ্চল আর কোন সংহত ও শক্তিশালী রাজতন্ত্র শাসনের অধীনে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি।

যাই হোক, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উপর্যুপরি গোর্খাদের লুঠতরাজে ইংরেজদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই বছর গোর্খারা খুব বাড়াবাড়িও করে ফেলে। বিপুল সংখ্যায় তারা এ অঞ্চলে নেমে আসে এবং প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুর সঙ্গে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে অনেক প্রজা ধরে নিয়ে যায়। এই সংবাদ পেয়ে রংপুরের জেলা-শাসক ডানকান সাহেব সসৈন্যে ছুটে আসেন। কিন্তু গোর্খাদের বিপুল সংখ্যাধিক্য হেতু তিনি কোন প্রতিকার করতে পারেন না। অতঃপর ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী এসে পৌছলে গোর্খাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয়। মহানন্দার অপর পারে গোর্খাদের সঙ্গে ইরেজ-সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয়। অনেক গোর্খা আহত ও নিহত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গোর্খাগণ পলায়ন করে। কিন্তু তাদের লুঠের মাল আগেই নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে প্রজাদের তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বৃটিশ সরকার আন্তর্জাতিক বিষয়ের মূল্য দেন এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে নেপালে দূত প্রেরণ করেন। এই সময় নেপাল তার পশ্চিমদিকের অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিহার করার নীতি নিয়ে চলছিল। তাই তাঁরা গুর্খাদের উত্তরবঙ্গ আক্রমণের নিন্দা করেন। এই আক্রমণের মূল নায়ক গঙ্গারাম থাপাকে বন্দী করেন। বন্দী উত্তরবঙ্গীয় প্রজাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের লুঠতরাজ বন্ধের আশ্বাস দেন। এইভাবে উত্তরের জন-জীবনের আর একটি বড় সমস্যা দূর হয়।

## ১২. ভুটিয়া আক্রমণ ও ইংরেজনীতি (খৃ. ১৭৭৪-১৮৬৫)

কিন্তু প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের কপাল থেকে অরাজকতার অশান্তি ও দুর্দশা তাতেও দূর হলো না। ইংরেজ-শাসনের প্রথম শতবর্ষেও তাদের ধন-মান-জীবন সুরক্ষা পেল না, বরং প্রতিনিয়ত এক অরাজকতাপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনের মধ্যেই তারা পড়ে রইল। যার মূল কারণ ছিল—ইংরেজের ভুটিয়া-তোষণ-নীতি।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে Cencessional চুক্তির মারফত কোম্পানী কোচবিহারের ন্যায্য প্রাপ্য তরাই-ভূখণ্ড ভুটান সরকারকে পাইয়ে দিলেও, বরং হয়তো সেই কারণেই, ভুটানের ভূমিদখল ও জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুঠের প্রবৃত্তি কমলো

না। ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে আগ্রাসী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় নিষ্ঠুরতা সেটা হলো—দলে দলে ভুটানী সৈন্য পাঠিয়ে সাধারণ নাগরিকদের ধনসম্পদ লুঠ করা। প্রাচীন রাজতন্ত্রে সর্বদা রাজায় রাজায় লড়াই হয়েছে—প্রজাদের কেউ আক্রমণ করেনি। কিন্তু রাজতন্ত্রের এই ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে সেই নীতিবোধটুকু লুপ্ত হয়ে গেল। মারাঠারা নবাব আমলের শেষদিকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ নাগরিককে লুণ্ঠনে লুণ্ঠনে নিঃশেষিত করেছিল আর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভুটিয়া-সৈন্যের অবাধ অত্যাচার, লুণ্ঠন, হত্যা ও প্রজা-অপহরণে প্রান্তিক উত্তরবঙ্গের গ্রামীন জীবন দুর্বিসহ করে তুললো। কোচবিহার রাজ্যের অনুরোধেও এ ব্যাপারে কোম্পানী ভুটানের বিরুদ্ধে এতটুকু টুঁ শব্দটি পযন্ত করলো না।

শুধু তাই নয়, ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াদের বিশেষ অনুরোধে, আশ্রিত রাজ্য কোচবিহারের অঙ্গচ্ছেদ করে, কোম্পানী আমবাড়ী-ফালাকাটা অঞ্চল ভুটান সরকারকে প্রদান করে। ভুটান সরকার ভুটান থেকে রংপুর পর্যন্ত স্বনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যপথ চাইছিল। ঐ অঞ্চলের ভূখণ্ডটি পেলে তাদের আর শত্রুরাজ্য কোচবিহারের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না বা যাওয়ার জন্য আমদানী-রফতানী শুল্ক দেওয়ার দায়িত্ব থাকে না। ইংরেজ-সরকারের তাতে স্বার্থ ছিল,—ভুটান থেকে আমদানী-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এ ব্যাপারে ভুটিয়াদের দাবী মেনে নিয়ে তারা সেটাই প্রমাণ করলো। কারণ, রংপুর কেন্দ্র দিয়েই ভুটানের সঙ্গে কেবলমাত্র কোম্পানীর প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক লেন-দেনের তৎকালীন অর্থমূল্য ছিল প্রায় তিন লক্ষাধিক মুদ্রা।

কিছুদিনের মধ্যে ভুটানের দাবীতে কোম্পানীর আদেশবলে ময়নাগুড়ি ও জল্পেশ অঞ্চলও ভুটানের হাতে চলে যায়। অতঃপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কোচ-বিহারের আপত্তি উপেক্ষা করে অনেকগুলো তালুক যথা তপসীখাতা, পাঁচ-খোলগুড়ি, চকোয়াক্ষেতি, কামসিংগাও, পরোরপার, সোনাপুর, বাইচঙ্গা প্রভৃতি ভুটান-সরকারে হস্তান্তরিত হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে চামুর্চিও ভুটানের হাতে চলে যায়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহাররাজ্যের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে হানা দেয় এবং বহু প্রজাকে ধরে নিয়ে যায়। রংপুরের বৃটিশ প্রতিনিধি মি. রবার্টসনের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভুটিয়ারা ধৃত ব্যক্তিগণের মুক্তি দিল না।

বাধ্য হয়ে কোম্পানীকে সৈন্য পাঠাতে হয়। ভুটিয়ারা যুদ্ধ এড়িয়ে নাম-রক্ষার জন্যে কোম্পানীর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়—কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্য আক্রমণ না করার। কিন্তু তারা এই চুক্তি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কোচরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হানা দেয়। এই হামলা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আবার চুক্তি ভঙ্গ করে ভুটিয়াগণ কোচবিহার আক্রমণ করে এবং প্রায় ৩০০ প্রজা, ৪০টি হাতী ধরে নিয়ে চলে যায়। ক্ষুব্ধ হয়ে কোচরাজ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বঙ্গের বৃটিশ এজেণ্ট মি. জেনকিন্স বঙ্গদেশের সমস্ত দুয়ার অধিকার করার প্রস্তাব দেন। বৃটিশ-সরকারও ভুটানের কাজ-কর্মে বিব্রত বোধ করছিল; তবুও শান্তিরক্ষার শেষ চেষ্টারূপে মি. ইডেনকে ভুটানে পাঠান ইংরেজ সরকার। কিন্তু বৃটিশ দূত সেখানে খুবই লাঞ্ছিত হন। তাঁকে জোর করে দুটি ভুল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। অপমানিত ইডেন সাহেব কোনক্রমে ভুটান থেকে পালিয়ে আসেন।

## ১৩. দ্বিতীয় ভারত-ভুটান যুদ্ধ ( ১৮৬৫ )

এই ঘটনায় অপমানিত ইংরেজ-সরকার ১৮৬৪ সালের একটি ঘোষণা-বলে সমস্ত ভুটান-দুয়ারগুলি বন্ধ করে দেন। ভুটান অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে পড়ে যায়। ইংরেজরা সামরিক অভিযানের জন্যও প্রস্তুত হতে থাকেন।

১৮৬৫ সালে প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা বৃটিশ-সরকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ১০,০০০ বৃটিশ সৈন্য গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার আর জলপাই-গুড়ির বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আক্রমণ চালিয়ে ভুটানের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে তোলে। এই যুদ্ধের ফলে দার্জিলিং থেকে গৌহাটি পর্যন্ত কোন এলাকায় অন্তত: সমতলভূমিতে ভুটান-সরকারের কোন অধিকার রইলো না। বহু ক্ষেত্রে চিরাচরিত ভুটান-ভূমিও ইংরেজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এতেও সমভূমির বিভিন্ন স্থানে ভুটিয়া-সৈন্যগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগলো। অগত্যা যুদ্ধের সমাপ্তির জন্যে ভুটান-রাজধানী পুনাখ অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া হলো। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালের শেষে প্রায় ৭০০০ বৃটিশ সৈন্য ভুটানের রাজধানী পুনাখ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হওয়ায়—

ভীত ভূটানরাজ ইংরেজদের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করেন। এর ফলে স্বাক্ষরিত হয়—"সিঞ্চুলা চুক্তি"। এই চুক্তির ফলে ইংরেজগণ ভূটানের মধ্যে এবং ভূটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পেল। তাছাড়া ভূটানের সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের বিরোধ হলে তাতে একমাত্র ও আবশ্যিক সালিশীর অধিকার থাকবে (ইংরেজ) ভারত-সরকারের হাতে। চুক্তির এই শর্তটি এখনো চালু রয়েছে। এই চুক্তি রাজনৈতিক দিক থেকে ভূটানের সার্বভৌমত্ব অনেকখানি খর্ব করে।

যাই হোক, এর ফলে ভূটান-ভারত সম্পর্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে কিছুকালের জন্য।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী (ষোড়শ অধ্যায়):


1. Cambridge History of India—Vol-V
2. History of British India—Vol-II—W. Hunter
3. English Factories in India—W. Foster
4. Portuguese in Bengal—I. I. A. Campos.
5. Eastern Frontier of British India—A. C. Banerjee
6. Last day's of the Company—Anderson & Sudebad
7. India Under Early British Rule—R. C. Dutta
8. History of Indian Mutiny—3 Vols—Forrest
9. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
10. বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)—মজুমদার সম্পাদিত

## সপ্তদশ অধ্যায়

# ইংরেজ-শাসনে উত্তরবঙ্গ

[ দ্বিতীয় পর্ব : বৃটিশ-শাসন ( ১৮৫৮-১৯৪৭ ) ]

### ১. ভূমিকা

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী-শাসনের ভিত্তিমূলকে নড়িয়ে দিয়ে জেগে উঠলো ভারতব্যাপী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম; যাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছেন—সিপাহী-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে উত্তরবঙ্গ কীভাবে সাড়া দিয়েছিল তা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখতে পাবো। কিন্তু এই বিদ্রোহের পরিণতিতে উত্তরবঙ্গ তথা ভারত শুধু যে কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে সরাসরি বৃটিশ-রাজশক্তির শাসনে এলো তা নয়—তার সঙ্গে এলো প্রশাসনিক নানা পরিবর্তন। উত্তরবঙ্গে ইংরেজ-প্রশাসনের যে শিথিলতা ছিল, তা কিভাবে দূর হতে আরম্ভ করলো—তাও দেখা যাবে এই অধ্যায়ে। তবে আমাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি-মত 'ভাইস-রয়'দের শাসনকাল ধরে ধীরে আমরা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ফিরিস্তি দেব না; কারণ দু'শ বছরের সেই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত একটা পরিচ্ছেদের আলোচ্য হতে পারে না। আমরা শুধু এ যুগের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরবো।

### ২. সিপাহী-বিদ্রোহ ও শাসকীয় পরিবর্তন

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য জাতীয় অভ্যুত্থান, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সশস্ত্র সংগ্রাম, সিপাহী-বিদ্রোহ। সিপাহী-বিদ্রোহে ভারতের সাম্প্রতিক বিলুপ্ত বা অবদমিত রাজশক্তিগুলির নেতৃত্বে, প্রধানতঃ অসন্তুষ্ট ও বহিষ্কৃত সৈন্যদের যোগদানে, গড়ে ওঠে এক ব্যাপক ও রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা-সংগ্রাম। এত অপ্রত্যাশিত অথচ এত ব্যাপক ছিল এই প্রস্তুতি, এত প্রসারিত হয়েছিল এই বিদ্রোহ-বহ্নি যে ইংরেজ-প্রশাসন প্রথমে একে আয়ত্তে আনা দূরে থাক, যথেষ্ট বেগতিক অবস্থা নিয়ে পশ্চাদপদ হতে হয়েছে কোন কোন স্থানে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র উল্লেখ রাজন্য-কোচবিহাররাজ,

তখন ইংরেজের করদরাজ্য। শুধু তাই নয়, অস্তিত্ব রক্ষায় সে ইংরেজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তার লোকবলও কিছুই ছিল না। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে তখন ইংরেজের সামরিক ছাউনিও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অতএব স্বাভাবিক কারণেই সিপাহী-বিদ্রোহে উত্তরবঙ্গ তেমনভাবে উত্তাল হয়ে ওঠেনি।

তবু সিপাহী-বিদ্রোহ ইংরেজ সামরিক ছাউনিতে এত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল যে, উত্তরবঙ্গের ছোট ছোট সেনানিবাসেও তার প্রতিচ্ছায়া না পড়ে পারেনি। দক্ষিণ বাংলার সেনা-ছাউনির একদল বিদ্রোহী সৈন্য বিদ্রোহ প্রচারের জন্য মুর্শিদাবাদের ভিতর দিয়ে এসে গঙ্গা পেরিয়ে রাজশাহীতে ঢোকে এবং রামপুর, নোয়ালিয়া ও আরদার মাঝপথে এক জায়গায় ছাউনি ফেলে। রাজশাহীর সদর অফিস ও ইংরেজ-ফ্যাক্টরীগুলির ইয়োরোপীয় সৈন্যদের সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণে বিদ্রোহী সেনাদের বন্দী করে ফেলা সম্ভব হয়।

সিপাহী-বিদ্রোহ রক্ত-রঞ্জিত না হলেও তার ফল হিসেবে উত্তরবঙ্গও কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে সরাসরি বৃটিশ-শাসনের আওতায় আসে। এই বিদ্রোহ কোম্পানীর শাসনযন্ত্রের মধ্যে মারাত্মক ত্রুটিগুলি সুস্পষ্ট করে তোলে। তার ফলে ইংরেজ-সরকার ভারতে কতকগুলো প্রশাসনিক পরিবর্তন আনেন। তার সুফল উত্তরবঙ্গেও দেখা দেয়। এর মধ্যে প্রধান দুটি হলো ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয়তঃ অধিক দায়িত্বশীল ও নিবিড় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

## ৩. উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক রদবদল

ইংরেজ-শাসনের প্রথম ৫৬ বছরে উত্তরবঙ্গে কোম্পানী বিশেষ কোন প্রশাসনিক রদবদলের ব্যবস্থা নেয়নি। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও প্রশাসনিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়নি। সমগ্র বাংলার এক সপ্তমাংশের ভূস্বামী নাটোরের রাজাকে তাঁরা ধীরে ধীরে বার্ষিক ভাতাভোগী জমিদারে পরিণত করেছিলেন। দিনাজপুরের রাজবংশকেও তাই। বৈকুণ্ঠপুরকে জমিদারীতে পরিণত করে এবং কোচবিহারকে নামে মাত্র করদরাজ্যের মর্যাদা দিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ পর্যন্ত নিজের হাতে নিয়ে এসে

কোম্পানী তার লভ্যাংশ বাড়িয়েছে; কিন্তু তার জন্যে প্রশাসনিক খরচ বাড়াতে চাননি। অতি বৃহৎ জেলাগুলিতেও যুগ্ম কালেক্টর নিয়োগের মধ্যে সেই ব্যয় সংকোচের লক্ষ্য ব্যক্ত হয়ে ওঠে। কালেক্টর পযন্ত নিযুক্ত হচ্ছিল অস্থায়ীভাবে, বেতন ও আদায়ের উপর কমিশনের শর্ত দিয়ে। কিন্তু প্রশাসনিক খরচা বৃদ্ধিতে সংহত শাসনব্যবস্থায় ব্যাপকতর রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ায় এবার তারা বড় বড জেলাগুলোকে ভেঙে নিবিড ও সংহতভাবে শাসনযোগ্য ভূখণ্ডে বিভক্ত করে। তাই শুরুতে যেখানে উত্তরবঙ্গে ৪টি জেলা ছিল, ক্রমান্বয়ে সেখানে স্বাধীনতার আগেই ৯টি জেলার জন্ম হলো।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলাব ৪টি থানা শিবগঞ্জ, কালিয়াচক, ভোলাহাট ও গুরগুড়িবাগ, দিনাজপুরের ২টি থানা যথা—মালদা ও বামনগোলা এবং রাজশাহীর ২টি থানা—রহনপুর ও চুম্পীকে একত্রিত করে মালদা জেলা গঠিত হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার আদমদীঘি, নাওকিলা, শেরপুর ও বগুড়া এই ৪টি থানার সঙ্গে রংপুরের ২টি ও দিনাজপুরের ৩টি থানা জুড়ে দিয়ে বগুড়া জেলা গঠন করা হয়।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্রের অপর পাড়ের রাঙ্গামাটি এলাকাকে রংপুর জেলা থেকে কেটে নিয়ে গোয়ালপাড়া জেলার জন্ম দেওয়া হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী জেলাব ৫টি থানা ও যশোহর জেলাব ৪টি থানা কেটে নিয়ে পাবনা জেলা তৈরী করা হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নেপাল-যুদ্ধে দখলীকৃত তরাই অঞ্চল এবং সিকিম সরকার থেকে প্রাপ্ত পাহাড়ী অংশ মিলিয়ে দার্জিলিং জেলা তৈরী হয়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালিম্পং এবং ১৮৮০ সালে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিলিগুড়িকে একত্রিত করে দার্জিলিং জেলা বর্তমান রূপ পায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভুটান-যুদ্ধের (১৮৬৫) প্রত্যক্ষ ফলরূপে সমগ্র পশ্চিম ডুয়ার্স ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনে আসে। সেইসঙ্গে রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি অঞ্চল জুড়ে দিয়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়।

শুধু তাই নয়, রাজশাহী বিভাগকে ভেঙ্গে জলপাইগুড়িতে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা এবং সেখানে বিভাগীয় সদর অফিস খোলা উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক পরিবর্তনের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই প্রশাসনিক ভূখণ্ডের রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল বিভিন্ন পদাধিকারীর ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস। সে সব জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস সাধারণ পাঠকের আগ্রহের বিষয় নয়। শুধু এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও সংহত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনে বৃটিশরাজের ক্রমিক আগ্রহ ও প্রয়াসের ইতিহাস যে ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই যথেষ্ট।

## ৪. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রশাসনিক সুবিধার নাম করে স্বাধীনতা-চেতনায় অগ্রণী বাঙালি জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করে ফেলবার দুরভিসন্ধিতে লর্ড কার্জন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা ও বিহার নিয়ে একটি এবং আসাম, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে নিয়ে একটি প্রদেশ তৈরীর কথা পাকাপাকিভাবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার প্রতিবাদ করে সারা বাঙলার হিন্দু-মুসলমান যৌথ আন্দোলন শুরু করে। সে আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত ঢেউ বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের নিস্তরঙ্গ জীবনেও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল।

মালদা জেলায় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে মোহম্মদ নূর বক্স্-এর নেতৃত্বে। ছাত্রদের মধ্যেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জেলা-শাসকের নির্দেশ অমান্য করে বহু ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এমন কি সাধারণ মানুষের মনে বৃটিশ-স্কুল বর্জনের চিন্তাও দেখা দেয়। মালদার বুকে গড়ে উঠলো অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়।

দিনাজপুর জেলায় এই আন্দোলন শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দুই মাস আগে থেকে। দিনাজপুরের মহারাজ গিরিজানাথ রায় স্বয়ং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণায় সারা জেলা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্কুল-কলেজ বর্জন, সরকারী-চাকরী ত্যাগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং সরকারী সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। জাতীয় স্কুল খোলা হয়। গ্রামে-গঞ্জে প্রতিবাদ সভা করা হয়। আন্দোলন এমন তীব্রতায় পৌঁছে যায় যে, ছোটলাটের জেলা পরিদর্শনের সময় একটু নাগরিক সম্বর্ধনা পর্যন্ত আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

জলপাইগুড়ি জেলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত প্রধানতঃ বিলাতী কাপড় বর্জনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। দীনবাজারে বিলাতী কাপড় পোড়াবার চেষ্টা হলে পুলিশী ব্যবস্থায় তা বানচাল হয়। আন্দোলনকারীদের অনেকের

জেল হয়। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করতে গড়ে উঠলো—আর্য-নাট্য-সমাজের হলে জাতীয় বিদ্যালয়। ( ১৯০৭ )

রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া ও কোচবিহারেও বিচিত্র গণ-আন্দোলনে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন জেলায় এই সময় "অনুশীলন সমিতি" "ব্রতী সমিতি" প্রভৃতি বিপ্লবী গণ-সংগঠনগুলি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রোধের ঘোষণা প্রকাশ করায় দেশে শান্তি ফিরে আসে।

## ৫. সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৯০৫ সালেব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল বাংলাকে প্রশাসনিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না দেওয়া। কিন্তু আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা অচিরেই একে স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি জন-জাগরণ ও সামাজিক বিবর্তনেব ধারার সূত্রপাত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মূল আবেগে ধর্মীয় ও সামাজিক শ্রেণীচেতনায় বিভক্ত দেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই ধ্বনির পাশে অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদেরও মানবিক অধিকার বোধে সঞ্জীবিত করা এবং তাদের জাতীয় মূলস্রোতে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এই চেষ্টারই একটি বলিষ্ঠ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সাঁওতালদের দিনাজপুর ও মালদা জেলায় স্বরাজ আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা কাশীশ্বর চক্রবর্তীর প্রেরণা-পুষ্ট সাঁওতাল বিদ্রোহে। এখানকার সাঁওতাল বিদ্রোহ আসলে ছিল তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের প্রকাশ্য ঘোষণা।

মালদা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিপুল সংখ্যক সাঁওতালী আদিবাসী সামাজিক অবহেলা ও অর্থনৈতিক অবিচারের মধ্যে পড়েছিল। ১৯২৬ সালে এই তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক হিন্দু-সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে সম-মর্যাদায় যুক্ত হতে চাইলো। প্রশাসনিক সমস্যা শুরু হলো যখন তারা দাবী করলো 'কালীপূজা' করার অধিকার। মালদার বুকে অন্ত্যজ শ্রেণীর নিজস্ব 'কালীপূজা'র উদ্যোগে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আপত্তি তুললো। জেলা-শাসক ১৪৪ ধারা জারী করে পূজো বন্ধ করলেন এবং কাশীশ্বর চক্রবর্তীকে জেলা থেকে

বহিষ্কার করা হলো। কিন্তু সাঁওতালদের সামাজিক অধিকারের আন্দোলন থামলো না। ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে সরকারীভাবে তাদের দাবী মেনে নিতে হলো এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করে সরকারকে কালীপূজার অনুমতি দিতে হয়। প্রায় তিন হাজার সাঁওতাল এই পূজায় যোগ দেয়।

গণ-আন্দোলনের মুখে পড়ে বৃটিশ প্রশাসন সাঁওতালদের দাবী মানতে বাধ্য হলো বটে কিন্তু বৃটিশ এটিকে সুনজরে দেখলো না। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য যেমন সে সুনজরে দেখেনি, তেমনি উচ্চবর্ণ হিন্দুর সঙ্গে অন্ত্যজ শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যেরও সে ছিল বিরোধী। তাই সাঁওতালদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের চেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে তাদের নেতা জিতু সাঁওতাল ও অর্জুন সাঁওতালকে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে ফেলে। জিতু সাঁওতালকে সেভাবে দমন করা গেল না। সে প্রকাশ্যে বৃটিশ বিরোধিতা শুরু করলো। তার নেতৃত্বে সাঁওতাল-পল্লীগুলোতে ব্যাপক জমায়েত হতে শুরু করলো। প্রকাশ্য সমাবেশগুলিতে সে বৃটিশ সরকারের অবসান যে আসন্ন তা প্রচার করতে লাগলো। গরীব সাঁওতালগণ জিতুকে তাদের নেতা বলে মেনে নিল। তার হাতে তুলে দিল আন্দোলনের অর্থ এবং জিতু সাঁওতাল বৃটিশ-আইন ও শাসন না মেনে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলো। সৃষ্টি হলো বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘাতের পরিবেশ।

ক্ষেতমজুর শ্রেণীর সাঁওতালদের এই রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি প্রধানতঃ মালদার জোতদার শ্রেণীর মুসলমানরা সুনজরে দেখলো না। সাঁওতালদের রাজনৈতিক বিকাশ যারা চাইছিল না, তারা সেই সুযোগে সাঁওতাল ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও সংঘাত সৃষ্টি করে দিল। ভূমি-প্রধান মুসলমান সমাজের অত্যাচারের দীর্ঘস্মৃতিবাহী সাঁওতাল-সমাজও অচিরেই মুসলিম-বিরোধী হয়ে উঠলো। এই সময় কাশীশ্বরবাবু জেলার বাইরে। সাঁওতাল আন্দোলন রইল অনিয়ন্ত্রিত। এই পরিস্থিতিতে সাঁওতালদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় অধিকারের দাবী, মুসলিম-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হ'ল। জিতুর নিয়ন্ত্রণে হাজার হাজার সাঁওতাল আদিনা মসজিদের দখল নেয় এবং তাকে হিন্দু-মন্দিরে রূপান্তরিত করে। হাজার হাজার দরিদ্র সাঁওতালের যোগ্য উপাসনার মন্দির চাই তো। জেলাপ্রশাসন এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ নিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপরাধে আদিনা মসজিদ

প্রাঙ্গণেই সশস্ত্র পুলিশ সাঁওতালদের উপর গুলি চালায়। সাঁওতালরাও তীর-ধনুক নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। মুখোমুখি সশস্ত্র লড়াইয়ে পুলিশ ও সরকার পক্ষের অনেকে আহত হয় এবং একজন কনস্টেবলও তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু বন্দুকের গুলির সামনে তীর-ধনুক নিয়ে সাঁওতালরা বেশিক্ষণ টিঁকতে পারে না, বহু সাঁওতাল আহত হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজন সাঁওতালের লাশ ফেলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে।

এই ঘটনার পরে সাঁওতাল-পল্লীগুলোতে ব্যাপক ধরপাকড়, হয়রানি, জরিমানা ও জেল-হাজত চলতে থাকে এবং মালদার সাঁওতাল আন্দোলন তখনকার মত স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই (১৯০০) দিনাজপুর জেলার সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বালুরঘাট জেলায় তারা আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হয়। সাঁওতালদের মধ্যে 'খাজনা' না দেওয়ার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বিভিন্ন স্থানে 'চৌকিদারী-ট্যাক্স' সংগ্রহও সম্ভবপর হয় না। ১৯৩০-এর অক্টোবরে পতিরাজ অঞ্চলে সশস্ত্র সাঁওতালদের বড় বড় মিছিল এসে চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় বন্ধ করে দেয়। কিছু কিছু স্থানে বন্দী আসামীকে থানায় নিয়ে আসতে গিয়ে পুলিশ সাঁওতালদের কাছে বাধা প্রাপ্ত হয়। ১৯৩২ সালের জুন-জুলাই মাসে আকচা অঞ্চলের সাঁওতালরা বৃটিশ সরকারকে সব রকম 'কর' দানে বিরত থাকে। অনিবার্যভাবেই বৃটিশ সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয় এবং ফলে বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে প্রায়ই ছোট বড় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। গুলিও চলে বহু জায়গায়। এ জেলাতেও ব্যাপক ধর-পাকড়, পুলিশ নির্যাতন এবং শত শত সাঁওতালকে জেলে পুরে আন্দোলন চূরমার করতে হয়। তথাপি বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিবাদের যে সংগ্রামী দৃষ্টান্ত দরিদ্র সাঁওতালরা সেদিন দেখিয়েছিল, তা উত্তর বঙ্গের স্বরাজ-আন্দোলন ও প্রজাবিদ্রোহের এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

## ৬. স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা

উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারার দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রথম প্রকাশ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। তার আগে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিবরণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

যাই হোক, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আবেগে যে স্বাদেশিক চেতনা উত্তরবঙ্গকে প্লাবিত করে, তা দু'টি ধারায় বইতে আরম্ভ করে। এক— বিদেশী দ্রব্য বর্জন, চরকা-কাটা, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি পথে; অন্যটি—অনুশীলন, ব্রতী প্রভৃতি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতে, গুপ্তঘাঁটি গড়ে তোলায়, অস্ত্র সংগ্রহে এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে।

উত্তরবঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী ঘটনা—১৯০৭ সালে হিলি রেল স্টেশনে বোমার আক্রমণ ও কোর্ট এবং স্মার্ট সাহেবকে মারাত্মকভাবে জখম করা। এই ঘটনায় সারা বাংলায় আলোড়ন হয়। এই ঘটনায় 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস'-এর লেখক এবং ষাট বছরের বৃদ্ধ উকীল দুর্গাচরণ সান্যালের ৪ বছর কারাদণ্ড হওয়ায় বাংলার জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয় এবং পত্র-পত্রিকাতেও প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। সেই থেকে শুরু করে ছোটখাটো অনেক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উত্তরবঙ্গে ঘটেছে, তবু একথা বলা যায় যে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন উত্তরবঙ্গে বিশেষ দানা বাঁধেনি। এখানে এই আন্দোলনের সংগঠন থাকলেও—মূল 'অপারেশন' এখানকার মাটিতে কমই হয়েছে। এখানকার সংগঠনগুলো-প্রধানতঃ গুপ্তঘাঁটি গড়ে তোলা এবং অস্ত্র সংগ্রহে নিয়োজিত ছিল।

মালদা জেলায় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া-কলাপের সূত্রপাত করেন রাজবাজার বোমা মামলার পলাতক আসামী স্বদেশ পাকড়াশী। তবে অস্ত্র-সংগ্রহ ও তার গোপন পাচারেই এসব কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। জলপাইগুড়ির প্রথম উল্লেখ্য সন্ত্রাসবাদী ধীরেন দত্তগুপ্ত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা হাই কোর্টের ভিতরে সামসুল হককে হত্যা করে। ফলে তার ফাঁসী হয়। জলপাইগুড়ির সন্ত্রাসবাদী দল সদর শহর ও ডুয়ার্স থেকে বেশ কতকগুলি বন্দুক চুরি করে এবং মাকড়াপাড়া চা বাগান এলাকায় কুচকাওয়াজ ও অস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করে। রংপুর জেলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিখ্যাত পুরুষ শশধর কর মহাশয়। ১৯১৩ সালে তাঁকে ফৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি রংপুরের সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট নন্দলাল ঘোষকে হত্যা করেন এবং ৩০২ ধারায় বিচারাধীনভাবে জেলে যান। কোচবিহার, বগুড়া, রাজসাহীতেও কমবেশি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২৪ সালে ভারত সরকার একটি অর্ডিনান্স বের করেন, যাতে প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে যে-কোন লোককে বিনা বিচারে আটক

ও জেলবন্দী করার। এই কালা আইনের প্রয়োগে চারিদিকে বিরাট ধর-পাকড় শুরু হয়ে যায় এবং এতদঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কমে আসে। উত্তরবঙ্গে শেষ উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী ঘটনা আবার পুনরাবৃত্ত হয় দিনাজপুর জেলার হিলি রেল স্টেশনে, ১৯৩৩ সালের ২৮শে অক্টোবর। সেদিন সামরিক পোষাক-পরা একদল সশস্ত্র যুবক স্টেশনে চড়াও হয় এবং ইংরেজ কর্মচারীদের উপর বেপরোয়া গুলী চালায়। স্টেশনের নৈশ-প্রহরী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। কর্মচারীরা যে যেখানে পারে পলায়ন করে। আক্রমণকারীরা স্টেশন বিল্ডিং-এর উপরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং স্টেশনের ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে প্রচুর টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে অবশ্য তাদের অধিকাংশই ধরা পড়ে এবং বিচারে কয়েকজনের যাবজ্জীবন জেল ও দ্বীপান্তর হয়।

## ৭. সংগঠনমুখী আন্দোলন

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি অবশ্য চলতে থাকে সংগঠনমুখী আন্দোলন। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের মুখ্য ধারা পরিচালিত হয় কংগ্রেসী সংগঠনের মাধ্যমে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলেও উত্তরবঙ্গে তার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা হতে অনেক দেরী হয়েছিল। যেমন —জলপাইগুড়িতে জেলা-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় কলকাতায় কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতিটি ঢেউ উত্তরবঙ্গের জন-জীবনেও আছড়ে পড়েছে—যদিও কংগ্রেসী সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে তৈরী হয়নি।

তবে ১৯২০ সালে গান্ধীজী আহূত অহিংসা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের রোমহর্ষক বিবর দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। চারিদিকে স্কুল কলেজ বর্জন, সরকারী খেতাব ও পদত্যাগ, এমন কি আইনের ব্যবসা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেল। সেই সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন, চরকা-কাটা ও তাঁত-বোনার কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো। ১৯২৫ সালে স্বয়ং গান্ধীজীর উত্তরবঙ্গ ভ্রমণের ফলে কংগ্রেসী আন্দোলন এখানে জোরদার হয়। আন্দোলন ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায়

রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরের নেতাদের আগমন এখানে বেড়ে যায়। ১৯৩৫ সনে দিনাজপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন বসে। ১৯৩৯ সালে আবার জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র, সভাস্থলেই তিনি প্রথম জানতে পারেন যে, তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়েছেন। এই সভাতেই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ও সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানালেন জনসাধারণকে।

কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশেপাশেই গড়ে উঠছিল হিন্দু মহাসভার সংগঠন, মুসলীম লীগের সংগঠন, এমনকি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগঠন। সমগ্র পরিবেশটাই তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তপ্ত। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কৃষক-আন্দোলনের ঢেউ তখন সমস্ত উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। জোতদার উচ্ছেদ, চাষের জমি বিলি, 'তেভাগা'র দাবী এবং অনিয়ন্ত্রিত মহাজনী সুদের অবসানকল্পে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন চলতে থাকে।

## ৮. ভারত-ছাড়ো আন্দোলন

১৯৪২ সালে জাতীয় কংগ্রেসের দেওয়া 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনকে এক চূড়ান্ত বিকাশের স্তরে নিয়ে যায়। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রচণ্ড গণ-উন্মাদনা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলনের স্থানীয় নেতাদের শ'য়ে শ'য়ে জেলে পুরেও আন্দোলনের কোন ঘাটতি ঘটাতে পারা গেল না। তখন পুলিশের সাহায্যে সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হলো। তারই মধ্যে চললো সরকারী প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস কার্য। থানা জললো, কোর্ট পুড়লো, রেল লাইন উপড়ে ফেলা হলো। সারা ভারতের মত উত্তরবঙ্গে তখন একটিই ধ্বনি—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

জলপাইগুড়িতে এই আন্দোলনের সমর্থনে পৌরকমিশনারগণ পদত্যাগ করলেন। ছাত্রেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে মিছিলে অংশ নিল। ৮ই আগষ্ট জলপাইগুড়ির ইতিহাসের বোধহয় সর্ববৃহৎ মিছিল তারাপদ ব্যানার্জি ও উমা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে শহরময় ঘুরে বেড়ায় এবং সরকারী কাজকর্ম স্তব্ধ করে দেয়।

মালদা জেলায় এই আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন—পিল্লা নিবাসী সুবোধকুমার মিশ্র। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে জনতা রেল লাইন তুলে

ফেলে, টেলিগ্রামের তার ও খুঁটি উপড়ে ফেলে, পোষ্ট অফিস ও রেলস্টেশনে আগুন লাগায়। ১৯৪২ সালের ৪ঠা আগষ্ট সরকার মিশ্রকে বন্দী করে হাজতে নিয়ে আসে; কিন্তু এক বিপুল জনতার বিক্ষুব্ধ জোয়ার তাঁকে বৃটিশের হাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়।

দিনাজপুরে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ গণ-বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাতে কমপক্ষে ৮০০০ লোকের এক বিরাট গণ-বাহিনী গোপনে ডাঙ্গিঘাটে সমবেত হয় এবং সরোজ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে পরদিন সকালে বালুরঘাট শহরকে ঘিরে ফেলে। অবরুদ্ধ শহরের মধ্যে তখন শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ। সাবরেজিষ্ট্রি অফিস অগ্নি সংযোগে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। দেওয়ানী আদালত ও সমবায় ব্যাঙ্ক-ভবন ভস্মীভূত হয়। টেলিগ্রাফের তার ও যন্ত্রপাতি ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সারাদিন ধরে জনতা সম্পূর্ণ শহরটিকে তছনছ করে ফেলে। পোষ্ট অফিস, রেল স্টেশন, কৃষি অফিস, গোডাউন, এমন কি ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস পর্যন্ত আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। গাঁজা ও মদের দোকান চুরমার করা হয়। শহর সারাদিন আন্দোলনকারীদের দখলে রইল। পরদিন সকালে বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন এবং বিক্ষোভকারীদের কবল থেকে শহর উদ্ধার করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তপন থানাতে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলি চালান। এই সব জনতা তেলিঘাটা থেকে চাল রফতানি বন্ধ করে দিয়েছিল। সারা মহকুমায় হাজার হাজার লোককে কয়েদ করা হলো। সর্বত্র সভা ও মিছিল বের করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সরোজবাবুর মাথার দাম এক হাজার টাকা ঘোষণা করা হলো। তাছাড়া বালুরঘাট শহরেই শুধু ৫০০০৲ টাকা পিটুনিকর ধার্য করা হলো।

## ৯. স্বাধীনতা-লাভ

সারা ভারত জুড়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিপুল উচ্ছ্বাস বৃটিশকে তার ভারতীয় সাম্রাজ্য-শাসনের শেষ প্রহরের ঘণ্টা শুনিয়ে গেল এবং ভারতবর্ষে আর থাকা যাবে না—এই একটি বিষয়ে তারা নিশ্চিত হতে পেরেছিল। তবুও বেশ কিছু টাল-বাহানার পরে ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে ইংলণ্ডে পাড়ি দিল।

ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী ( সপ্তদশ অধ্যায় )

1. Cambridge History of India—Vol-VI
2. Bengal under Lt.-Governors from 1854-1898.—
C. F. Buckland ( 1901 ).
3. Imperial Gazetter of India—Vol-III & IV
4. History of Indian Nationalist Movement—
Sir V. Lovett.
5. Indian in Transition—Aga Khan
6. India Divided—Rajendra Prasad.
7. An Advance History of India—
R. C. Mazumdar & Others.
8. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রভাসচন্দ্র সেন
9. বাংলাদেশের ইতিহাস ( চতুর্থ খণ্ড )—রমেশচন্দ্র মজুমদার

## অষ্টাদশ অধ্যায়

# স্বাধীনতা-উত্তর উত্তরবঙ্গ

( ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭—৩১শে মে, ১৯৮২ )

[ স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরবঙ্গের ইতিহাস রচনা এখনো হয়তো প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠেনি; কারণ একালের ঘটনাবলী এখনো অধিকাংশ মানুষের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। তবুও তর্কের খাতিরে, যা বিগত দিনের, তাই ইতিহাস। অতএব গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্যে আক্ষরিক অর্থে গতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১ মে পর্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত রচনা করা হ'লো। এই ইতিহাস অবশ্যই সংকুচিত উত্তর-বঙ্গের ইতিহাস; স্বাধীনতা-উত্তরকালে উত্তরবঙ্গ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যে সাম্প্রতিক রূপ, সীমানা ও সংজ্ঞা লাভ করেছে—এ আলোচনা তারই মধ্যে সীমায়িত করা হ'ল। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাসের পর্বকে ব্যক্তি রাজা-সুলতান-নবাব বা বড় লাটের রাজত্বকাল বলে দেখানো গেলেও, প্রজাতন্ত্রী শাসনে যেখানে জনগণই শাসক, ব্যক্তি-বিশেষের শাসন-কালে ইতিহাস-বিভাজন সেখানে অসঙ্গত; তবুও প্রচলিত রীতি-রক্ষার্থে এবং যেহেতু জনগণের পক্ষে দেশ-শাসন করে মন্ত্রীসভা এবং মন্ত্রীসভার মূল-দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রী, অতএব নির্বাচিত মন্ত্রীসভার শাসন-কালকে সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর আমল বলে চিহ্নিত করা হল। প্রধানতঃ তার্কিক কারণে সমকালীন ইতিহাস রচনায় ব্রতী বর্তমান লেখক তাই অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা-বিবর্তনের ধারা ও প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়ে উপস্থাপনাতে সংবৃত থাকবে। ]

## ক. অন্তর্বর্তী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয়ের আমল

( ১৯৪৭ খৃ—১৯৫২ খৃ. )

### ১. স্বাধীনতা-লাভ, উত্তরবঙ্গ বিভাজন ও তার পরিপ্রেক্ষিত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্লান্ত, ভারতে সর্বব্যাপী গণ-আন্দোলনে অতিষ্ঠ ইংরেজগণ ভারত থেকে ক্ষমতা গুটিয়ে নিতে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ থেকেই। কিন্তু প্রশাসনিক উচ্চ পর্যায়ে কিছু রক্ষণশীল রাজপুরুষের

গড়িমসি ভারতকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দিল। এরই মধ্যে বৃটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসে এবং তারা অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীন করার সংকল্প গ্রহণ করে। বড় লাট লর্ড ওয়াভেল সব রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে স্বাধীন ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্রের খসড়া রচনা করলেন। ঐ শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী একটি অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠন করলেন এবং ঐ পরিষদের হাতে শাসন-ভার অর্পণ করতে চাইলেন। ভারতীয় কংগ্রেস এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেও—মুসলিম লীগ এতে অসম্মতি ও অসহযোগিতা প্রকাশ করলো; স্বতন্ত্র ঐস্লামিক রাষ্ট্রের দাবীতে তারা অনড়।

১৯৪৬ সালের ১২ই আগষ্ট বড় লাট বিগত ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের নির্দেশ দিলেন। এর প্রত্যুত্তর দিতে মহম্মদ আলি জিন্না ১৬ই আগষ্টকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' বলে ঘোষণা করলেন। সারা ভারত জুড়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাজ-সাজ রব জেগে উঠলো—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে ঘোষিত হ'ল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। 'মিলিটান্ট' মুসলিম যুবসমাজ জেগে উঠলো—মিছিলে, গণ-সংঘর্ষে দেশে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হলো। ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় অমানুষিক দাঙ্গা আরম্ভ হলো। কমপক্ষে ১০,০০০ নরনারী নিহত হলো কলকাতাতেই। সারা বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দী এই গণহত্যা নিরোধে সামান্যই সক্রিয়তা দেখালেন। জিন্না সাহেবের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে চালিত না হয়ে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে চালিত হল। ২০শে আগষ্ট ঢাকাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হলো। ১৪ই অক্টোবর নোয়াখালি থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় হিন্দু নিধন চললো। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত, আহত ও নিরাশ্রয় হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়ায় বিহারে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লো (২৫শে অক্টোবর)।

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের বড় লাট হয়ে এলেন। তিনি জিন্নার সঙ্গে অনেক আলোচনা করে বুঝতে পারলেন, ভারত-ভাগ ছাড়া মুসলিম লীগকে খুশী করা যাবে না। ৩রা জুন তিনি ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন। চারিদিকে আবার দাঙ্গা, দেশত্যাগ এবং অরাজকতা দেখা দিল। এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে "ভারত স্বাধীনতা বিল" পাশ হয়ে গেল। ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত করে এবং ঐ সালের

১৫ই আগষ্ট ভারত ও ১৬ই আগষ্ট পাকিস্তান রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কে কোন্ ভূখণ্ড পাবেন, তা স্থির করতে "র‍্যাড্‌ক্লিফ অ্যাওয়ার্ড" তৈরী হয়। তদনুসারে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সীমানা স্থায়ীভাবে দ্বিখণ্ডিত হয় এবং মালদা, দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার অংশবিশেষ নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গ গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে কোচবিহার যুক্ত হয় পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে।

## ২. অন্তর্বর্তী প্রশাসন : অন্তর্বর্তী মন্ত্রসভা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় এবং বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায়, জনাব সুরাবর্দীর নেতৃত্বে বাংলায় লীগ মন্ত্রীসভার শাসনের অবসান ঘটে। ভারত স্বাধীনতা বিল ( ১৯৪৭ ১লা জুলাই ) পাশ হলে, নতুন শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী অন্তবর্তী-কালীন শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রথম ভারতীয় ছোট লাট নিযুক্ত হলেন শ্রীরাজাগোপালাচারী। তিনি বাংলার শেষ ছোট লাট ফ্রাডারিক ব্যারোজের নিকট থেকে ক্ষমতাভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেন পদত্যাগ করায় রাজাগোপালাচারী প্রথম ভারতীয় বড় লাট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ শাসনের জন্য ছোট লাট পদে নিযুক্ত হন শ্রীকৈলাশনাথ কাটজু।

ইতিমধ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের রীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের দীর্ঘ প্রয়াসও অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট ভারতীয় গণ-পরিষদের অধীনে সংবিধান-প্রণয়নকারী একটি সভা গঠিত হয় এবং এর সদস্যগণ ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে গণ-পরিষদের কাছে একটি খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করেন। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, দীর্ঘ বিতর্কের পর, সংশোধনসহ উক্ত খসড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীতে এই শাসনতন্ত্র কার্যকরী হয় ও তদনুসারে স্বাধীন ভারতবর্ষ ও তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলি প্রজাতান্ত্রিক শাসনের আওতায় আসে। কিন্তু সে জন্যে অপেক্ষা না করে, অবিভক্ত বাংলা অন্তর্বর্তী সরকারের পশ্চিমবঙ্গীয় বিধায়কদের নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এটিই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রীসভা এবং ডঃ ঘোষ হন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

## ৩. ব্যবসায়ীমহলের ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রীসভার পতন

ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আর্থিক মন্দা, বেকারীত্ব, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি যেমন মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দিয়েছিল, অপরদিকে তেমনি দুষ্ট ব্যবসায়ীচক্র, বৃটিশ-শক্তির অবসান ও নতুন শাসন-শক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠার অভাবে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, কালোবাজারি এবং মুনাফাবাজিতে ক্রেতা-সাধারণের দুর্দশাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেল। ডঃ ঘোষ ধনিক-বণিক শ্রেণীর এই অর্থনৈতিক অপরাধ দমনে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে "ব্লাক মার্বেট বিল" পাশ করেন। ফল হলো বিপরীত। রাজনৈতিক কলকাঠির নিয়ন্তা ব্যবসায়ী মহল ডঃ ঘোষের অপসারণে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা বিপুল পরিমাণ ঘুষ খাইয়ে, শাসক-দলের অনেক বিধায়ককে কিনে নিলেন। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন-হীন হয়ে ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। এইভাবেই 'ব্লাক মার্কেট বিল' গভর্ণরের সম্মতি পাওয়ার আগেই, পাঁচ মাস মাত্র কার্যকাল অতিবাহিত করতে না করতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গদীচ্যুত হন [২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল]।

## ৪. ডাঃ বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব-লাভ

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের দুর্ভাগ্যজনক পতনের পর শাসক-দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরদিন অর্থাৎ ২৩শে জানুয়ারীতে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে কেউ মন্ত্রী ছিলেন বলে জানা যায় না। আবার অন্যদিকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রথম মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতে কোন মন্ত্রী ছিলেন বলেও জানা নেই। যাই হোক, এই মন্ত্রীসভা বিধানচন্দ্র রায়ের যোগ্য নেতৃত্বে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাজ করে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ এ সময় বহুতর সমস্যা-সংকুল ও দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। আমরা এখানে শুধু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো।

## ৫. কোচবিহার রাজ্যের ভারত-ভুক্তি

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও কোচবিহার ভারতের আরক্ষিত করদরাজ্যরূপেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করে যাচ্ছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট পর্যন্ত। উক্ত তারিখে ভারতের বড় লাট ও কোচবিহারের মহারাজার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—যার নাম Coochbehar Merger Agreement—১৯৪৯। এর ফলে 'কোচরাজ্যের স্বার্থে' এবং 'ভারতের স্বার্থে' কোচবিহারের মহামান্য রাজা কোচবিহারকে নিঃশর্তভাবে ভারতের হাতে অর্পণ করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোচরাজ্যের অধিকারভুক্ত সকল ভূখণ্ড ভারতের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

অন্তর্ভুক্ত কোচরাজ্য কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হলো। ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতেই রাজ্যসরকার—'The Cooch Behar ( Assimilation of State Laws ) Act—1950. পাশ করেন এবং কোচসরকারের কয়েকটি আইনকে রাজ্যের আইনবিধির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালের ৪ঠা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগের ঘোষণাক্রমে [ Home (G. A.) Deptt.'s Notification No. 998 G. A. dt. 4th March, 1963 ] জলপাইগুড়ি বিভাগ পুনর্গঠিত হয় এবং কোচবিহার এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

## ৬. উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির পুনর্গঠন

স্বাধীনতার মাশুল হিসেবে প্রাকৃতিক-সীমানাশ্রিত উত্তরবঙ্গ থেকে রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই চারটি পূর্ণ জেলাই শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হ'ল না, সেই সঙ্গে অবশিষ্ট ৫টি উত্তরবঙ্গীয় জেলার অঙ্গচ্ছেদও করা হলো। 'র‍্যাডক্লিফ' সাহেবের উপর পড়ে ছিল এই সীমানা-নির্ধারণের ব্যাপারটা এবং তিনি তার জটিল ও দুর্বোধ্য পদ্ধতিতে যেভাবে জেলাগুলিকে ভাগ করেছেন, তা মূলতঃ একতরফা শাসকীয় সিদ্ধান্ত। উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলারই অঙ্গচ্ছেদ হওয়ায় জেলার সীমানার পুনর্নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মালদহ জেলা রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হলেও 'র‍্যাডক্লিফ'

সাহেব মতি স্থির করতে পারলেন না যে মালদহ পূর্ব পাকিস্তানের বা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে। ১৭ই আগষ্ট জানা গেল, মালদহ জেলার ৫টি থানা, যথা শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর থানাকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ঐ বছরই সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী ঘোষণাক্রমে দশটি থানায় বিভক্ত, মহকুমাহীন এই খণ্ডিত জেলাকে আঙ্গিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

অনুরূপভাবে Radcliffe's Award-এর ফলে দিনাজপুর জেলার পূর্বার্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পশ্চিমার্ধের দশটি থানা নিয়ে মাত্র দুটি মহকুমায় বিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় [ Vide Home (G. A.) Notification No. 548 G. A. dt. 23. 2. 48 ]। ন' বছর পরে Behar and West Bengal ( Transfer of Territories ) Act—1956 অনুসারে পূর্ণিয়া জেলার একটি বৃহৎ ভূখণ্ড কেটে নিয়ে প্রথমে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে এবং পরে পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আবার ২০. ৩. ৫৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভূখণ্ডের মহানন্দ-উত্তরাংশের জমি দার্জিলিং-এর সঙ্গে এবং মহানন্দা-দক্ষিণের জমি পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং নতুন মহকুমা ইসলামপুর গড়ে ওঠে।

'র‍্যাডক্লিফ্ অ্যাওয়ার্ড'-এর ফলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি থেকেও অনেক ভূখণ্ড পূর্ব-পাকিস্তানের করতলগত হয়। এইভাবে দার্জিলিং জেলার ফাঁসি-দেওয়া থানার একাংশ, জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানা, পঁচাগড় ও পাটগ্রাম থানা পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে যায়। এ ব্যাপারে কোচবিহার ভাগ্যবান —যেহেতু, কয়েকটি ছিটমহল ছাড়া, কোচবিহারকে প্রায় কিছুই হারাতে হয়নি।

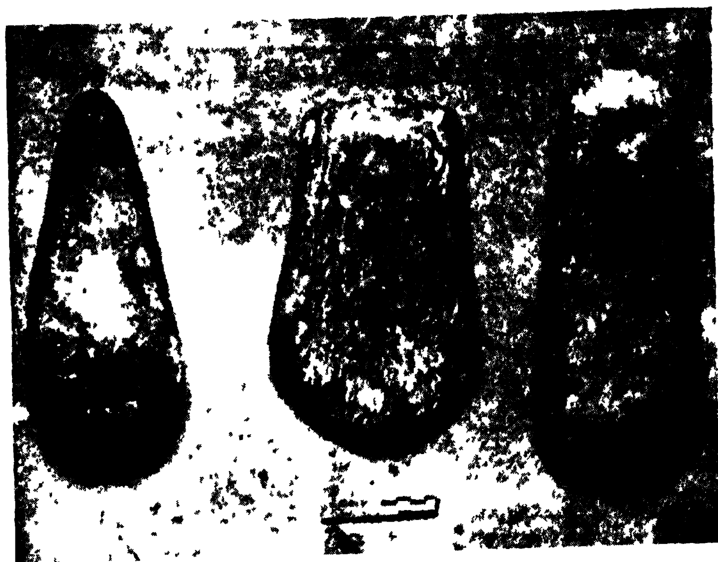
## ৭. উদ্বাস্তু-সমস্যা

ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং তজ্জনিত দেশ-বিভাগের আবশ্যিক পরিণতি হলো ভয়াবহ আকারের উদ্বাস্তু সমস্যা। ডাঃ রায়ের শাসনকালের প্রথম ৫ বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে এবং তার অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের উপর চেপে বসে। উদ্বাস্তু-সমস্যা কেন্দ্রের দায়িত্বরূপে বোঝানো গেলেও এবং কেন্দ্র বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালী উদ্বাস্তুদের

আশ্রয় ও পুনর্বাসনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আহ্বান জানালেও—কাজের কাজ হ'লো খুবই কম। ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশ এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। ফলে অধিকাংশ বাঙালী উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের পথ-ঘাট ছেয়ে ফেললো; দখল করে নিল সরকারী জমি, বে-সরকারী পতিত, রেল-স্টেশন, মাঠ-ঘাট, ভাগাড় আর বন। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন অসংখ্য নরনারী পথের ভিখারীতে পরিণত হলো। সরকারী লঙ্গরখানায় এবং উদ্বাস্তু-শিবিরে আশ্রয় মিললো সামান্য কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুর। সকল উদ্বাস্তুর আশ্রয় ও পুনর্বাসনের কোন চেষ্টা তখনও ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হিন্দু নরনারীর আগমন-প্রবাহ আজও থামেনি।

উত্তরবঙ্গেও এই সমস্যা স্বাধীনতার প্রথম দশকে অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে। বহু স্থানে সরকারী আশ্রয় শিবির খোলা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই কম। তবে এতদঞ্চলে পতিত জমি, অরক্ষিত বনাঞ্চল এবং নদীর চরভূমি ছিল বিস্তর; ফলে অনেক উদ্বাস্তু ঐ সব জমি দখল করে স্বকৃত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ক'রে নেয়। অন্যদিকে জমির দাম কম থাকায়—বহু উদ্বাস্তু ভূমি ক্রয় করতে থাকে। আবার পতিত জমি উদ্ধার করে তাতে অত্যন্ত প্রান্তিক আয় উৎপাদনকারী ফসল ফলিয়ে অনেক উদ্বাস্তু ক্রমান্বয়ে স্বচ্ছল এবং আরো জমির মালিক হতে থাকে।

পূর্ববঙ্গ আগত এই উদ্বাস্তু শ্রেণী স্থানীয় ভাষায় 'ভাটিয়া' নামে অভিহিত হয়। এই ভাটিয়াগণ কৃষিকর্মে ও প্রযুক্তিগত কৌশলে উন্নত ছিল বলে স্থানীয় রাজবংশী জনগণের চোখের সামনে এরা অনেকেই অধিকতর সচ্ছলতা অর্জন করে। উচ্চবর্ণের ভাটিয়াগণ উত্তরবঙ্গের শহরাঞ্চলগুলির বিকাশ ঘটায় এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক হয়ে যায়। চাকরী-বাকরী, সমাজ ও সংগঠনাদির নিয়ন্ত্রণও প্রধানতঃ ভাটিয়াদের হাতে চলে যেতে থাকায় স্থানীয় রাজবংশী জনসাধারণের মনে ধীরে ধীরে ভাটিয়া-বিদ্বেষ শুরু হতে থাকে। এই সামাজিক অর্থনৈতিক কারণজনিত গণ-উত্তেজনার রাজনৈতিক ফলাফল যথাস্থানে আলোচিত হবে। এক্ষেত্রে আমরা রাজবংশীদের ভাটিয়া-বিদ্বেষের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু এই তথ্যের দ্বারা একথা প্রতিপন্ন করা হয়নি যে, সমস্ত রাজবংশী সম্প্রদায়ের সামগ্রিক কোন ক্রোধ ভাটিয়াদের উপরে তৈরী হয়েছে। এতে একথাও ভুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি যে, সমস্ত উদ্বাস্তু



১। নব্য প্রস্তরযুগীয় কুঠার : দার্জিলিং জেলা

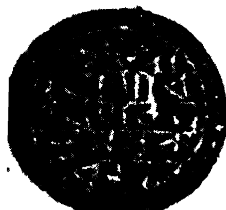


২। দ্রাবিড়-রাজধানী : বাণগড়, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

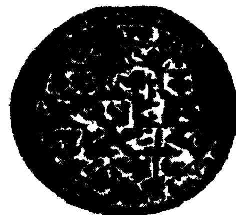


২১। বিষ্ণুমূর্ত্তি ঃ বগুড়া









১১। কোচরাজবংশের নারায়ণী মুদ্রা ঃ ১৬শ শতাব্দী

অর্থনৈতিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গে সাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা অর্জন করেছে। ফলতঃ ব্যাপারটা উল্টো। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু উত্তরবঙ্গে ক্রমপ্রতিষ্ঠা লাভ করলেও বৃহত্তম সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারই রয়েছে দারিদ্র্য-সীমার নীচে। স্থায়ী উৎপাদন মাধ্যমহীন, স্থায়ী আশ্রয়হীন অবস্থায় অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত এবং সংগঠন-বিমুক্ত ব্যক্তি বা রাজবংশী গ্রামীন পরিবার ভাটিয়া পরিবারের প্রতি না বিদ্বেষপরায়ণ, না আদৌ কৌতূহলী।

## ৮. হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও তজ্জনিত দেশ-বিভাগের আবশ্যিক পরিণতি-রূপে দেখা দিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। পূর্ববঙ্গে হিন্দুবিতাড়নের যে বিপুল সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক চাপ সৃষ্টি হয়, তার ফলে অত্যাচারিত, ছিন্নমূল ও স্বজনভ্রষ্ট নরনারীরা অসংখ্য হারে ভারতে প্রবেশ করে এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের উপর দাঙ্গার উস্কানি পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। ১৯৫১-৫২ সাল উত্তরবঙ্গে ব্যাপকভাবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার দুঃখজনক স্মৃতিতে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। দাঙ্গার কারণে বহু সংখ্যক মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে চলে যান। তবে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে ব্যাপার বেশি দূর গড়াতে পারেনি এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণবঙ্গে কিছু দাঙ্গা হলেও উত্তরবঙ্গে বিশেষ কিছু হয়নি। আর উত্তরবঙ্গ থেকে প্রধানতঃ সচ্ছল ও প্রতিষ্ঠা-লোভী মুসলমান সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে চলে গেলেও অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম-পরিবার এদেশে পূর্বাপর রয়ে গেছে। মালদা, দিনাজপুরে তো বটেই কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির সীমানা এলাকায় তাদের ঘন-বসতি, স্বাধীনতাপূর্ণ কালের মতই রয়েছে। বিহার ও দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-রক্ষায় অধিকতর সাফল্য লাভ করেছে।

## ৯. ছিটমহল সমস্যা

স্বাধীনতার উত্তরাধিকারের সঙ্গে যেমন এলো উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, তেমনি এলো ছিটমহল সমস্যা। মুঘলযুগে ছিটমহলগুলির উদ্ভব হলেও, সেকালে এবং বৃটিশ আমলে ছিটমহল প্রশাসন নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ ওগুলোর প্রশাসন-দায়িত্ব ছিল এক হাতে—মুসলিম আমলে কোচরাজাদের হাতে এবং বৃটিশ আমলে মূলতঃ ইংরেজদের হাতে। বিষয়টি যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মীরজুমলা কর্তৃক এবং ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এবাদাৎ খাঁ কর্তৃক কোচবিহার অভিযান এবং পরবর্তী দশ বছরে মুঘলদের উপর কোচ-অভিযানের

ফলে কোচবিহারের সীমানাস্থিত কয়েকটি চাকলার অধিকার মুঘল ও কোচদের মধ্যে বারে বারে হাত বদল হতে থাকে। অবশেষে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে আলিকুলি খাঁর সঙ্গে কোচরাজ রূপনারায়ণের সন্ধি হয়, যার শর্ত অনুসারে মুঘলরা ফতেপুর, কাকিনা ও কাজীরহাট চাকলা পায় এবং বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ চাকলা কোচবিহারের হাতে আসে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব হয়ে আসেন আওরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান্-ই-জহান্ খাঁ, তিনি শেখ ইয়ার মহম্মদ খাঁর নেতৃত্বে একটি মুঘল-বাহিনীকে পাঠিয়ে কোচবিহার আক্রমণ করেন এবং বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ দখল করেন। কিন্তু প্রজাদের তীব্র গণ-প্রতিরোধের সামনে পড়ে খান্-ই-জহান্ উক্ত চাকলা তিনটি শাসন করা অসম্ভব জেনে, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে কোচরাজার পক্ষে নাজিরদেওকে ইজারা দেন। কিন্তু এই ইজারাদারীর যুগে মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রামগুলি মুঘল-সরকারের প্রতি এবং হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামগুলি কোচরাজাদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে থাকে। তিনটি চাকলাতেই এর ফলে মুঘল ছিটমহল "মোঘলম" এবং কোচ-ছিট-মহল "রাজগীর" গড়ে ওঠে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মুঘল-সম্রাট শাহ্ আলমের ফরমান অনুসারে "মোঘলম"গুলির শাসন-ভার পায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পরে এগুলো সরাসরি বৃটিশ শাসনে আসে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে নাবালক রাজা বরেন্দ্র-নারায়ণের অভিভাবকরূপে 'রাজগীর' নামাঙ্কিত কোচ-ছিটমহলগুলির পরিচালনভার ইংরেজরা গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে Radcliffe Award অনুসারে বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্বভাগ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়লে কোন সমস্যা থাকতো না, কিন্তু Radcliffe সাহেবের শাসকীয় ফরমানের ফলে কোচ-ছিটমহলগুলির ১৩০টি পড়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানে যার উপরে সার্বভৌমত্ব বর্তালো ভারতের; অন্যদিকে প্রাক্তন "মোঘলম"গুলির ৯৫টি পড়ে গেল হিন্দুস্থানে যার উপরে সার্বভৌমত্ব দেওয়া হলো পাকিস্তানের। এই নির্মম কৌতুক-পূর্ণ দেশ-বিভাজনের ফলে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংকট তৈরী হয়ে গেল।

ভারতীয় ছিটমহলগুলিতে ভারত সরকার ও তার প্রশাসনের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব ও উপস্থিতি না থাকায় ঐসব ছিটমহলের প্রজাগণ পাকিস্তানী নাগরিক ও দুষ্টচক্রের অকথ্য-উৎপীড়নে স্বাধীনতার বছর থেকেই জমিজমা ঘরবাড়ী ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিদেশী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারত সরকার তার এই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলির উপর কোনই অধিকার

প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করতে না পারায়, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে নেহরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষবিত হয়, যে চুক্তির শর্ত ছিল, পাকিস্তানী ছিট-মহলগুলি যা ভারতে পড়েছে ( মোট ১৯ বর্গমাইল এলাকা ) তা ভারতের ভূখণ্ড বলে গণ্য হবে এবং ভারতের যে ছিটমহলগুলি পাকিস্তানে পড়েছে ( মোট ৩২ বর্গমাইল ) তা পাকিস্তানের ভূখণ্ড বলে গণ্য হবে এবং এই বিনিময়ে অতিরিক্ত ভূমি হস্তান্তরের জন্য ভাবত কোন ক্ষতিপূবণ দাবী করবে না।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এই ধরনের চুক্তিকে সংবিধান-বিরোধী আখ্যা দিলে, সংবিধানের নবম সংশোধন দ্বারা সে বাধা দূর করা হয় বটে, কিন্তু পার্লামেণ্ট এবং কোচবিহার-জলপাইগুড়ির জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে পড়ে এ ধরনের হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত আর কার্যকরী করা যায়নি। ফলে ছিটমহলেব ভাবতীয়গণ আজও নিরাপত্তাহীন, প্রশাসনেব আশ্রয়-হীন, সরকারী প্রকল্পেব সুবিধা-বিহীন, প্রায় নাগরিকত্বহীন নাগরিকের মতই টিঁকে রয়েছে। তার মধ্য থেকে যে অংশ ভারতের ভাগে পড়েছে, সেখানের অধিবাসীগণও উপযুক্ত পুনর্বাসনের অভাবে অনিশ্চিত অর্থনৈতিক জীবন-যাপনে বাধ্য হচ্ছে। ছিটমহল সমস্যা এতদঞ্চলের পক্ষে আজও এক জলন্ত রাজনৈতিক সমস্যা।

## ১০. উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন

স্বাধীনতা লাভেব অব্যবহিত পরেই উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজ-শাসনকালে চা-বাগানে শ্রমিক-সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করায় চা-বাগানের ইংরেজ-প্রশাসনের এক-নায়কী দাপট শিথিল হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল চা-বাগানেব মধ্যে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত এবং মধ্যযুগীয় শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত চা-শ্রমিকদের মধ্যে স্বভাবতঃই শ্রমিক সংগঠনগুলি দ্রুত বিস্তার লাভ করে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে অত্যল্প কালের মধ্যেই চা-বাগানে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও যৌথ দাবীর চাপ সৃষ্টি হয়।

১৯৪৮ সালে গ্রাসমোর চা-বাগানে প্রথম ঐতিহাসিক শ্রমিক-আন্দোলন ঘটে এবং উত্তরবঙ্গের চা-শিল্পের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ১১ দিনের ধর্মঘট পালিত হয়। এই উপলক্ষে নাগরাকাটা থানার সবগুলি চা-বাগান সহানুভূতি-সূচক ধর্মঘট পালন করে। যাই হোক, এইভাবে সমষ্টিগত দাবী ও আন্দোলন বিভিন্ন চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শ্রমিকগণ যেমন বাগান-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু মানবিক অধিকার ও আর্থিক সুবিধা লাভ করতে থাকে, তেমনি

সরকারেরও নজর আকৃষ্ট হয় চা-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে। তার ফলে ১৯৫০ সালে চা-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী আইন চালু হয়। সর্বনিম্ন মজুরী ধার্য হয় এক টাকা তিন আনা এবং মণ প্রতি ৫ টাকা দামে রেশন প্রদানেরও ব্যবস্থা হয়। ১৯৫১ সালে Plantation Labour Act চালু হয়। তাতে শ্রমিকদের ছুটিছাটা, শ্রমের সময়সীমা, পাকা গৃহের ব্যবস্থা ইত্যাদি আইনসঙ্গত অধিকার বলে গৃহীত হয়। ১৯৫১ সালেই সর্বপ্রথম চা-বাগানগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়।

১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে অবশ্য চা-শিল্পে দারুণ মন্দা ও আর্থিক সংকট দেখা দেয়। মালিক শ্রেণী আর্থিক সঙ্কটের এই বোঝাটি মূলতঃ শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ফলে ১৯৫১ সালের Plantation Labour Act-এর বিধিগুলো অমান্য করতে আরম্ভ করে কিছু কিছু। কম মূল্যে রেশনের যোগান বন্ধ হয়ে যায় সর্বত্র; তার পরিবর্তে মাত্র পাঁচ আনা বেতন বাড়ানো হয়। ফলে শ্রমিক অশান্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

## খ. নির্বাচিত মন্ত্রীসভা ও ডঃ বিধান রায়ের আমল

[ ১৯৫২-১৯৬২ ]

### ১. প্রথম সাধারণ নির্বাচন

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের নিয়মতন্ত্র অনুসারে এবং ভারত-জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে এটিই হল ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচন। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ২৩৮টি আসন ছিল, তার মধ্যে কংগ্রেস পায় ১৫০টি আসন। তাছাড়া কম্যুনিষ্ট দল ২৮টি, প্রজা-সোসালিষ্ট ১৫টি, ফরওয়ার্ড ব্লক ১৩টি, স্বতন্ত্র, হিন্দুমহাসভা ও জনসংঘ ১২টি এবং অন্যান্য দল ও নির্দল মিলে ১৯টি। কংগ্রেস বিধানসভায় ( এবং সেই সঙ্গে বিধানপরিষদে ) একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। ডঃ বিধান রায়ই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে দুইজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নেওয়া হয়, একজন জলপাই-গুড়ি থেকে—পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অপরজন কোচবিহার জেলা থেকে—পরিবহনমন্ত্রী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

### ২. উন্নয়নমুখী কাজকর্ম

ডাঃ বিধান রায়ের দশ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বকাল যেমন অজস্র সমস্যা-কন্টকিত ছিল, তেমনি তা বহুতর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও উন্নয়নমুখী কর্মদ্যোগে স্মরণীয় হয়ে

রয়েছে। একদিকে যেমন ভয়াবহ উদ্বাস্তু-সমস্যা, নতুন উদ্বাস্তু আগমনের অব্যাহত প্লাবন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের সমস্যা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরার ব্যাপক মড়ক প্রভৃতি অজস্র সমস্যা নবগঠিত গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রী সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্রুত ও সঠিক রূপায়ণ, স্বাধীনতা-উত্তর দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন ও শাসনরীতির সংস্কার এবং জনকল্যাণ-মূলক অজস্র প্রকল্প এসময় গৃহীত হয়েছিল। তবে উন্নয়নের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ দক্ষিণবঙ্গে যে ব্যাপকতায় গৃহীত হয়েছে, উত্তরবঙ্গে তেমনটি হয়নি। তবু এই সময় রাস্তাঘাট উন্নয়নে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নয়নে উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্ম শুরু হয় এবং তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। এই সময়ে শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং এই উন্নয়নকেন্দ্রটি দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। এই সময় শিলিগুড়ি নর্থ স্টেশন থেকে গৌহাটি পর্যন্ত রেল লাইন বসানো হয়, মাত্র দু' বছরের মধ্যে [ ১৯৫১-৫২ ]। গৌহাটি ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সরাসরি সংযোগের মাধ্যমরূপ শিলিগুড়ি শহর আত্মপ্রকাশ করলে এর শিল্প-বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে এবং শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গসহ আসাম, ভুটান ও সিকিমের মূল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়।

## ৩. আসাম থেকে বাঙালী বিতাড়ন

এই সময় প্রান্তিক উত্তরবঙ্গ জুড়ে নতুন বিপদ এলো আসাম থেকে বিতাড়িত বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রবাহ। আসামে বাঙালী-বিদ্বেষের এই ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত এবং এই ধারা উত্তরবঙ্গের ভাটিয়া-বিদ্বেষের মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে উদ্ভূত হলেও পরে রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন ও উস্কানিতে ক্রমাগত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এর মধ্যে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তা-বোধের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রয়েছে। অহমিয়াগণ চাননি যে বঙ্গভাষাভাষী লোকসংখ্যা তাদের রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাছাড়া 'ভাটিয়ারা' যেমন উত্তরবঙ্গে তেমনি আসামেও চাকরী, ভূমি এবং ব্যবসাতে কৃতিত্ব ও একচেটিয়া প্রতিপত্তির প্রবণতা প্রদর্শন করায় প্রাদেশিক সংকীর্ণতাবশতঃ সংগঠিত অহমিয়াগণ বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে শহরে বাঙালীদের উপর হামলা করতে থাকে; তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়, দাঙ্গাতে শত শত বাঙালী নরনারী নিহত হয় এবং প্রাণভয়ে হাজার হাজার বাঙালী আসাম ছেড়ে উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নেয়।

সরকারী আশ্রয়-শিবির খোলা হয় বহু স্থানে। তাছাড়া অনেক লোক পরিচিত বা আত্মীয়-স্বজনের দ্বারেও আশ্রয় খুঁজে নেয়।

আসামে এই 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনমনে দারুণ বিরূপতা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিছু বাঙালী হিন্দু প্রতিশোধ নেবার জন্য আসাম সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। রাজ্যসরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপে বাঙালীদের সে প্রতিক্রিয়াজনিত দাঙ্গা থেকে নিবৃত্ত করা হয় এবং উত্তরবঙ্গেও উত্তেজনা প্রশমনের সবরকম চেষ্টা করা হয়। এর ফলে আন্তঃ-প্রাদেশিক জনগণের দাঙ্গা প্রতিহত হয়, কিন্তু অহমিয়াদের বাঙালী বিতাড়ন, গণ-লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি অবাধেই চলতে থাকে, মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি নিয়ে। বিষয়টির একটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমাধান এখনো পর্যন্ত হয়নি।

### ৪. খাদ্য আন্দোলন ( ১৯৫৯ )

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে বামপন্থী দলগুলি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ কলকাতায় ব্যাপক খাদ্য-আন্দোলন গড়ে তোলে। খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির হার থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় দেশে প্রচুর খাদ্যের ঘাটতি দেখা যায়। জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূল হেতু ছিল লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমন। যাই হোক, বামপন্থী দলগুলি দক্ষিণবঙ্গে সফল আন্দোলন গড়ে তুললেও— তৎকালে উত্তরবঙ্গ মূলতঃ কংগ্রেসের ঘাঁটি থাকায় সে আন্দোলন ব্যাপক রূপ-পরিগ্রহ করেনি। সে জন্যে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

## গ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের আমল

## ( ১৯৬২-১৯৬৭ খৃ. )

### ১. স্থিতিশীল সরকারের উত্তরাধিকার

মুখ্যমন্ত্রীরূপে কর্মরত অবস্থায় ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই নিজের জন্মদিনের আনন্দোৎসবের মধ্যে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলে, কয়েক-দিনের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। এইভাবে মাত্র ৫ মাস আগে নির্বাচিত একটি সরকারের কর্ণধার হবার এবং সাড়ে চার বছর বিনা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করার সুযোগ এসে গেল প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের হাতে। এই সময় বিধানসভার ২৪০টি আসনের মধ্যে ১৫৬টি আসন থাকায় বিপুল ও নিশ্চিন্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল শাসক দল কংগ্রেসের।

প্রফুল্ল সেনের এই মন্ত্রীসভায় এবং বলাবাহুল্য, ডাঃ রায়ের পূর্ববর্তী (১৯৫৭ সালের) মন্ত্রীসভাতেও, উত্তরবঙ্গের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সুযোগ কমে গিয়েছে। কিন্তু ১৯৫৭ ও ১৯৬২তে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে একজন করে মন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায়। ১৯৫৭ সালে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ছিলেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (পূর্ত) এবং শ্রী এস. পি. বর্মন (আবগারী), কোচবিহার থেকে শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ (উপমন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র, ), মালদা থেকে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র (উপমন্ত্রী—শিক্ষা), দার্জিলিং থেকে দু'জন—তেনজিং ওয়াংদি (উপমন্ত্রী—উপজাতি কল্যাণ) এবং নরবাহাদুর গুরুং (উপমন্ত্রী—শ্রম)। ১৯৬২ সালে অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গ থেকে ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন, যথা—জলপাইগুড়ি থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (পূর্ত), পশ্চিম দিনাজপুর থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুশীল চ্যাটার্জি (শিক্ষা), মালদা থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র (শিক্ষা), দার্জিলিং থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রী তেনজিং ওয়াংদি (পশুপালন), কোচবিহাব থেকে উপমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র ডাকনা (বাণিজ্য) এবং পশ্চিম দিনাজপুর থেকে উপমন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন (স্বাস্থ্য)।

## ২. চৈনিক আক্রমণের ত্রাস ও প্রতিক্রিয়াজাত বিকাশ

১৯৬২ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকায় চীন ব্যাপকভাবে হামলা চালায়, যদিও বিগত ৪ বছর ধরেই তারা সীমান্তে সড়ক নির্মাণ করে চলেছিল এবং ঐ বছর জুলাই মাস থেকেই অল্পবিস্তর আক্রমণ চালিয়ে আসছিল সীমান্ত চৌকিগুলিতে। যাই হোক, এই ব্যাপক চৈনিক আক্রমণের মুখে ভারতের অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈন্যগণ দাঁড়াতে পারেনি এবং তারা দিনে প্রায় ৪০ মাইল হারে পশ্চাত অপসরণ করতে থাকে। বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী নিয়ে চীন ভারত-ভূখণ্ডের ব্যাপক এলাকা দখল করে নেয়। যার পরিমাণ হবে প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল। সীমান্ত এলাকায় ভারতে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এভাবে ভেঙ্গে পড়ায় উত্তর আসাম থেকে ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ী ফেলে লোকে পালাতে থাকে। সারা আসাম ও প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে তার ত্রাস ও আশঙ্কার ছায়া পড়ে। প্রাথমিক পরাজয় থেকে পরিস্থিতিগত পরিবর্তন আনবার যোগ্য ব্যবস্থা যখন নেওয়া হচ্ছিল, তখনই চীন এক-তরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং দখলীকৃত এলাকা থেকে তথাকথিত বিতর্কিত সীমানা এলাকার ৫০০০০ বর্গমাইল চীন আত্মস্থ করে নেয়। আজ পর্যন্ত এ দখলী ভূমি পুনরুদ্ধার করা যায়নি।

যাই হোক, ১৯৬২ সালের চীনযুদ্ধে সমগ্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের মত উত্তরবঙ্গেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মত উত্তরবঙ্গেও ব্যাপক অর্থ, সোনা-রূপা ও দ্রব্য-সামগ্রী দানরূপে পাওয়া গেছে ; অকৃপণ হাতে এখানকাব জনগণ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন ঐ সব সহায়-সম্পদ চীন-বিরোধী যুদ্ধের জন্য। এই চীন-যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই উত্তরবঙ্গে এস. এস. বি. অর্গানাইজেশন গড়ে ওঠে এবং প্রচুর স্থানীয় ছেলেও দেশরক্ষামূলক এই সংস্থায় যোগদান করে। যুদ্ধের কল্যাণে উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও সাঁকোগুলির দ্রুত পুনর্নির্মাণ ও উন্নতি ঘটে। এই সময় উত্তরবঙ্গ দিয়ে ৩১নং ন্যাশন্যাল হাইওয়েকে চওড়া ও মজবুত করা হয়। সীমানা অঞ্চলের সকল রাস্তারই উন্নতি ঘটানো হয়। এই সময়ই ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, বিশেষতঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে সামরিক ছাউনি ও গ্যারিসন গড়ে উঠতে থাকে। এতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্থানীয় বাজার-হাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থায় কিছুটা উন্নতি ঘটে। এই সময় শিলিগুড়ির খুব উন্নতি ও প্রসারণ ঘটতে থাকে। শিলিগুড়ি বাজারের উন্নতি ও বিকাশে কিঞ্চিৎ উত্তরস্থিত সেনাবাহিনীর ঘাঁটিগুলির অবদান কম নয়। জলপাইগুড়ির বিনাগুড়িতেও অনুরূপ সামরিক বাহিনীর বিভাগীয় মূল ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালে প্রায় এক মাইল লম্বা তিস্তা ব্রীজও সামরিক-বাহিনীর প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গড়ে ওঠে এবং তার ফলে জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

### ৩. খাদ্যসংকট ও গণ-আন্দোলন ( ১৯৬৬ )

১৯৬৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে আবার ভীষণভাবে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সরকার তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেবারেই প্রথম পাঁচ টাকার উপরে চাল কিনতে বাধ্য হয়। তাও খোলা বাজারে চাল দুষ্প্রাপ্য। এমত অবস্থায় স্বভাবতঃই দেশ জুড়ে অশান্তি, অনাহার, উত্তেজনা ও আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। শাসকীয় দলের মধ্যেও মতপার্থক্য গড়ে ওঠে। প্রদেশ-কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অজয় মুখোপাধ্যায় এই সময় শাসকীয় কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ান এবং ১৫ই জুলাই ( ১৯৬৬ ) নিজস্ব দল বাংলা কংগ্রেস গড়ে তোলেন।

১০ই মার্চ ( ১৯৬৬ ) বামপন্থী তথা বিরোধী দলগুলি খাদ্য যোগানে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদে একদিনের বাংলা বন্ধ ডাকে। শ্রীসেনের সরকার শক্ত হাতে বাংলা বন্ধের মোকাবিলা করলেন। ১৩৪০ জন লোক বন্দী হলো,

জনতার হাতে একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর নিহত হলেন। অন্যদিকে পুলিশের গুলিতেও কমপক্ষে ৫ জন নিহত ও ১২।১৩ জন আহত হয়। এর ফলে পরবর্তী ৮ দিন যাবৎ নানা স্থানে হাঙ্গামা হতে থাকে। কার্ফু জারী করা হলো—সর্বত্র। ১৯৬৭ সালের ১৮ই মার্চ পর্যন্ত কাবাগারে নিক্ষিপ্ত হলো ৭০০০ ব্যক্তি।

কিন্তু আন্দোলন এখানেই প্রশমিত হ'ল না। ৭ই এপ্রিল বামপন্থীরা আবার সারা রাজ্যে হরতালের ডাক দেয়। এই সময় উত্তরবঙ্গেও খাদ্যাভাব মারাত্মক রূপ লাভ করে এবং বিভিন্ন জেলায় দীর্ঘ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হতে থাকে। এমনি একটি মিছিল ও পথসভা এসময়ে স্থানীয় জেলা-শাসকের গাড়ীকে ঘিরে ফেলে; আত্ম-উদ্ধারে জেলাশাসক গুলি করেন এবং বন্দনা তালুকদারসহ আরো অন্ততঃ ২।৩ জন মারা যায়। সরকার-বিরোধী মনোভাব ও গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রীসভা কোন রকমে টিঁকে থাকে। অবশেষে ১৯৬৭ সালে বিধানসভা বাতিল হয় ও নতুন নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের সরকার গঠিত হয়।

## ঘ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির আমল

(মার্চ—নভেম্বর ১৯৬৭)

### ১. চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ও যুক্তফ্রণ্টের ক্ষমতালাভ

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে দীর্ঘ ২০ বছর শাসকীয় ক্ষমতায় থাকার পরে কংগ্রেসের পতন ঘটে। পূর্বতন বিধানসভায় তাদের ১৫৬ আসন থাকলেও এবারের নির্বাচনে তারা মোট ১২৭টি আসন লাভ করে। ফলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তথা শাসনক্ষমতা থেকে ভ্রষ্ট হয়। অপর দিকে অন্যান্য দলের দলগত অবস্থা ছিল এই, সি. পি. এম—৪৩, বাংলা কংগ্রেস—৩৪, সি. পি. আই—১৬, ফরোয়ার্ড ব্লক—১৩, এস. এস. পি—৭, এস. উ. সি.—৪, পি. এস. পি—৭, শ্রমিক পার্টি—২, আর. এস. সি—৬, জনসঙ্ঘ—১, গোর্খা লীগ—৩; স্বতন্ত্র—১, অন্যান্য—১৬। নির্বাচনের আগেই সি. পি. এম. বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, সি. পি. আই, আর. এস. পি. প্রভৃতি দলের সঙ্গে মিলে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করেছিল। কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তাই যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতা দখল করে। বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হন ও সি. পি. এম. নেতা শ্রীজ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেন।

এই সরকার ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ প্রথম থেকেই বাংলা কংগ্রেস ও সি. পি. এম.-এর মধ্যে অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব ও দলীয় সংঘর্ষ গড়ে ওঠে। বামপন্থী

দলগুলি বিশেষতঃ সি. পি. এম-এর পতাকা উত্তোলন করে ভূমি-দখলের প্রবণতা এবং তাকে কেন্দ্র করে অজস্র সংঘর্ষে গ্রাম-বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে প্রতিনিয়ত। একদিকে যেমন ভূমি দখলের লড়াই জোতদার-খেত-মজুরদের সংঘর্ষ বেড়ে চললো, অন্যদিকে তেমন দেশ জুড়ে শুরু হলো বামপন্থী কৃষক-অভ্যুত্থান; যাকে ভাষান্তরে নকশাল আন্দোলন বলে।

## ২. নকশাল-আন্দোলন

১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও দীর্ঘপ্রসারী ফলাফলযুক্ত কৃষক-আন্দোলন বা কৃষক-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়, যার জন্যে অকুস্থল নকশালবাড়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয় এবং এই আন্দোলন 'নকশাল আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করে। উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলনের সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন সর্বশ্রী চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রভৃতি। এরা মার্কসবাদী কৃষক-সভার নামে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ী থানার 'ব্যাঙ্গাই জোতে' ছোটনাগপুরীয় উপজাতি সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, খড়িয়া ও ধামালদের মধ্যে এই সংগঠন যথার্থ দৃঢ়তা লাভ করেছিল। ১৯৬৭ সালের ২৪শে মে ব্যাঙ্গাই জোতের আদিবাসী কৃষক, মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের একটি মিছিল বের হয়— যাদের মুখে দাবী ছিল, 'লাঙল যার, জমি তার।' এই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালে ৬ জন মহিলা ও একটি শিশু নিহত হয়। নকশালবাড়ী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত এই ঘটনাতে এবং এরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

ব্যাঙ্গাই জোত এবং তার আশে-পাশে নকশালী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী মোতায়েন করতে হয়। দিনের বেলায় পুলিশের ধরপাকড় চললেও রাতে বিরাট এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনেই থাকতো। প্রায় মাসাধিক কাল নকশালপন্থীরা ব্যাঙ্গাই জোতের ঘাঁটিটি আঁকড়ে পড়ে থাকে, গেরিলা যুদ্ধের প্রতিরোধ-প্রাচীর তুলে। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র মোকাবিলায় গেরিলা-ইউনিট-লিডার বাবুলাল বিশ্বকর্মকার এবং আরো কয়েকজন নকশালপন্থী নিহত হয়। সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ নাগাদ নকশালদের ব্যাঙ্গাই জোতের ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ হয় এবং ঐ এলাকা পুরোপুরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসে। নকশালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক-অভ্যুত্থান পত্রপত্রিকায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে। চীনের বেতারতরঙ্গেও এই

আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিদিন প্রচার চালানো হয়, ভারতীয় ভাষাগুলিতে, ভারতীয় শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে। যে-করেই হোক অত্যল্পকালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও একাধিক ঘাঁটি গড়ে তুলে নকশালরা জোতদার ও মহাজনদের খতম করতে থাকে। আবার প্রয়োজনমত পুলিশের উপরও হামলা চালায়। জলপাইগুড়ি জেলায় কুমারগ্রাম দুয়ারের 'ভলকা' অঞ্চল, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার 'নাজিরাম দেউটিখাতা' মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় একাধিক অঞ্চলে বন্দুক ছিনতাই, জোতদার হত্যা, পুলিশের উপর গেরিলা আক্রমণের দ্বারা নকশালপন্থীরা তথাকথিত 'মুক্তাঞ্চল' গড়ে তুলতে থাকে।

১৯৬৮ সালে 'সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট কো-অর্ডিনেশন কর রিভল্যুশন' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা তৈরী হয় এবং চারু মজুমদার তার সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৬৯ সালের ১লা মে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (মার্কস্‌বাদী-লেলিনবাদী)-র জন্ম হয় এবং চারু মজুমদার তার সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৬৯-৭০ সালে নকশালরা অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম, বিহারে মুসাহার, উত্তরপ্রদেশে 'লাখিমপুর-খেরী' অঞ্চলে ব্যাপক নকশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০-৭১ সালে নকশালগণ সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করতে আহ্বান জানায় এবং এদের মুখে নতুন শ্লোগান "শ্রেণীশত্রু খতম কর" "গ্রাম শহর দখল কর" ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। এই সময় নকশালদের সঙ্গে পুলিশের নিত্য-সংঘর্ষের বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে। হাজার হাজার নকশালপন্থী বিভিন্ন মামলার আসামীরূপে জেলে চালান হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে চারু মজুমদার ধৃত ও বন্দী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে নকশাল আন্দোলন বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পুলিশী তৎপরতায় তাকে সাময়িকভাবে দমন করা সম্ভব হয়।

### ৩. যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্কলহ ও পতন

আগেই বলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রণ্টের শরিক দলগুলির মধ্যে গোড়া থেকেই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ১০ জন বাংলা কংগ্রেস এম. এল. এ. যুক্তফ্রণ্ট ত্যাগ করে চলে যান এবং ভারতীয় ক্রান্তি দলে যোগ দিয়ে বিরোধী পক্ষে বসে। শাসকদলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আসে। কিন্তু এর উপর, ৩রা নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যুক্তফ্রণ্ট থেকে পদত্যাগ করে এবং আরো ১৬ জন

এম. এল এ তাঁকে অনুসরণ করেন। নিশ্চিতভাবেই শাসকদল বিধানসভায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। ফলে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে সত্বর বিধানসভা ডেকে শক্তি পরীক্ষা দিতে বললেন। শ্রীঅজয় মুখার্জি ও তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ রাজ্যপালের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। অগত্যা ২১শে নভেম্বর রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে খারিজ করে দিলেন।

## ৬. মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের আমল [ দ্বিতীয় পর্ব ]

( ২২শে নভেম্বর ১৯৬৭—২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ )

### ১. আকস্মিক ক্ষমতার হস্তান্তর

আকস্মিকভাবে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটলে, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ পূর্বের ১৭ জন বিক্ষুব্ধ এম. এল. এ.-কে নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রীসভা তৈরীর অনুমতি চাইতে, যেহেতু তিনি সমস্ত কংগ্রেসী এম. এল. এ.-কে সপক্ষে পাবেন। ২২শে নভেম্বর প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস পার্টি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করলো। অগত্যা রাজ্যপাল ডাঃ ঘোষকেই মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি দিলেন। বিক্ষুব্ধ যুক্তফ্রন্ট প্রতিবাদে সারা দেশ জুড়ে হরতাল ডাকলেন। শুধু একদিনের জন্য নয়—পর পর তিন দিনের জন্য, ২২, ২৩ এবং ২৪শে নভেম্বর। এই হরতাল উপলক্ষে সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ঘটে এবং তার ফলে কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়। পুলিশ দাঙ্গার অভিযোগে ২০০০ লোককে বন্দী করে।

### ২. কংগ্রেসী প্রয়াস ও মন্ত্রীসভার পতন

২৯শে নভেম্বর বিধানসভার মধ্যে অধ্যক্ষ বিজয়কুমার ব্যানার্জি ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভাকে অবৈধ আখ্যা দেন এবং বিধানসভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে নতুন সমস্যা তৈরী করলেন। সংখ্যালঘু সরকারের যাতে পতন না ঘটে তার জন্যে একদিকে যেমন কংগ্রেস পক্ষ থেকে আস্থা ভোট জ্ঞাপন করা হয়, অন্যদিকে তেমনি ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভার উচ্ছেদের জন্য যুক্তফ্রন্ট ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। অবস্থা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। অনেক স্থানে দাঙ্গাও হয়। সারা দেশে ৭৩০০ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়।

বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়ে ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভাকে বাঁচানো যাবে না জেনে, ১৫ই জানুয়ারীতে কংগ্রেস পক্ষ ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা যার ডাক নাম ছিল "পি. ডি. এফ." মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশন ডাকা হয়, সেখানে আবার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি তাঁর ২৯শে নভেম্বরের সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করেন ও বিধানসভা অনির্দিষ্ট

কালের জন্য বন্ধ করে দেন। যুক্তফ্রন্টের বিধায়কগণ রাজ্যপালকেও বিধানসভা কক্ষে ঢুকতে বাধা দেন। গভর্ণর নানা ভাবে চেষ্টা করেও বিধানসভায় ঢুকতে পারেননি। আর কোন গত্যন্তর না থাকায় ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতিশাসন নেমে আসে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বেব দ্বিতীয় পর্ব এইভাবে কোন বিশেষ কর্ম ও সাফল্যহীন পরিস্থিতিতে অবসিত হয়।

## চ. পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতিশাসন ( ১ম পর্ব )

( ১৯৬৮, ২০শে ফেব্রুয়ারী—১৯৬৯-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী )

ডঃ ঘোষের মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে এক বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপতি-শাসনে চলে যায়। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন ধরমবীব। তিনি অল্পদিনেব মধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা দূব করেন। তার আমলে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনা হলো—ভয়াবহ বন্যা ও প্রশংসার্হ সরকারী ত্রাণ-ব্যবস্থা।

### ১. উত্তরবঙ্গে শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম বন্যা

১৯৬৮ সালেব ৫ই অক্টোবর ভোর রাতে যে বিরাট ও প্রবল জলরাশি সমগ্র উত্তরবঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার তুলনা ঐতিহাসিককালের মধ্যে পাওয়া যায়নি। ভুটান-সিকিমের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আকস্মিক প্রবল বৃষ্টিপাতের সামগ্রিক জলধারা সীমিত নদীখাতে নামতে গিয়ে হঠাৎ ২০।২২ ফুট উঁচু হয়ে ওঠে এবং স্রোতের সেই আকস্মিক চাপ নদীর পাড, বসতি, শহর সব ভেঙ্গে ভাসিয়ে চুরমার করে দিয়ে গেল। এই প্লাবন শুধু জলপাইগুড়ি নয়, কোচবিহার, মালদা, দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলাতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। ভুটান ও সিকিমেও ব্যাপক বন্যা হয়। দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ে ধ্বস নামায় সড়কপথ যেমন বন্ধ, অপর দিকে তেমনি বসতিসমূহকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জলপাইগুড়ির শহরটির ক্ষয়ক্ষতি হয় চূড়ান্ত।

এই বন্যায় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলাতেই লোকের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে বা ডুবিয়ে, ফসল নষ্ট করে যে অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধন করেছে তা বর্ণনাতীত। তাছাড়া রেললাইন ভেঙ্গে, সড়ক ডুবিয়ে যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বহু লোক নিহত এবং প্রায় দশ হাজার পশুও নিহত বা নিখোঁজ হয়।

সরকার অবশ্য খুবই দ্রুততার সঙ্গে এবং ব্যাপকভাবে ত্রাণ-ব্যবস্থা হাতে তুলে নেন। গভর্নর ধর্মবীরা নিজে দার্জিলিং-এ উপস্থিত থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজকর্মের পরিচালনা করেন। উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ছুটে এলেন। ২৪শে অক্টোবর

প্রধানমন্ত্রী নিজেই এলেন উত্তরবঙ্গ সফরে। মেখলিগঞ্জ, দার্জিলিং, কালিম্পং-এ তিনি গণভাষণ দিলেন। ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রাণ বাবদ রাজ্যসরকারের খরচ হয় ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যসরকারের ত্রাণ-বাবদ খরচ হয় ১ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। ত্রাণ-সামগ্রী পরিবহনের জন্য রেল বিনামাশুলে ভারতের যে-কোন স্থানে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ব্যাপক ত্রাণ-ব্যবস্থার দ্বারা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলেও এই বন্যায় ফসল ও সাধারণভাবে অর্থ-নীতির যে ক্ষতি হয়, তা সত্যিই অপূরণীয়। এর ফলে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর নাগাদ ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা যায়। ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের অভাব ছিল ২৪ লক্ষ টন। আংশিকভাবে সে অভাব পূরণের জন্য এককালীন লেভি ধার্য হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারও বাঙলাতে প্রয়োজন মত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। ফলে পরিস্থিতি খুব গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে না।

## ছ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জির আমল [ দ্বিতীয় পর্ব ]

### ১. মধ্যবর্তী নির্বাচন ও যুক্তফ্রণ্টের ক্ষমতালাভ

[ ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ থেকে ১৬ই মার্চ, ১৯৭০ ]

দু'মাস করে দু'দফা রাষ্ট্রপতি শাসনকালের শেষে ৯ই ফেব্রুয়ারীতে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। এবারে যুক্তফ্রণ্ট অনিশ্চিত গরিষ্ঠতার দুশ্চিন্তামুক্ত হতে আরো বেশি সংখ্যক দলের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা তৈরী করে ভোট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং প্রত্যাশা অনুরূপ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্য-শাসনের ক্ষমতায় ফিরে আসে। ২৮০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভাতে কংগ্রেস মাত্র ৫৫টি আসন লাভ করে। যুক্তফ্রণ্ট পায় ২১৪টি আসন অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগ আসন। এবারেও ১২ পার্টির ফ্রণ্টের নেতা হিসেবে শ্রীঅজয় মুখার্জীই মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন ( ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ৬৯ )। উপমুখ্যমন্ত্রী হন শ্রীজ্যোতি বসু।

এবারেও গোড়া থেকে ক্ষমতাসীন দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়ে গেল, বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে অথবা স্রেফ ব্যক্তিগত আক্রোশে। এবারেও বে-আইনী ভূমিদখল প্রভৃতিতে চারিদিকে গণ্ডগোল শুরু হলো। এরই মধ্য দিয়ে ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যপাল ধর্মবীরকে বিদায় দেওয়া হলো। চারিদিক থেকে দাঙ্গা ও হত্যার খবর এসে পৌঁছতে লাগলো রাজধানীতে। ৬ই এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবরে আলোহীন কক্ষে অসংখ্য নারীর ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হলে চারিদিকে যুক্তফ্রণ্টের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অক্ষমতার বিষয়ে জোর বাদানুবাদ ছড়াতে

থাকে। ইতিমধ্যে নকশালরা সংহত হতে শুরু করেছে এবং খোদ গড়ের মাঠে বিশাল সমাবেশ ডেকে ১লা মে তারা তাদের নূতন পার্টির নামকরণ করলো সি. পি. আই (এম. এল)। ৩রা জুলাই, ৫০০ সশস্ত্র পুলিশের একটি বাহিনী বিধানসভা অভিযান করে এবং বিধানসভায় ব্যাপক ভাঙচুর করে। ২৬শে নভেম্বর বাংলা-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহের ডাক দিল। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নিজের শাসনকে 'জঙ্গলের শাসন' আখ্যা দিয়ে এই সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিতে গেলেন। ৩০শে ডিসেম্বর ফরোয়ার্ড ব্লক সব গণ্ডগোলের জন্য সি. পি. এমকে দায়ী করে প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাংলা-কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টের সভা প্রত্যাখ্যান করে। ৮ই মার্চ বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৬ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। এইভাবে আভ্যন্তরীণ কলহে বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা নিয়েও যুক্তফ্রন্ট কাজ করতে পারলো না। শুরু হলো আবার রাষ্ট্রপতির শাসনকাল। এই সময়ে সীমান্তের ওপারে শুরু হয়েছে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দেশ জুড়ে চলছে বিদ্রোহ আর সামরিক বাহিনীর গণ-অত্যাচার। সে কাহিনী রাষ্ট্রপতি শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করে বলে সেখানেই আলোচিত হবে।

## জ. পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন [ দ্বিতীয় পর্ব ]

[ ১৬ই মার্চ, ১৯৭০—১৫ই মার্চ, ১৯৭১ ]

### ১. পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও উত্তরবঙ্গ

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের কাল থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদী শাসনে নিষ্পেষিত পূর্ববঙ্গ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যখন তাদের নেতা মুজিবর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করে তুলেছিল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তে সে স্বপ্ন সম্পূর্ণ প্রতিহত হয়। মুজিবর রহমান তখন নিরুপায় হয়ে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জনগণকে গণযুদ্ধে সামিল হতে বলেন। শুরু হলো আত্মগোপনকারী নেতাদের নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যালীলায় দেশের মধ্যে ৩০ লক্ষ বাঙালী নরনারীর প্রাণ গেল, কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুঠ হল এবং প্রায় ৯০ লক্ষ বাঙালী সীমান্তের এপারে চলে এলো। এদের মধ্যে এক বিপুল অংশ উত্তরবঙ্গের মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে সরকারী আশ্রয়-শিবিরে এসে উঠলো। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এত মানুষকে কখনো বাস্তুচ্যুত হতে হয়নি এবং দেশান্তরেও আশ্রয় নিতে হয়নি।

এই অত্যাচারিত ও আশ্রয়হীন নরনারীর সাময়িক আশ্রয়ের সুবন্দোবস্ত করতে সরকারী প্রশাসন ও জনসাধারণ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে।

কিন্তু এক বছর ধরে শরণার্থী আগমনের এই স্রোত এবং বিপুল পরিমাণ আর্থিক দায় বহন করা ভারত সরকারের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছিল। ১৯৭১ সালের ১৮ই নভেম্বর প্রেসিডেণ্ট ভি. ভি. গিরি জলপাইগুড়ির শরণার্থী শিবির বলরামপুরহাট ও বন্ধুনগর পরিদর্শনে আসেন। ভারত যে ধৈযের সীমা অতিক্রম করেছে তা তিনি এখানেই প্রথম ঘোষণা করেন। ৩০শে নভেম্বর ভারতের সঙ্গে পূর্বে ও পশ্চিমে পাকিস্তানের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ও একলক্ষ সৈন্য-সহ সেনানায়কগণ বন্দী হন। ১৭ই ডিসেম্বর ভারত পশ্চিম ফ্রণ্টেও একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। উদ্বাস্তগণ আবার স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যায়। উত্তরবঙ্গেব উপর থেকে শরণার্থীকৃত অর্থনৈতিক চাপ দূর হয়, নতুন করে বাণিজ্যিক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুই দেশের মধ্যে সাধারণ লোকেদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়।

## ঝ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর আমল [ তৃতীয় পর্ব ]

( ১৫ই মার্চ, ১৯৭১—২৯শে জুন, ১৯৭১ )

ইতিমধ্যে ১৯৭১ সালের ১০ই মার্চ একটি সাধারণ নির্বাচন হয়। তাতে সি. পি. এম. একক গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ( ১১৬ আসন ) এবং অজয় মুখার্জির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে না চাওয়ায়, শ্রীমুখার্জি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কংগ্রেসের সঙ্গে (১০৩ আসন) কোয়ালিশন সরকার তৈরী করেন। এই মন্ত্রীসভায় শ্রীমুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রীবিজয় সিং নাহার উপমুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নেয়। এই সরকার মাত্র তিন মাস স্থায়ী হয় এবং ফলে, শ্রীমুখার্জির স্বেচ্ছাপদত্যাগে ২৯শে জুন, ১৯৭১ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হয়।

## ঞ. রাষ্ট্রপতি শাসন ( তৃতীয় পর্ব )

( ২৯শে জুন, ১৯৭১—১০ই মার্চ, ১৯৭২ )

২৯শে জুন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি পদত্যাগ করায় পশ্চিমবঙ্গ পরিচালনার ভার রাষ্ট্রপতির পক্ষে রাজ্যপাল শ্রী এস. এস. ধাওয়ানের উপর আপতিত হয়। এই পর্বটি রাজনৈতিক ঘটনাধারার দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে এর বিস্তৃত আলোচনা পরিত্যক্ত হলো। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য গণ-টোকাটুকি প্রভৃতি এ-যুগের কষ্টদায়ক স্মৃতি হয়ে রয়েছে মানুষের কাছে।

## ট. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমল

(১০ই মার্চ, ১৯৭২—জুন ১৯৭৭)

### ১. সাধারণ নির্বাচন ও কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভ

১৯৭২ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নতুন করে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮১টি আসনের মধ্যে ২১৬টি পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। অন্যান্য দলের দলগত পরিস্থিতি নিম্নরূপ:—সি. পি. আই. ৩৬, সি. পি. এম. ১৪, আর. এস. পি. ৩ ইত্যাদি। যাই হোক, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের নতুন নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই আমলে আবার উত্তরবঙ্গের সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব ফিরে আসে মন্ত্রীসভাতে। এই সময় উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা থেকে মন্ত্রী হন শ্রীসন্তোষ রায় (পূর্ত ও গৃহনির্মাণ) এবং ডঃ ফজলে হক—(স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী), জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীজগন্নাথ রায় (সমবায়), দার্জিলিং জেলা থেকে দেওপ্রকাশ রাই (তপশীল ও আদিবাসী কল্যাণ ও পর্যটন), পশ্চিম দিনাজপুর থেকে ডঃ জয়নাল আবেদিন (স্বাস্থ্য ও সমষ্টি উন্নয়ন), দার্জিলিং থেকে ঈশ্বর তিবকি (শ্রম)। এই সময় মন্ত্রীসভা জেলায় জেলায় গিয়ে অধিবেশন করার নীতি গ্রহণ করেছিল।

এই সময় বেকারী-সমস্যা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। সরকার নানা ভাবে চাকরীর চেষ্টা করলেও এবং বেশ কিছু নিয়োগ-সংস্থান করলেও চাকরীর নিয়োগ-পদ্ধতিতে কোন নিয়ম-কানুন মানা হতো না। এম. এল. এ, মন্ত্রী, এম. পি. প্রভৃতিদের চাকরী করিয়ে দেবার জন্য বিশেষ কোটা দেওয়া ছিল। এতে যেমন স্বজন-পোষণ তেমনি অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় এবং রাজ্যজুড়ে সরকারপক্ষের ব্যাপক সমালোচনা হয়।

১৯৭৩-৭৫ সাল দুটিকে প্রায় আন্দোলনের সাল বলে গণ্য করা যায়। তন্মধ্যে সি. পি. এম. সহ ৯টি বামপন্থী দলের উদ্যোগে ১২ই নভেম্বর থেকে শুরু করা গণ-আন্দোলন, আইন অমান্য অভিযান প্রভৃতি দিয়ে শুরু। ১৫ই নভেম্বর ইণ্ডিয়ান ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ্ মজদুর সভা প্রভৃতি যুক্তভাবে ডাক দেয় একদিনের কর্মবিরতি ও মহাকরণ অভিযানের। ঐদিন আইন-অমান্য আন্দোলনে শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি প্রভৃতি নেতাগণ যোগ দেন। ১৭ই নভেম্বর বামপন্থী দলগুলি বাংলা বন্ধের ডাক দেয়। এই বন্ধ নিয়ে প্রচুর গণ্ডগোল হয়। ঐদিন ফারাক্কার কাছে বাসুদেবপুরে জনতা 'কামরূপ এক্সপ্রেস' ট্রেনটি অবরোধ করলে পুলিশ গুলি

চালায় এবং তাতে দু'জন নিহত হয়। ১৯৭৪ সালে মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের সংস্থাগুলি আন্দোলনে নামে এবং তার ফলে হাসপাতাল প্রশাসনে সাময়িক শিথিলতা নেমে আসে।

১৯৭৫ সালের ২১শে এপ্রিল ফারাক্কা বাঁধ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হলো। ২৮শে মে দার্জিলিং পাহাড় ছাড়া উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় ২৪ ঘণ্টা বন্ধ পালন করা হয়। এই আন্দোলন অবশ্য যুব-কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের মিলিত ডাকে এবং সেটা প্রধানমন্ত্রীর নিষেধ বাণী অগ্রাহ্য করে।

## ২. জরুরী অবস্থার চালচিত্র

২৬শে জুন প্রধানমন্ত্রী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং প্রচুর দমন-মূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয়। ৪ঠা জুলাই ভারত সরকার আনন্দমার্গ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক-সংঘ, সি. পি. আই. (এম. এল.) এবং জামাতে ইসলামী প্রভৃতিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন।

আগষ্টের ৭ তারিখে সংবিধানের ৩৯শ তম সংশোধন দ্বারা রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের নির্বাচন বিচারালয়ের আওতা-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭ই অক্টোবর 'মিশা' আইন সংশোধন করা হয়। এখন থেকে 'মিশা'য় আটক করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে না। ৮ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে আপত্তিকর বিষয়গুলিকে প্রকাশ না করার নির্দেশ জারী করা হলো। ১৯৭৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শংকর রায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেন।

যাই হোক, জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর চলতি লোকসভার আয়ু এক বছর বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এই সব গণতন্ত্রবিরোধী বলে বিরোধীদের আপত্তি ক্রমেই সোচ্চার হতে থাকে। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রবর্তিত আন্দোলনের ধারা ধরে বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় এবং জেলে অন্তরীণ থাকা-কালীন নেতাদের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্যের জন্যে অভিলাষ দৃঢ় হয় এবং তারা 'জনতা' পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। এক বছর অতিরিক্ত ক্ষমতা ভোগ করার পর প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৭ সালের জুন মাসে নির্বাচন ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রে যেমন জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজ্যে তেমনি বামপন্থী মোর্চা বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করে।

# ঠ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর আমল ( ১ম পর্ব )

( জুন ১৯৭৭ থেকে মে ১৯৮২ )

## ১. সাধারণ নির্বাচন ও বামপন্থী মোর্চা

১৯৭৭ সনের জুন মাস ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষমতার আকস্মিক ও অভাবনীয় উত্থান-পতনের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই সময় যেমন গণ-নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চা 'জনতা' পার্টি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি বিগত ভোটযুদ্ধে প্রায় পর্যুদস্ত মার্কস্‌বাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বিপুলভাবে বিজয়ী হয়। একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকলেও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করে।

১৯৭৭ সালের ১১ই এবং ১৪ই জুন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি এই ভোটযুদ্ধে ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, মার্কস্‌বাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. সি. পি. আই. এবং বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে একটি বামফ্রণ্ট গঠন করে এবং ২৯৪টি আসনের সবগুলিতে প্রার্থী দেয়। সি. পি. আই. (এম) এই নির্বাচনে ১৭৭টি আসন পয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বামফ্রণ্ট দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা সহ ২৩০টি আসন পায়। পূর্ববর্তী মন্ত্রীসভায় ক্ষমতাশীল কংগ্রেস পার্টি মাত্র ২০টি আসন পায় এবং বামফ্রণ্ট বহির্ভূত সব দল মিলে ( জনতা পার্টিসহ ) মাত্র ৬৩টি আসন লাভ করে। এইভাবে প্রায় বিরোধী পক্ষ লুপ্ত বিধান-সভায় বামফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং ২১শে জুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন শ্রীজ্যোতি বসু।

১৯৭৭ সালের এই বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রীসভায় মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং জেলার প্রতিনিধি থাকে না। ১৯৮১ সালে অবশ্য দার্জিলিং জেলা থেকে রাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে তামাং দাওয়া লামাকে গ্রহণ করা হয়। উত্তরবঙ্গের তিনজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীই ২৩শে জুন (১৯৭৭) শপথ গ্রহণ করেন,—বন ও পর্যটনমন্ত্রীরূপে শ্রীপরিমল মিত্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য এবং কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ। আর ৩০শে জুন রাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে শপথ-গ্রহণ করেন—শ্রীশিবেন চৌধুরী। তিনি পান পরিবহন দপ্তর।

## ২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বামফ্রণ্ট সরকার একটি বড় কাজে হাত দিলেন, সেটি হলো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রসারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সাধন। ডাঃ বিধান রায়ের আমলে পঞ্চায়েতী-রাজের

প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, নির্বাচনহীনতায় তার শক্তি ও কাযকারিতা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে নতুন পঞ্চায়েত আইন তৈরী করা হলেও নানা কারণে পঞ্চায়েতী নির্বাচনের আয়োজন করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই পঞ্চায়েতের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটান এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত তৈরীর লক্ষ্যে এগিয়ে যান। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে দীর্ঘকাল পরে আবার পঞ্চায়েতীরাজ পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে গণ-নির্বাচনের মাধ্যমে। এই নির্বাচনেও বামফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। ১৫টি জেলা-পরিষদের মধ্যে ১৪টি সি. পি. এম.-এর দখলে আসে। জেলা-পরিষদগুলির নিচে হ'ল পঞ্চায়েত সমিতি এবং তার নীচে গ্রাম-পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত-সমিতির কাজকর্মে সহায়তার জন্যে সমষ্টি-উন্নয়ন অফিসের অধিকাংশ কর্মচারীকেই পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং সমষ্টি-উন্নয়ন-আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির কার্যনির্বাহী আধিকারিকরূপে নিয়োজিত হন। জেলা-পরিষদের কাজকর্মের জন্যে অনেকগুলি পদে নতুন নিয়োগ ছাড়াও একজন পদস্থ অফিসারকে সেক্রেটারী এবং জেলা-শাসককে কার্যনির্বাহী অফিসাররূপে নিয়োজিত করা হয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের সুবিধার জন্য চৌকিদার, দফাদার ও সেক্রেটারীর প্রাক্তন পদগুলি ছাড়াও নতুন পদ তৈরী করা হয়, যার নাম হয় কর্ম-সহায়ক ( Job Assistant )। দ্রুতগতিতে এই সব পদে নিয়োগকার্য সমাধা করা হয় এবং ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ করিৎকর্মের পরিচয় দিতে থাকেন।

## ৩. গ্রামীণ পুনর্গঠন ও পঞ্চায়েত

১৯৭৮ সালেই পশ্চিমবঙ্গে এ শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা দেখা দেয়। প্রায় দুই কোটি নর-নারী বন্যায় কম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। দক্ষিণবঙ্গের অনেকগুলি জেলার গ্রামীণ অর্থনীতি ও মানুষের মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত এই বন্যায় একেবারেই গুঁড়িয়ে দেয়। নব-নির্বাচিত পঞ্চায়েতীরাজ এই দুর্দিনে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় গঠনমূলক কাজকর্ম নিয়ে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলিত আর্থিক যোগানে পরিপুষ্ট পঞ্চায়েতগুলি গ্রামীণ পুনর্গঠনে ব্যাপক দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে বছর উত্তরবঙ্গে বন্যা বিশেষ না হলেও ঐ একই পরিপ্রেক্ষিতে এখানেও সরকারী অর্থের যোগান ঘটে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনে প্রচুর কাজে হাত দেওয়া হয়। কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী শুধু শ্রমহীন দিবসে কৃষক ও ক্ষেতমজুরকে কর্মসংস্থান জুগিয়েছে তাই নয়, বহুকালের সংস্কার-হীন গ্রামীণ রাস্তা পুনর্নির্মাণ, যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে রাস্তা, পুল প্রভৃতি নির্মাণে

হাট, বাজার, উন্নয়ন-কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা, নতুন নতুন উন্নয়ন-কেন্দ্রের সূত্রপাত করা বা অনুরূপভাবে গ্রামের স্বাস্থ্য ও সুশ্রী ফিরিয়ে আনার অজস্র কার্যে তা প্রযুক্ত হয়েছে। আই. আর. ডি. পি-র মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান, 'ট্রাইজেমের' মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষা ও স্ব-বিনিয়োগের কর্মসূচী গ্রহণের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েত অচিরেই ব্যাপক গণ-আদৃতি লাভ করে। পঞ্চায়েতীরাজ এবারে সত্যিই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের স্বপ্নকে অনেকখানি সফল করেছে। গ্রামীণ মানুষ আইনসভার সদস্যের দ্বারে আর ভিড় করেন না, এখন তাঁরা বুঝতে পেরেছেন ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি এখন পঞ্চায়েতের হাতে।

## ৪. বর্গা-অপারেশন ও পাট্টা বিতরণ

পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সাধারণ মানুষকে স্বনিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার আস্বাদন দেওয়ার মত আরেকটি বড় কাজে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্যোগ সহকারে কাজে নেমে পড়েন—তা হলো ভূমিসংস্কার। আবার ভূমিসংস্কারের অনেকগুলো কর্মসূচীর মধ্যে যে দু'টিতে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, তা হলো 'বর্গা-অপারেশন' ও 'পাট্টা বিতরণ'। একদিকে ভাগচাষী, অন্যদিকে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, সমাজের এই দুটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীন শ্রেণীর স্বার্থে উপরিউক্ত কর্মসূচীদ্বয় যথাযৌক্তিক ভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং বিগত পাঁচ বছরে এই কর্মসূচী দুটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও লাভ করেছে।

বর্গা-অপারেশনের মূল দায়িত্ব ছিল সেটেলমেণ্ট ও জরীপ-বিভাগের এবং সরকারী খাসজমিতে এক একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমি প্রদানের দায়িত্ব ছিল ভূমি-সংস্কার ও রাজস্ব-বিভাগের। পঞ্চায়েতেব তিন স্তরের ব্যাপক সহায়তায় এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্যই শুধু লাভ করা গেছে তাই নয়, ভূমিসংক্রান্ত দাঙ্গা ও মামলাও এতে কমে গেছে বহুলাংশে। বর্গাস্বত্ব স্থায়ীকরণের দ্বারা বর্গাদারদের ভূমির অধিকার ও ফসলের অধিকার বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং বংশানুক্রমিকভাবে সে স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাপক কৃষিঋণ ও ভরতুকি এই সব প্রান্তিক চাষী-সম্প্রদায়কে মহাজনের কবল থেকে নিষ্কৃতির উপায় করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য এই যে, বৃদ্ধ চাষীর পেনসন প্রথা চালু করে গ্রামীণ কৃষককুলকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকেও অনেকাংশে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। বৈধব্য ভাতা, অনাথ শিশুর ভাতা এবং সর্বোপরি বেকার ভাতা শহরাঞ্চলের মত গ্রামাঞ্চলেও মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত করেছে।

## ৫. 'আসু'র আন্দোলন এবং উত্তরবঙ্গে উদ্বাস্তু-প্রবাহ

এদিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা উত্তরবঙ্গের উপর এমন উদ্বাস্তু সমস্যা চাপিয়ে দেয়, যা ব্যাপকতায় ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্যে উল্লেখযোগ্য। আসামে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন ১৯৫২, ১৯৬১, ১৯৭২ সালের মত, ১৯৭৯-তেও বিপুল সংখ্যক বাঙালিকে আসাম থেকে উৎখাত করে। এই সব ছিন্নমূল বাঙালী পরিবার প্রাণের ভয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করতে থাকে হাজারে হাজারে। এই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা ও উগ্র প্রাদেশিকতা অনুপ্রাণিত আন্দোলন সারা ভারতের নৈতিক মূল্যবোধকে পীড়িত করে; কিন্তু কেন্দ্রে বা প্রদেশে ক্ষমতাসীন জনতা সরকার আইন-শৃংখলার নামেও এই সাম্প্রদায়িক নিধনযজ্ঞ এবং এ ধরনের অসাংবিধানিক আন্দোলন দমনে কঠোর হতে পারেনি। এবারের আন্দোলন পরিচালনা করে নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়ন ও গণ-সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৫১ সালের পরে আগত সমস্ত বাঙালীদের "বিদেশী" বলে চিহ্নিত করতে এবং তাদের আসাম-ছাড়া করতে এই আন্দোলন।

জনতা-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোলাপ বরবরার দুর্বলতার সুযোগে তথাকথিত এই গণ-আন্দোলন পরিচালিত হলো—গ্রামে-গঞ্জে শহরে সংখ্যালঘু বাঙালীদের উপর গণ-নির্যাতন, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ডে। এব ফলে অজস্র বাঙালী নিহত হলো, অসংখ্য সাধারণ মানুষ ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে ভিখিরিতে পরিণত হলো, এদের মধ্যে প্রায় দশ হাজার বাঙালী শূন্য হাতে কোন প্রকারে আসাম পেরিয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়েন ( ১৯৭৯ নভেম্বর-ডিসেম্বর )। এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মানুষ অপর একটি সংখ্যালঘু শ্রেণীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেললো, আইন-শৃংখলা নিজের হাতে নিল, অপর শ্রেণীর জাতীয়তা নির্ধারণ করে ( যা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাভুক্ত ) তাদের 'বিদেশী' কাউকে ধরিয়ে দিল এবং তারা তাদের নিজস্ব ভিটে-মাটি ছেড়ে ছিন্নমূল নাগরিকে পরিণত হলো, কিন্তু কেন্দ্রে একটি এবং প্রদেশেও একটি আইনসিদ্ধ সরকার তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। সভ্য ভারতে এ সবই সম্ভব।

১৯৮০ সালে কেন্দ্রের জনতা সরকারের আকস্মিক পতন ঘটলে, আসামেও গোলাপ বরবরা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং আসাম জনতা পার্টির নেতা শ্রীযোগেন্দ্র হাজারিকা মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি উল্টে আন্দোলনকারীদের পরোক্ষভাবে মদত দিতে থাকেন। আন্দোলন আরো জোরদার ও নির্যাতনমুখী হয়ে ওঠে। অফিস-কাছারি-পরিবহন-তৈলশোধন-ব্যবসা-বাণিজ্য-শিক্ষাজগত এবং সমগ্র অর্থনীতিতে অচলাবস্থা নেমে আসে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

প্রধানমন্ত্রী হন এবং অনেকে আশা করেছিল যে, তিনি শক্ত হাতে এসব সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করবেন। কিন্তু তেমন কিছু ঘটলো না। ১৯৮০ সালে আন্দোলনকারীরা যেমন আসামে সাধারণ নির্বাচন প্রতিবোধ করে, তেমনি ১৯৮১ সালে 'জন-গণনার' মত আবশ্যিক কাজকর্মও হতে দেয়নি।

যাই হোক, বিগত তিন বছর ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং অজস্র দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক সভা করে চলেছেন, কিন্তু আসাম আন্দোলনের কোনো সমাধান হয়নি এবং বাস্তুচ্যুত ও উত্তরবঙ্গে আশ্রিত দশ হাজার বাঙালী আজো আসামে ফিরে যেতে পারেনি। নিরুপায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার ত্রাণ-শিবিরগুলিতে এই সব উদ্বাস্তুদের ভরণ পোষণ চালিয়ে যাচ্ছেন এতকাল।

## ৬. উত্তরখণ্ড ও স্বতন্ত্র নেপালী রাজ্যের আন্দোলন

১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় যেমন, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের সময়েও তেমনি, ভারতীয় সংবিধানের ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত রেখে নতুন কামতাপুর প্রদেশ গঠনের আন্দোলন, যাকে প্রচলিত অভিধায় উত্তরখণ্ড আন্দোলন বলা হয়, নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে। তবে কিছু মিছিল ও স্থানীয় মিটিং-এর বাইরে তার রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ কিছুই ছিল না। তেমনি আমরা বাঙালী সংগঠনও এই পর্বে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করলেও দেওয়াল লিখন এবং সরকারী সড়কের দূরত্ব চিহ্নের ইংরেজি বর্ণ ও সংখ্যায় মসি-লেপন ছাড়া তার রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পর্বে গুর্খা সম্প্রদায়ের ভাষায় স্বীকৃতি এবং তাদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় বহু গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়।

জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের দার্জিলিং ভ্রমণের সময় এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নেপালীদের দুটি দাবীকেই নস্যাৎ করে দেন। প্রধানমন্ত্রী নেপালীকে বিদেশী ভাষা বলে অভিহিত করেন এবং তাকে ভারতীয় স্বীকৃত ষোড়শ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হবার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকাগুলিতে একাধিক 'বন্ধ' ডেকে এবং বহু স্থানে দোকান ও বাড়ীর বাংলা সাইনবোর্ড ভেঙ্গে নেপালীরা তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে গোর্খা-জাতীয় মুক্তি-মোর্চা ও অপরাপর নেপালী সংগঠন ক্রমশঃ আন্দোলনের মাধ্যমে দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে বাংলা ভাষায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা নিয়োগমূলক পরীক্ষা গ্রহণও তারা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। ১৯৮২ সালের

গণ-নির্বাচনের সময় প্রান্ত-পরিষদের অধীনে গোরখা জাতীয় মুক্তি-মোরচা সমেত বেশ কয়েকটি সংগঠন ও সংস্থা একত্রিত হয়ে দাবী তোলে, "রাজ্য নেই, ভোট নেই।' নেপালী ভাষায় দেওয়াল লিখন পড়েছে—'বাংলা আমাদের কবরখানা।' পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন-পর্ষদের মাধ্যমে বহু কোটি টাকা বছরে খরচ করেও নেপালীদের স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবীকে স্তিমিত করা যায়নি।

## ৭. কেন্দ্রের শাসকদলের আকস্মিক পরিবর্তন ও রাজ্যে তার প্রতিক্রিয়া

কেন্দ্রে পাঁচ-মেশালী জনতা সরকার প্রথম থেকেই শরিকী দলাদলিতে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে এই দলাদলি আন্তর্দলীয় সংঘর্ষের রূপ নেওয়ায়, আকস্মিকভাবে জনতা সরকারের পতন ঘটে। ১৯৮০ সালের পার্লামেণ্টারী নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ফিরে আসে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতায়। সঙ্গে সঙ্গে ৯টি প্রদেশের নির্বাচিত জনতা সরকারকে পদচ্যুত করা হয়। এই ঘটনাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট পরিচালিত সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি হয় এবং এর অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে নানা মহলে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্বেও বামফ্রণ্ট সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৮২ সন অবধি। যদিও এই পর্বে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে; দুই সরকার পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ ছুঁড়তে থাকেন। এই সময় কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 'ওভার ড্রাফ্‌ট' তোলার সীমা ও পরিমাণ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের মন-কষাকষিও বেড়ে যায়। অবশেষে অনেক অনিশ্চিয়তা কাটিয়ে বামফ্রণ্ট তার শাসনকালের শেষ সীমায় এসে পৌছায় এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের দাবীতে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবী সুপ্রীম কোর্টে খারিজ হওয়ায় নির্বাচন কমিশন ১৯শে মে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

## ৮. উত্তরবঙ্গে নকশাল আন্দোলনের পুনঃপ্রকাশ

১৯৮০ সালের পর থেকে উত্তরবঙ্গে নকশাল-কার্যকলাপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অনেকগুলি জেলাতে নকশালদের সংগঠনের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থানে তারা বন্দুক লুঠ করে। ১৯৮১ সালে পশ্চিম দিনাজপুরের একটি অঞ্চল থেকেই তারা ৫৭টি বন্দুক লুঠ করে। বিভিন্ন স্থানে গুপ্তহত্যা শুরু হয়। এবারের কর্মসূচীতে তারা শুধু জোতদার হত্যা নয়, স্থানীয় রাজনীতিককেও হত্যা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করে। মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও

জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন এলাকায় এরা গুপ্তসংগঠন গড়ে তোলে এবং পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চোরা-গোপ্তা হত্যা করতেও সক্ষম হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক নকশাল যেমন পুলিশী তৎপরতায় ধৃত হয়েছে, তেমনি উদ্ধার করা হয়েছে ছিনতাই করা আগ্নেয় অস্ত্র, স্বনির্মিত আগ্নেয় অস্ত্র, প্রচারপত্র প্রভৃতি। এসব সংগঠনের নেতারা তাদের প্রচারপত্রে উত্তরবঙ্গ জুড়ে একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে এবং কোন কোন স্থানে বিপ্লবী সরকারের নামে ট্যাক্স সংগ্রহ করছে। তবে নকশালপন্থীরা বহু শাখায় বিভক্ত বলে এবং তাদের মূল শাখা-প্রশাখাগুলির বহুলাংশই নির্বাচনে আগ্রহী ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হবার চেষ্টায় ব্যাপৃত বলে প্রশাসন এবারের নকশালী তৎপরতাকে সম্ভবতঃ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না।

## ঙ. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর আমল [ ২য় পর্ব ]

( ২৬শে মে ১৯৮২......... )

### ১. বিধান-সভার নির্বাচন ( ১৯৮২ ) ও শ্রীজ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা

অনেক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে প্রত্যাশিত সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল ১৯শে মে, ১৯৮২। নকশালপন্থীদের একটি শাখা তথাকথিত বিপ্লবী সরকারের আঞ্চলিক কমিটির নামে ভোট বয়কটের ডাক দিল। শুধু তাই নয় —তারা অসংখ্য প্রচার-পত্র ছড়িয়ে দিল 'প্রথম ব্যালট, প্রথম বুলেট'। ১৯ তারিখ ভোটের দিনে তারা সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে 'বন্ধের' ডাক দেয়। বহু স্থানে সে ডাকে 'বন্ধ' পালিত হয়। বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়িতেও বন্ধ্ পালিত হয়। খবর পাওয়া গেল, নকশালরা বুথ ভাঙতে এবং ব্যালট ছিনতাই করতে বদ্ধপরিকর। ফলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী ছাড়াও বি. এস. এফ. ও সি. আর, পি. দিয়ে রুট মার্চ ও প্যাট্রোলিং করানো হলো বিভিন্ন স্থানে। সারারাত কঠোর পাহারা এবং ভোটের দিন নিবিড় সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা হলো।

ভোট-পর্ব কিন্তু একদম নির্ঝঞ্ঝাটে শেষ হলো। এতটা শান্তিতে ভোটের দিন কাটেনি বোধ করি কখনোই এর আগে। উত্তরবঙ্গে এবার ভোটও পড়ে অত্যন্ত বেশি, কোনো কোনো স্থানে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ পর্যন্ত। আগে কখনো এত বেশি সংখ্যায় জনসাধারণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি। গণনা-শেষে দেখা গেল উত্তরবঙ্গ এবার সর্বাত্মকভাবে বামফ্রণ্টের অনুকূলে ভোট দিয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ বামফ্রণ্ট-

বিরোধী কোন প্রার্থীই নির্বাচনে জিততে পারেননি এবং দক্ষিণবঙ্গে ৬ জন মন্ত্রীর পরাজয় ঘটলেও উত্তরবঙ্গে কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে হারেননি।

এই নির্বাচনে বিধান-সভার ২৯৪ আসনের মধ্যে ২৩৮টি আসন লাভ করে অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসন লাভ করে বামফ্রন্ট আবার দৃঢ়ভাবে পশ্চিমবঙ্গের শাসন-ক্ষমতায় ফিরে আসে। শ্রীজ্যোতি বসু পুনরায় বামফ্রণ্টের নেতা নির্বাচিত হন এবং নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। শ্রী বসু নিজে ও তাঁর মন্ত্রীসভার ৫ জন মন্ত্রী ২৬শে মে শপথ গ্রহণ করেন। বাকী ১৬ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং অবশিষ্ট ২১ জন প্রতিমন্ত্রী ২রা জুন তারিখে শপথ গ্রহণ করেন। এই মন্ত্রীসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে গৃহীত হয়েছেন ৮ জন মন্ত্রী, তার মধ্যে পূর্ণ মন্ত্রীই হলেন ৪ জন।

এই চারজন পূর্ণমন্ত্রী হলেন কোচবিহার জেলা থেকে শ্রীকমল গুহ (কৃষি দপ্তর) এবং বাকী তিনজন জলপাইগুড়ি জেলা থেকে—যথা শ্রীপরিমল মিত্র (বন ও পর্যটন দপ্তর), শ্রীননী ভট্টাচার্য (স্বাস্থ্য), শ্রীনির্মল বসু (সমবায়)। প্রতিমন্ত্রীরা হলেন—মালদহ জেলা থেকে শ্রীশৈলেন সরকার (জেলার পুরসভা বিষয়ক), দার্জিলিং জেলা থেকে শ্রীতামাং দাওয়া লামা (পার্বত্য উন্নয়ন), জলপাইগুড়ি জেলা থেকে শ্রীবনমালী রায় (তপশীল জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর) এবং কোচবিহার জেলা থেকে শ্রীশিবেন চৌধুরী (পরিবহন দপ্তর)। স্বাধীনতার পরে উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় এত ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আর কখনো আসেনি। ৩রা জুন নবগঠিত মন্ত্রীসভা পূর্ণাঙ্গ কার্যভার গ্রহণ করলে বঙ্গের তথা উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হবে। অতএব আজ এখানেই বর্তমান গ্রন্থের ইতি টানছি।

———

# পরিশিষ্ট

## ঐতিহাসিক নিদর্শনের তালিকা ও পরিচিতি

### কোচবিহার

কামতাপুর—কামতাপুর বা গোসামীমারী বলতে একই স্থান বোঝায়। এই স্থানটি কোচবিহার জেলার মহকুমা শহর দিনহাটা থেকে মাত্র ৮ মাইল পশ্চিমে। কামতাপুর উত্তরবঙ্গের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম বিখ্যাত স্থান। খেন্-বংশের তৃতীয় এবং শেষ রাজা নীলাম্বর এখানে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন আনুমানিক ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে। এখানে একটি দুর্গ ও তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুলতান হোসেন শাহর আক্রমণে এই দুর্গ বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু কিছুকাল পবে কোচবংশীয় রাজগণ কামতাপুরে রাজধানী স্থাপন কবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কামতাপুরের অপর পুরাতাত্ত্বিক আকর্ষণ কামতেশ্বরী মন্দির। কোচরাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে কবি মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মা ভবানী। এই মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গেছে—ব্রঞ্জের সূর্যমূর্তি, পাথরেব বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি যা পালযুগের শিল্পকলার নিদর্শবাহী। [ চিত্র ২১৪ পৃ. )

বাণেশ্বর—স্থানটি কোচবিহার থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্বে। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে মহারাজা প্রাণনারায়ণ কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। যোনিপটসহ শিবলিঙ্গ এর আকর্ষণ। তাছাড়া ত্রিশূলধারী বলদ-বাহন নন্দীর একটি ব্রোঞ্জমূর্তিও মন্দিরে রয়েছে। প্রতিবছর শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। ( চিত্র ২১৩ পৃ. )

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—মন্দিরটি কোচবিহার শহর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এটিকে শাক্তপীঠ বলে গণ্য করা হলেও অধুনা-প্রাপ্ত মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়। হয়তো বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ভগবতী। মন্দিরে মূর্তি নেই, আছে গৌরীপট্ট, কামাখ্যা-মন্দিরের আদর্শ। মন্দিরের দেওয়াল ইটের গাথুনি হলেও ৫ ফুট মোটা।

ধলুয়াবাড়ী মন্দির—আধুনিক কোচবিহার শহর থেকে মাত্র ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মন্দিরটি অবস্থিত। এটি নির্মিত হয়েছিল মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ( ১৭১৪-১৭৬৩ ) কর্তৃক। এটি একটি শিবমন্দির, যার মধ্যে উচ্চগৌরীপট্টে শিবলিঙ্গ স্থাপিত।

মহাদেব হরিহর শিবমন্দির—মন্দিরটি কোচবিহার শহরের ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এটিও মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের তৈরী বলে অভিহিত। চতুষ্কোণ এই মন্দির চূড়ার দিকে পিরামিড-সদৃশ। মন্দিরটি বর্তমানে পশ্চিমমুখে ঝুঁকে পড়েছে। এর অভ্যন্তরে মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

মধুপুর ধাম—কোচবিহার শহরের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে যে বিষ্ণুমন্দির আছে তা শংকরদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রবাদ। এই শংকরদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং আসাম, উত্তরবঙ্গ ও মণিপুরে বৈষ্ণববাদ প্রচারে ইনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। মন্দিরে রক্ষিত শঙ্করদেবের পাদুকা এখনো প্রতিদিন পূজিত হয়।

দামোদরপুর ধাম—কোচবিহার শহর থেকে মাত্র ২ মাইল পশ্চিমে মরা তোর্সার দক্ষিণ পারে অবস্থিত। একটি মাটির স্তূপ ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দামোদরদেবের সম্মানে এই ধামটি প্রতিষ্ঠিত করেন। আসামে এবং প্রান্তিক উত্তরবঙ্গে বৈষ্ণববাদ প্রচারে দামোদরদেবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ফুলবাড়ী—বর্তমান তুফানগঞ্জ শহর থেকে ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ফুলবাড়ীতে ছিল মহারাজ নরনারায়ণের সেনাপতি ও ভ্রাতা চিলা রায়ের (শুক্লধ্বজ) প্রাসাদ। বর্তমানে প্রাপ্ত মাটির ঢিবিটি ৭।৮ ফুট উঁচু এবং আয়তনে ৫৬,৭০০ বর্গফুট। কোন পাকা দালানের চিহ্ন নেই। মনে হয় —ক্ষয়িষ্ণু এবং অস্থায়ী দ্রব্যাদি দিয়ে প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল।

কুমারীর কোট—তোর্সা নদীর বাম তীরে বর্তমান কুট্টিমারীর ৩ মাইল উত্তরে এটি অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

## জলপাইগুড়ি

পৃথুরাজার গড়—এর মূল নাম পঞ্চগড়, যদিও ভিতরগড় নামেই অধিক পরিচিতি। পঞ্চগড় নামকরণের হেতু, এই গড়ের পর পর পাঁচটি বেষ্টনী বা প্রাচীর ছিল আর তার মধ্যে গড়—অর্থাৎ ভিতরগড় ছিল রাজার নিবাস। গড়টি বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার গরালবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের মধ্যে অংশবিশেষে পড়লেও অধিকাংশই বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। পৃথু রাজা আনুমানিক ১২২২-২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই গড়টি নির্মাণ করেন। এই গড়েই ১২২৭ খৃষ্টাব্দে পৃথুর সঙ্গে দিল্লীর সম্রাট ইলতুত-মিসের পুত্র বাংলার শাসন-কর্তা নাসিরউদ্দিনের ঐতিহাসিক যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজিত পৃথু গড়ের মধ্যে পুষ্করিণীতে ডুবে আত্মহত্যা

করেন। পুষ্করিণীটি এখনো বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীর পাড়ে এখনো অজস্র ইটের বিশাল স্তূপ রয়েছে যা সম্ভবতঃ পৃথুর অস্থায়ী প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ।

নলরাজার গড়—জলপাইগুড়ি জেলার চিলাপাতা সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষটি মানুষের নজরে এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের আংশিক খননকার্যের ফলে ইহাকে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় জনশ্রুতিতে একে নলরাজার গড় বলে অভিহিত করা হয়। এই গড়েব চারিদিকে চারটি প্রবেশদ্বার—প্রাচীর ৪০-৪৫ ইঞ্চি পুরু এবং বিশালাকার লাল ইটে গঠিত। দুর্গের অভ্যন্তরে কয়েকটি জলাশয় ও উঁচু ঢিবি আছে। তাছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এটিকে গুপ্তযুগের স্থাপত্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

জল্লেশ মন্দির—জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহর থেকে মাত্র ৮ কি. মি. দক্ষিণে অতি পুরাতন শৈব-পীঠ জল্লেশ-ধাম। পদ্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণে এই পীঠের মাহাত্ম্য ও উদ্ভব-রহস্য আলোচিত হয়েছে। মন্দিরটি বিশালাকায়। গর্ভগৃহের মেঝে থেকে উচ্চতা ১২৭ ফুট। গর্ভগৃহটি ২৯'×২৯' ফুট। মন্দিরের দৈর্ঘ ১২৪ ফুট এবং প্রস্থ ১২০ ফুট। মূল অংশ প্রস্তরে তৈরী। পর্যটকদের কাছে এই মন্দিরের আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

পূর্বডহর—আধুনিক পূর্বডহর জলপাইগুড়ি জেলায় ময়নাগুড়ি থেকে ১৫ কি. মি. দূরে জলঢাকা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে অতি প্রাচীন ঢিবির এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তর-নির্মিত অতি প্রাচীন এক শিবমন্দির। বিশাল-বিশাল আকারের কাটা পাথরে এটি তৈরী। মন্দিরের বহির্গাত্রে পাথরে খোদাই অসংখ্য-মূর্তি। সংলগ্ন পুকুরে পাওয়া ৫½"×৫½" আকারের বিষ্ণুপট্টটি উল্লেখযোগ্য। এখানে আশু উৎখননের কাজ প্রয়োজনীয়।

সোদর খই—জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার ব্যাংকান্দি গ্রামে প্রস্তর-নির্মিত ছোট মন্দিরটি সোদর খইয়ের মন্দির বলে পরিচিত। গঠন পদ্ধতিতে এটি পূর্বডহরের অনুরূপ।

বটেশ্বর—এটিও জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত এবং ময়নাগুড়ি হয়ে জল্লেশ্বর যাবার পথের মধ্যস্থানে পড়ে। বটেশ্বরও শিবমন্দির এবং এটিও তৈরী হয়েছে বিশালকায় পাথর বসিয়ে বসিয়ে। আজ সমস্ত মন্দিরটাই চূর্ণপ্রায়।

## পশ্চিম দিনাজপুর

অসুরগড়—এটি একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ। বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত গোলপুকুর থানায় এটি অবস্থিত। অনেকের অনুমান প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির নগর-রাষ্ট্রের এটি ছিল একটি রাজধানী।

বাণগড়—ধর্মশাস্ত্রীয় সাক্ষ্য অনুসারে বাণগড় আর্যসভ্যতার উষা-লগ্নের একটি রাজধানী। আবার বাণগড়ই ঐতিহাসিক কালের দেবকোট বা কোটি বর্ষ। এখানে খননকার্য চালিয়ে স্তরে স্তরে ধারাবাহিকভাবে মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাল এবং মুসলিম আমলের নিশ্চিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। [ চিত্র ২০৯ পৃ. ]

বংশীহরি—বর্তমান বংশীহরি থানায় এটি অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে।

ভাইওর—এটি তপন থানায় অবস্থিত। এখানে বিশালাকৃতি প্রস্তর-নির্মিত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যার কাল-নির্ণয় সম্ভব হয়নি।

ভিকাহার—এটি ভাইওর থেকে ১½ মাইলের মত উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এখানেও অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে অজস্র পশু-পাখির মূর্তি।

ধলদীঘি/কালদীঘি—দুটিই গঙ্গারামপুর থানার মধ্যে অবস্থিত। অতি বিশাল এই দীঘি দুটির সঙ্গে বাণরাজার দুই পত্নী ধলরাণী ও কালোরাণীর স্মৃতি-জড়িত। [ চিত্র ২১০ পৃ. ]

গঙ্গারামপুর—এটি প্রাচীন বাণগড় ( বা কোটি বর্ষ ) নামক স্থানের অতি সন্নিকটে। এখানেও প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন যথার্থ খননকার্যের অভাবে মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

করণদীঘি—এই দীঘিটি করণদীঘি থানার মধ্যে পড়ে। লোক-প্রবাদ, মহাভারতের কর্ণই এই দীঘিটি খনন করেছিলেন। বৈশাখ মাসে এখানে প্রতিবছর মেলা বসে।

করদহ—এটি তপন থানায় অবস্থিত একটি জলাশয়। প্রবাদ যে—বাণরাজার হাত ( কর ) কেটে শ্রীকৃষ্ণ এই দীঘিতে ফেলেছিলেন।

মহীপালদীঘি—এটি কুশমাণ্ডি থানায় অবস্থিত। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, এটি পালবংশের রাজা প্রথম মহীপাল খনন করেন।

তপনদীঘি—তপন থানার অন্তর্গত। প্রবাদ যে স্বয়ং বাণরাজা এটি খনন করেছিলেন।

## মালদহ

গৌড়—মালদা শহর থেকে ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অতি প্রাচীন শহর ও বহু শতাব্দীর রাজধানী গৌড়; যা আজ ভগ্নাবশেষ মাত্র। স্বভাবতঃই গৌড় আজও ভ্রমণকারীদের কাছে এক গভীর আকর্ষণ।

সাগরদীঘি—মালদা থেকে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগরদীঘি অবস্থিত। এটি প্রায় এক মাইল লম্বা এবং আধ মাইল চওড়া। এটি হিন্দুযুগের কীর্তি বলে পরিগণিত।

সোনা মসজিদ—গৌড়ের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। এটিকে সম্ভবতঃ বারদ্বারী মসজিদও বলা হয়।

দাখিল দরওয়াজা—বারদ্বারী থেকে আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দাখিল দরওয়াজা—অর্থাৎ দুর্গ প্রবেশের প্রধান পথ। আনুমানিক ১৫শ শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়।

ফিরোজ মিনার—বারদ্বাবী থেকে ১ মাইল দক্ষিণে ফিরোজ শাহের মিনার। এটি আসলে নির্মাণ করেন সৈফুদ্দিন হামজা শাহ, ১৪১২ খৃষ্টাব্দে।

বাইশগজী—এটি একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ; বহিরাবরণে দুর্গ এবং ভিতরে প্রাসাদ। গুয়ামালতিতে প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, এটি রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ, ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন।

কদম-রসুল—বাইশগজী প্রাসাদের পূর্ব কোণে গম্বুজ-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ দালান, তাকেই কদম-রসুল বলা হয়। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এটি সুলতান নসরৎ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়।

চিকা-মসজিদ—কদমরসুলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিকা (বাদুড়) মসজিদ। একনাথী মসজিদের অনুরূপ এর গঠন-শৈলী। হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি-খচিত অজস্র প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে এই মসজিদে।

গুমটি গেট—চিকা মসজিদের পূর্বদিকে অল্প দূরেই গুমটি গেট। এটি ১৫১২ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহের তৈরী।

লুকাচুরি—কদমরসুলের দক্ষিণ-পূর্বে এটি একটি তিনতলা গেট। এটি ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা কর্তৃক নির্মিত হয়।

চামকাটি মসজিদ—এটি লুকোচুরি গেটের পূর্বদিকে অবস্থিত। মনে করা হয় ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইয়ুসুফ শাহ এটি নির্মাণ করেন।

তাঁতীপাড়া মসজিদ—গৌড়ের সব মসজিদের চেয়ে দেখতে সুন্দর এই মসজিদটি সম্ভবতঃ মীর সাদ খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয় ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে।

লাটান মসজিদ—নবাবগঞ্জ রোডের ১১ মাইলের স্মারকস্তম্ভের কাছে এটি অবস্থিত। আনুমানিক ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফ শাহ এটি স্থাপন করেছিলেন।

কোটোয়ালী দরওয়াজা—এটি গৌড়নগরীর দক্ষিণ দেয়ালের কেন্দ্রীয় দ্বার। ১৬ফুট চওড়া এবং ৩০ ফুট উঁচু।

ঝনঝনিয়া মসজিদ—সিরাজুদ্দিনের সমাধিক্ষেত্রের কিছু দক্ষিণে এটি অবস্থিত। নির্মিত হয়েছিল ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মামুদ শাহ কর্তৃক।

পাণ্ডুয়া—মালদা থেকে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এটি কিছুকাল বাংলার রাজধানী ছিল সুলতানী আমলে। এক সময় একে ফিরোজাবাদ বলেও ডাকা হত।

জাম-ই-মসজিদ—১৩৪২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত।

কুতুব-শাহী-মসজিদ—এটি পাণ্ডুয়ার একটি বিখ্যাত মসজিদ। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে কুতুব পরিবারের কেউ এটি তৈরী করেন।

আদিনা-মসজিদ—১৩৬৪ থেকে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিকান্দার শাহ এটি তৈরী করেন। মধ্যযুগের স্থাপত্যের এটি একটি বিখ্যাত নিদর্শন।

পাণ্ডবরাজার দালান—আদিনা থেকে এক মাইল পূর্বে এটি অবস্থিত। প্রবাদ মহাভারতের যুগে পাণ্ডবেরা এটি তৈরী করেন।

সাতাশ ঘড়া দীঘি—পাণ্ডবরাজার দালানের পাশে এটি অবস্থিত। প্রবাদ অর্জুন এটি খনন করেছিলেন।

